ইউনিট ৩

# পৃথিবীর পদ্ধতি (The Earth System)

এই ইউনিটটি মোট ৩৪টি পাঠ নিয়ে গঠিত হয়েছে। আমাদের প্রাণী জগতের আবাসস্থল এই পৃথিবী কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-এর আওতায় চলে। ভূগোলবিদগণ পরিবেশের এই নিয়মগুলোকে অবস্থানভেদে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে জানার চেষ্টা করেছেন। আমরাও এই বই-এর এই ইউনিটকে

| | |
|---|---|
| অশ্মমন্ডল | Lithosphere |
| বায়ুমন্ডল | Atmosphere |
| বারিমন্ডল | Hydrosphere |
| জীবমন্ডল | Biosphere |

এই চার ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করেছি। এখন এই ভাগগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবার চেষ্টা করছি। ৩.১ পাঠটিতে পৃথিবীর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে।

**অশ্মমন্ডল (Lithosphere)**

৩.২ থেকে ৩.৯ পর্যন্ত অশ্মমন্ডল সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের নানা দিক যেমন ভূ-ত্বক, ভূত্বক গঠনকারী খনিজ শিলা, বিভিন্ন প্রকার শিলা, ভূমির ক্ষয়কার্য, মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**বায়ুমন্ডল (Atmosphere)**

৩.১০ থেকে ৩.২৫ পর্যন্ত পাঠে আপনারা বায়ুমন্ডল সম্পর্কে জানবেন। ইতোপূর্বে আপনারা জেনেছেন যে, বায়ুমন্ডল পৃথিবীর প্রধান গঠন মৌলসমূহের একটি। বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন দিক, বিশেষত: এর গঠন কাঠামো, উপাদানসমূহ এবং এগুলোর স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বমাপে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা এবং পরিবর্তনের প্রভাব জানা আবশ্যক। এ পাঠে বায়ুমন্ডলের গঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

**বারিমন্ডল (Hydrospere)**

৩.২৬ পাঠ থেকে ৩.৩০ পাঠ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা বারিমন্ডল সম্পর্কে জানতে পারব। এই পাঠগুলোতে আপনারা জীবনের প্রয়োজনে পানির গুরুত্ব এর বন্টন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ; ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্র ও স্থলভাগের ভৌগোলিক বন্টন; পানিচক্র সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্ব সম্পর্কেও অবগত হবেন।

**জীবমন্ডল (Biosphere)**

পাঠ ৩.৩১ থেকে পাঠ ৩.৩৪ পর্যন্ত জীবমন্ডল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠগুলোতে প্রাণের বিবর্তন, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ, বিবর্তন মতবাদ, উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যা, উদ্ভিদের কাঠামো বিন্যাস, প্রধান উদ্ভিদ বলয় সম্পর্কে জানব। এছাড়াও প্রাণিজ বাস্তব্যবিদ্যা, প্রাণিজ ভৌগোলিক বলয়, প্রাণীর বন্টন বিন্যাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। মানব বাস্তব্য বিদ্যার অন্তর্গত বিষয়াদি, মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বিতকরণ, মানব বাস্তব্যবিদ্যার বৈশিষ্ট্যাবলী ও ফলিত বাস্তুবিদ্যার উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

# পাঠ ৩.১ : পৃথিবীর পদ্ধতির পরিচিতি (The Earth System and Introduction)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

◈ পৃথিবীর অবস্থানজনিত পরিবেশ সম্পর্কে।

পৃথিবী মানুষসহ অন্যান্য জীবের আবাসভূমি। পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ জীবের অস্তিত্বের জন্য উপযোগী কিনা তা প্রমাণিত হয় নাই। জীবের জন্য পৃথিবীর এই উপযোগীতার পিছনে অনেকগুলো নিয়ামক জড়িত। বিশেষত: তিনটি নিয়ামক পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ভিত্তি তৈরি করেছে।

ক. সূর্য থেকে মাঝারী দূরত্বে পৃথিবীর অবস্থান;

খ. অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমন্ডল এবং

গ. পর্যাপ্ত পানি।

এই সব নিয়ামকের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা নিম্নরূপ:

*মিথষ্ক্রিয়া, সূর্যরাশ্মির আপাতন, ভারসাম্য, আর্দ্রতা।*

ক. মাঝারী মাত্রার সূর্যরশ্মির আপাতন;

খ. সহনীয় মাত্রায় তাপের ভারসাম্যতা (Heat Balance);

গ. বাস্পীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় আর্দ্রতার সর্বত্র অবস্থান।

উপর্যুক্ত পরিবেশের ভিত্তিতেই পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়।

## পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতি (The Earths Natural System)

পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থাকে জানার জন্য প্রয়োজন এর গঠনকারী মৌল সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অতীতে, বিজ্ঞানীরা গঠন মৌলকে পৃথকভাবে জানার চেষ্টা করেছে। বস্তুর গঠনকারী বিভিন্ন মৌল সমূহ পরস্পর স্বাধীন এই রকম ধারণার ভিত্তিতেই সম্ভবত এই ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। এই পদ্ধতিতে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর আন্ত:সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয় সমূহ গুরুত্ব পায় না। বাস্তবে, পৃথিবীকে একটি একক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে এত সব নিয়ামক একত্রে কর্মরত আছে যে, এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। তাই, এর সরলিকরণ প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতি সমূহকে সহজে জানার জন্য এর গঠনকারী ৫টি উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়। যথা- জলবায়ু, মৃত্তিকা, জীবজগত, পানি এবং ভূমিরূপ।

*সরলীকরণ জীবজগত*

প্রতি পদ্ধতিতেই সাধারণ রীতিবদ্ধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; ফলে তা সহজেই জ্ঞানকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে থাকে। পদ্ধতিসমূহ দুই ধরনের হতে পারে- উন্মুক্ত বা আবদ্ধ। পৃথিবীর প্রায় সব পদ্ধতি সমূহকেই উন্মুক্ত পদ্ধতির আওতায় ফেলা যায়। এর কারণ নিম্নরূপ:

ক. প্রতিটি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উপকরণ হিসাবে বাহির থেকে শক্তি ও পদার্থের আগমন ঘটে থাকে। একইভাবে উৎপাদ হিসাবে এই পদ্ধতি থেকে শক্তি ও পদার্থের বহির্গমন হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বায়ুমন্ডলীয় উপরিভাগে সূর্য থেকে মূলত: শক্তির আগমন ঘটে থাকে এবং তা

আবার মহাশূন্যে ও পৃথিবীতে ফিরে যায়। এই চক্র পৃথিবীর তাপ সমতা বা তাপ বাজেট নামে পরিচিত।

খ. উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বাহির থেকে আগত শক্তি, সাময়িকভাবে অপরিবর্তিত থাকতে পারে; তবে ধীরে ধীরে তা পদ্ধতির ভিতরে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

গ. পদ্ধতির ভিতরগত যে কোন পরিবর্তন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক ফিডব্যাক হিসাবে প্রতিফলিত হয়। ধনাত্মক ফিডব্যাক পদ্ধতির পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং ঋণাত্মক ফিডব্যাক পদ্ধতির আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে বা যে কোন পরিবর্তন গতিকে স্লথ করে।

*আশ্মমন্ডল, উল্কাপিন্ড, জারণ, জৈব পদার্থ, ঋণাত্মক ফিডব্যাক।*

ঘ. প্রায় সব পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদ মাত্রায় একটি সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে। যেমন, বায়ুমন্ডলীয় তাপের ভারসাম্যতা আপতিত সৌরশক্তি এবং প্রতিফলিত শক্তি প্রায় সমান। তাপের এই ভারসাম্যতা না থাকলে পৃথিবী হয় অধিক উত্তপ্ত না হয় বেশী শীতল হত, যার কোনটিই জীবজগতের জন্য অনুকূল নয়।

পক্ষান্তরে, আবদ্ধ পদ্ধতিতে, উন্মুক্ত পদ্ধতির ন্যায় কোন উপকরণ বা উৎপাদ নাই কিন্তু পদ্ধতির অভ্যন্তরীন গঠন মৌল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর অশ্মমন্ডল এই জাতীয় আবদ্ধ পদ্ধতির একটি উদাহরণ। কারণ, মহাজাগতিক কিছু উল্কাপিন্ড ব্যাতীত অশ্মমন্ডল থেকে কোন বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠ যেমন ত্যাগ করে না তেমনি এতে যোগ হয় না।

পৃথিবীর বহিরাবরনে যে সব উপ পদ্ধতি (Subsystem) আছে তা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পরে কার্যকরভাবে সম্পর্কিত। যেমন, পৃথিবীর জলবায়ু ও মৃত্তিকার সম্পর্ক নিবিড়। ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে যে মৃত্তিকার উদ্ভব হয়েছে তা মূলত: ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত। অতি বর্ষনের কারণে মাটির খনিজ পানির সাথে সহজেই চুয়ায়ে মাটির নিম্নস্তরে চলে যায়; ফলে উপরিভাগে অধিক জারিত অক্সিজেন নামক মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকে। আবার, অধিক উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর কারণে ঐ অঞ্চলে অধিক হারে গাছ-পালা জন্মায় কিন্তু উদ্ভিদের ঝরা পাতা, মৃত কান্ড দ্রুত জারিত হওয়ায় মাটিতে জৈব পদার্থ কম থাকে। এইখানে লক্ষ্যনীয় যে, জলবায়ু পদ্ধতি, উদ্ভিজ্জ পদ্ধতি এবং মৃত্তিকা পরস্পরে সম্পর্কিত। পৃথিবীর অন্যান্য উপপদ্ধতি সমূহ ও একইভাবে একটি সমন্বিত পদ্ধতির আওতাভুক্ত।

পৃথিবীর কোন একটি উপপদ্ধতি, যেমন, জলবায়ু সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এর প্রধান মৌল সমূহ যেমন- সৌর শক্তি ও পানি পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে বন্টিত নয়। এই সব মৌলের স্থানভেদে বন্টনগত তারতম্য থেকেই এর শ্রেণী বিভাজনের সূত্রপাত হয়। যেমন, জলবায়ু বা ভূমিরূপের শ্রেণী বিভাগ যা আঞ্চলিক তারতম্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সাধারণভাবে বলা যায়। একই উপকরণ ও প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলে উপপদ্ধতি বিশ্বব্যাপী তা প্রায় একইভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু, বাস্তবে উপকরণ ও প্রক্রিয়াগত তারতম্যের কারণে বিশ্বব্যাপী উপপদ্ধতির আঞ্চলিক বিন্যাস দেখা যায়।

## পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতির উপবিভাগসমূহ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে ৪টি প্রধান মন্ডলে ভাগ করা যায়। যথা: অশ্মমন্ডল, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও জীবমন্ডল। পৃথিবীর এই সব মন্ডল সমূহের অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এরা ঘনত্ব অনুযায়ী উলম্বভাবে সংগঠিত। যেমন, বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.৩ কি: গ্রা:/মি৩) হওয়ায়-এর অবস্থান ওপরে এবং শিলার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (২০০০ কি: গ্রা:/মি৩) হওয়ায় সর্ব

নিতে অবস্থান করে। পানি (১০০০ কি: গ্রা:/মি৩) ও জৈব পদার্থ (৫০০ কি: গ্রা:/মি৩) মাঝারী ঘনত্বের, ফলে এদের অবস্থান মাঝামাঝি (চিত্র - ৩.১.১)।

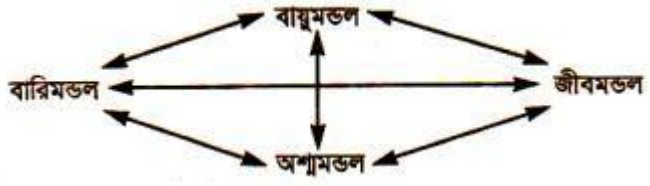


*চিত্র ৩.১.১ : পৃথিবীর প্রধান উপ-পদ্ধতি সমূহের পাস্পরিক সম্পর্কের গতিধারা।*

বায়ুমন্ডল ভূ-পৃষ্ঠকে চর্তুদিকে বেষ্টন করে আছে। এই মন্ডলের সাথে জীবের অস্তিত্বের সম্পর্ক; তাই একে জীবন স্তর নামে ও অবিহিত করা হয়। ভূত্বকের উপরিভাগের কয়েকমিটার থেকে এর শুরু এবং উর্ধ্বাকাশের প্রায় ৬০,০০০ কি: মি: (৩৭০০০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। সূর্য থেকে আগত শক্তি এর প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। বায়ুমন্ডল সমুদ্র সমতলে সব চেয়ে ঘন এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়।

অশ্মমন্ডল পৃথিবীর সব চেয়ে কঠিন ও অধিক পুরুত্ব বিশিষ্ট অংশ যা প্রধানত: গুরুমন্ডল ও কেন্দ্র মন্ডল এই দুই অংশ নিয়ে গঠিত। পুরুত্বের দিক থেকে উভয় অংশই প্রায় ৩০০০ কি:মি: এর অধিক পুরু। গুরুমন্ডলের প্রায় ১০০ কি: মি: উপরিভাগই সরাসরি বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডলের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার অংশ নেয়।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শতকরা ৭১ ভাগ জুড়ে আছে বারিমন্ডল, যা মূলত: বায়ুমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের মাঝখানে অবস্থিত। সাগর মহাসাগরই বারিমন্ডলের প্রধান অংশ যা পৃথিবীর পানির বেশীরভাগ ধারণ করে আছে এবং বায়ুমন্ডলের বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার প্রধান উৎস।

জীবমন্ডল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত নিয়ে গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠ এদের আবাসস্থল। ভূ-ত্বকের উপরিভাগের পানি ও মাটির মিলনস্থলে (Interface) জীবের বিকাশ ঘটে। ভরের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী মোট জৈব পদার্থের ওজন মাত্র ৮ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন, অথচ বায়ুমন্ডলের মোট ওজন ৫,১৪০ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বারিমন্ডলের মোট পানির ওজন ১,৫০০,০০০ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন। এই থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অন্যান্য মন্ডলের তুলনায় জীবমন্ডেলের ভর খুবই নগন্য। বিশ্বের আলোকে জীব মন্ডল মাটি পানিতে অত্যন্ত পাতলা আবরণের ন্যায় বিস্তৃত।

এই ইউনিটে পৃথিবীর মূল গঠন কাঠামোর পদ্ধতি সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমেই, পৃথিবীর প্রধান গঠন মৌল, অশ্মমন্ডল আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বায়ুমন্ডল ও বারিমন্ডল আলোচিত হয়েছে। সবশেষে, জীবমন্ডল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

## পাঠ সংক্ষেপ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতি সমূহকে জানার জন্য একে পাঁচটি উপপদ্ধতিতে ভাগ করা হয়। যথা: জলবায়ু, মৃত্তিকা, জীবজগত, পানি এবং ভূমিরূপ। এই সব পদ্ধতি উন্মুক্ত বা আবদ্ধ- দুই ধরনের হতে পারে। জলবায়ুর প্রধান চালিকাশক্তি সৌরশক্তি ও পানি। মৃত্তিকার উদ্ভব হয়

ভূত্বকের উপরিভাগে। জীবজগত মূলত: বায়ুমন্ডল, মৃত্তিকা ও বারিমন্ডল এই তিন উপবিভাগ থেকে প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সত্য/মিথ্যা নির্ণয়করুন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ তিনটি নিয়ামক পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ভিত্তি তৈরি করেছে।
ক. সূর্য থেকে মাঝারী দূরত্বে পৃথিবীর অবস্থান;
খ. অক্সিজেন সম্বৃদ্ধ বায়ুমন্ডল এবং
গ. পর্যাপ্ত বায়ু।

১.২ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতি সমূহকে সহজে জানার জন্য এর গঠনকারী ৫টি উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়। যথা- জলবায়ু, মৃত্তিকা, জীবজগত, পানি এবং ভূমিরূপ।

১.৩ পৃথিবীর জলবায়ু ও মৃত্তিকার সম্পর্ক নিবিড়।

১.৪ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে ৪টি প্রধান মন্ডলে ভাগ করা যায়। যথা: অশ্মমন্ডল, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও অজৈবমন্ডল।

১.৫ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শতকরা ৭১ ভাগ জুড়ে আছে বারিমন্ডল, যা মূলত: বায়ুমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের মাঝখানে অবস্থিত।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী** (সময় ৮ মিনিট) ঃ

১. পৃথিবীতে জীবজগতের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী নিয়ামক সমূহ কি কি?

২. পদ্ধতির ধরন সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপপদ্ধতি সমূহ কি কি?

৪. পৃথিবীর উপপদ্ধতি সমূহ পরস্পর কিভাবে সম্পর্কিত তার উদাহরণ দিন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পৃথিবী যে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পদ্ধতি মেনে চলে সে সম্পর্কেধারণা দিন।

# অশ্মমন্ডল (Lithosphere)

*৩.২ থেকে ৩.৯ পর্যন্ত পাঠে আপনারা অশ্মমন্ডল সম্পর্কে জানবেন।*

## পাঠ ৩.২ : ভূ-ত্বক (Earth-Crust)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ভূ-ত্বকের সৃষ্টি;
- ভূ-ত্বকের গঠন;
- ভূ-ত্বকের উপাদান;
- ভূ-ত্বকের স্থল ও জলভাগের বিন্যাস সম্পর্কে।

আজকের পাঠ পৃথিবীর উপরের বা বাহিরের অংশের আবরণ সম্পর্কিত। কেবল মানব জাতিই নয় সকল প্রকার প্রানীজগতের বাসস্থান এ ভূ-ত্বক। ভূ-ত্বক সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সর্বদাই প্রানীজগতের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রানীজগতের ব্যবহৃত সকল প্রকার সম্পদের প্রধান উৎস এই ভূত্বক। কাজেই, ভূ-ত্বক সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

### ভূ-ত্বকের সৃষ্টি

*বাষ্পপিন্ড বিকিরণ, আঠালো পদার্থ।*

পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কীত নানা মতবাদ আছে। তবে পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভে সম্পূর্ণ বায়বীয় অবস্থায় ছিল। এ জমাট বাঁধা ঘূর্ণায়মান বাষ্পপিন্ড ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। বর্তমান পৃথিবী অপেক্ষা তখন আয়তনও ছিল বহুগুন বেশী। উত্তপ্ত পৃথিবী তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঘন হয়ে জমাট বাঁধতে (condenced) শুরু করে। এ পর্যায়ে বাস্প ঘনীভূত হয়ে তরল আকার ধারণ করে। ক্রমেই তরল পদার্থের চতুর্দিকে ঘন একটি আবরণ বা পর্দার সৃষ্টি হয়। এই পদার্থই ভূ-ত্বক। এই আবরণের মাঝে পৃথিবীর অন্যান্য অংশগুলো আটকা পড়ে আছে-অনেকটা আঁঠালো পদার্থের অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে।

*প্রাকৃতিক পরিবর্তন, উপাদানের ভারসাম্যতা।*

পৃথিবী বাস্পীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্তির সময় এর সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তরের বাস্প ঘনীভূত না হয়ে পৃথিবীর উপরিভাগে বাস্পের একটি বেষ্টন তৈরী করে রাখে। ক্রমে নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ও উপাদানের ভারসাম্য আসায় প্রাণীর উপযোগী একটি বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি হয়।

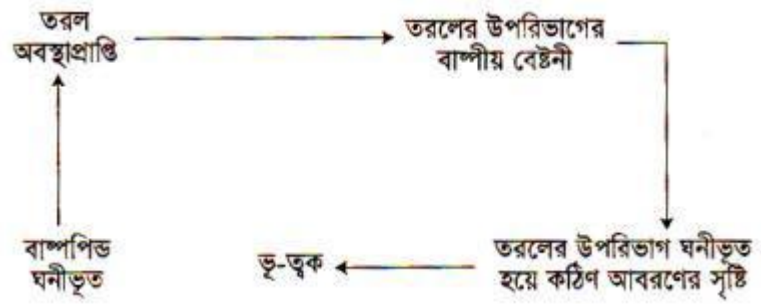

*চিত্র ৩.২.১ : ভূ-ত্বকের সৃষ্টি*

**ভূ-ত্বকের সম্পর্কে তথ্য আহরণ উৎস:**

ভ-ত্বকের গভীরতা সর্বত্র সমান না। পৃথিবীর কঠিন আবরণ ভেদ করে এত গভীরে ঢুকে দেখার তেমন কোন সুযোগ নেই। খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য এ পর্যন্ত সবচেয়ে গভীরতম কূপ মাত্র ৮ কিলোমিটার ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ক্ষয়কার্যের ফলে মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার শিলা উন্মুক্ত হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিজ্ঞানীরা নির্ভর করেছেন।

প্রথমত: আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে প্রাপ্ত শিলার নমুনা।

দ্বিতীয়ত: ভূ-কম্পন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন শিলার বিভিন্নতার বেগ ও দিকের পরিবর্তন করে থাকে। এই ভূ-কম্পন তরঙ্গের বেগ ও দিক পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরের শিলা স্তর সমূহের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

*শিলার নমুনা, ভূ-কম্পণ তরঙ্গ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র।*

তৃতীয়ত: পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যও এর ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণাও ভু-ত্বকের গঠনও এর উপাদান ও প্রকৃতি জানতে সাহায্য করেছে।

*কোন কোন উপায়ে ভূ-ত্বক সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ তথ্য সংগ্রহ করেন?*

## ভূ-ত্বকের গঠন

ভূ-ত্বক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বাইরের আবরণ যা কঠিন এবং ভূ-পৃষ্ঠ গঠন করেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরের দিকে পৃথিবীকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে গঠন প্রকৃতি ও উপাদানের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে। এগুলো হচ্ছে-

*ভূ-ত্বক, গুরুমন্ডল, কেন্দ্র মন্ডল।*

- ভূ-ত্বক (Earth crust)
- গুরুমন্ডল (Mantle)
- কেন্দ্রমন্ডল (Core)

*ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরের দিকে পৃথিবীকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?*

ভূ-ত্বক হচ্ছে গুরুমন্ডলের (Mantle) ওপরে অবস্থিত পাতলা শিলাস্তর। এই স্তরের গড় পুরুত্ব ২০ কিলোমিটার। মহাদেশের তলদেশে এর পুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। গড় মহাদেশের তলদেশের পুরুত্ব ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে সর্বনিম্ন ৫ কিলোমিটার (চিত্র: ৩.২.২)।

*পাতলা শিলাস্তর।*

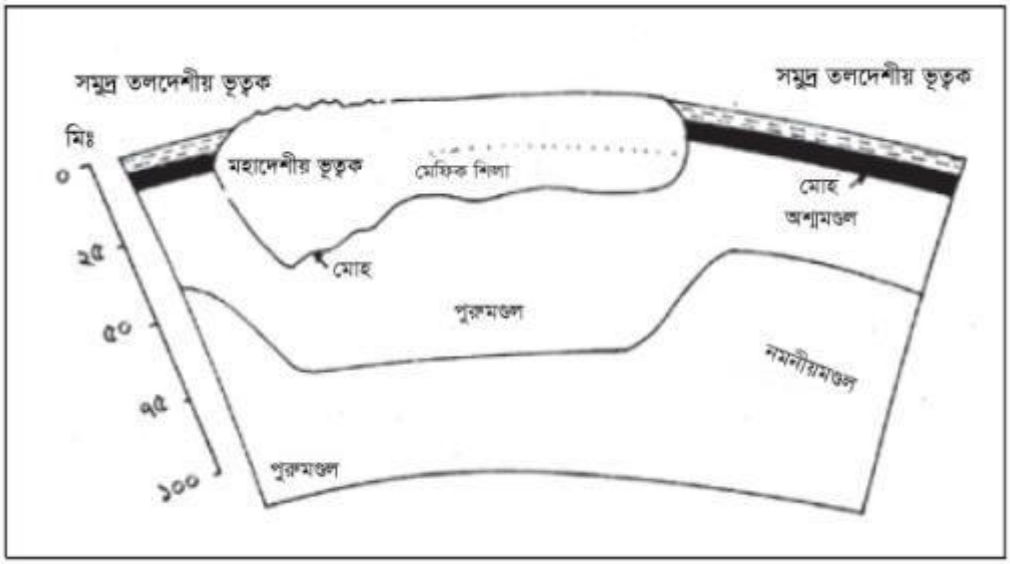


*চিত্র: ৩.২.২. মহাদেশ ও সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বকের তুলনামূলক পুরুত্ব [উৎস ঃ Strahler & Strahler 1992]*

ভূ-কম্পন তরঙ্গ থেকে জানা তথ্য অনুযায়ী মহাদেশীয় ভূ-ত্বক মৌলিক মেফিক ও ফেলসিক নামক দুই প্রকার শিলাস্তরে গঠিত। নিম্নশিলাস্তরটি মেফিক এবং ওপরের শিলাস্তরটি ফেলসিক নামে পরিচিত। মেফিক শিলাস্তরের গঠন উপাদন প্রধানত: ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ। এই শিলার রং গাঢ় এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ঘণত্ব বিশিষ্ট। ফেলসিক শিলার রাসায়নিক উপাদান গ্রানাইটের মত, তাই এ স্তরকে গ্রানাইট শিলাস্তর বলে। ফেলসিক শিলা প্রধানত কোয়ার্টজ এবং ফেল্ডসপার সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ এর শ্রেণীভূক্ত। এদের রং ধুসর ও অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্ব বিশিষ্ট। মেফিক ও ফেলসিক শিলাস্তরে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।

*মোফিক, ফেলসিক।*

*মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের সম্পর্কে ধারণা কি?*

## ভূ-ত্বকের উপাদান

পৃথিবীর উপরিভাগের শক্ত আবরণ যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা গঠিত এদেরকে সব মিলিয়ে শিলা বলে। যে সমস্ত শিলা ভূ-ত্বক গঠন করে তাদের বৈশিস্ট্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভূ-ত্বকের স্থানভেদে কোথাও ভারী শিলা আবার কোথাও কোথাও হালকা শিলা দ্বারা গঠিত। এর উপরের অংশ গ্রানাইট জাতীয় শিলা এবং নিম্নাংশ ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন খনিজের রাসায়নিক সংমিশ্রনে এই দুই প্রকার শিলা গঠিত হয়েছে। আবার নানা প্রকার মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে খনিজগুলি। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১০৫ টি মৌলিক উপাদানের মধ্যে ১৫ টি উপাদান ভূ-ত্বকের শতকরা প্রায় ৯৯.৫ অংশ দখল করে আছে। এর মধ্যে ৮ টি উপাদান ভূ-ত্বকে সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় (সারণি ৩.২.১)।

*৮টি উপাদান ৯৮ শতাংশ মৌল দখল করে আছে।*

*ভূ-ত্বকে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা অধিক উপাদানগুলো কি কি?*

| মৌলিক উপাদান | সাংকেতিক চিহ্ন | শতকরা ওজন |
|---|---|---|
| অক্সিজেন | $0_2$ | ৪৭ |
| সিলিকন | Si | ২৮ |
| এলুমিনিয়াম | Al | ৮.১৩ |

| | | |
|---|---|---|
| লৌহ | Fe | ৫.০০ |
| ক্যালসিয়াম | Ca | ৩.৬ |
| সোডিয়াম | Na | ২.৮ |
| পটাশিয়াম | k | ২.৬ |
| ম্যাগনেশিয়াম | Mg | ২.১ |

*সারণি ৩.২.১ : ভূ-ত্বকে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা অধিক উপাদান [উৎস: Strahler & Strahler (1992)]*

মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের প্রায় ৯৮ শতাংশ (ওজনে) এ সমস্ত মৌল দখল করে আছে। সারণি ৩.২.১ এ দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন ও সিলিকন মৌলদ্বয় যৌথভাবে শতকরা ৭৫ ভাগ ওজন দখল করে আছে। অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাকি ২৫ ভাগ ওজনের অধিকারী। এই সমস্ত উপাদানগুলো ধাতব মৌল।

*উদ্ভিদের পুষ্টি*

অ্যালুমিনিয়াম ও লোহা উদ্ভিদের পুষ্টি যোগানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিল্পেও এদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ওজনে শতকরা ২-৪ ভাগ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য জরুরী। এ সমস্ত খনিজ উপাদান ছাড়া মৃত্তিকার উর্বরতা মারাত্মক হ্রাস পায়।

*ভূ-ত্বক গঠনকারী ধাতব ও অধাতব মৌল কোনগুলি?*

ভূ-ত্বকের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, দস্তা, টিন প্রভৃতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় পদার্থ রয়েছে। এদের পরিমাণ খুব কম। এছাড়া ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি উচ্চ পারমানবিক ভরসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও খুব সামান্য পরিমানে পাওয়া যায়। এ তেজস্ক্রিয় পদার্থ আণবিক শক্তি উৎপাদনকারী হিসাবে কাজ করে।

## স্থল ও জলভাগের বিন্যাস

ভূ-পষ্ঠের বা পৃথিবীর উপরিভাগের মোট আয়তন ১৯ কি.মি। এই বিশাল আয়তনবিশিষ্ট ভূ-পৃষ্ঠের বেশীর ভাগ স্থান দখল করে আছে জলভাগ এবং বাকী অংশ স্থল ভাগ। পৃথিবীর ওপরের কঠিন অংশ এবং যা সমুদ্রের ওপরে রয়েছে তাদেরকে স্থলভাগ বলা হয়। এছাড়া বাকী অংশ যা জলময় তাকে বারিমন্ডল বলে। জলভাগ ও স্থলভাগের বিন্যাস এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

*১৯ কি.মি.।*

১. উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি। এর কেন্দ্রে জলভাগ, উত্তর মহাসাগর।

২. দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি। কিন্তু এর কেন্দ্রে স্থলভাগ, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।

৩. বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী কোন স্থানকে কেন্দ্র করে একটি মহাবৃত্ত অঙ্কন করা হলে সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় ৬/৭ অংশ ঐ বৃত্তের মধ্যে পড়বে। এভাবে সমস্ত পৃথিবীকে স্থলগোলার্ধ ও জলগোলার্ধ নামে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা যায়।

*স্থল ভাগ বেশি, জলভাগ বেশি, স্থলভাগের ৬/৭ অংশ, ত্রিভূজাকৃতের প্রতিপাদ, স্থলভাগ জলভাগ।*

৪. পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাদেশ যেমন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া উত্তর দিকে প্রশস্ত এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মহাসাগরের প্রবেশ করেছে। আবার আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরগুলি দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত এবং উত্তর দিকে ক্রমশ: সরু হয়ে স্থল ভাগে প্রবেশ করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পৃথিবী প্রায় সব বড় বড় স্থলভাগ ও জলভাগ ত্রিভূজাকৃতির।

৫. পৃথিবীর সবকয়টি বড় বড় স্থলভাগের প্রতিপাদ (Antipod) স্থানে জলভাগ বিদ্যমান। দু'টি ব্যতিক্রম আছে একটি পাটাগনিয়ার (Patagonia) বিপরীতে উত্তর চীন এবং অপরটি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড এবং প্রতিপাদ স্থানে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian peninsula)।

৬. এছাড়া সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে মোটামুটিভাবে স্থলভাগের পর স্থলভাগ এবং স্থলভাগের পরে জলভাগ বিদ্যমান।

*ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগ ও জলভাগের বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?*

**পাঠ সংক্ষেপ**

এই পাঠে আমরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বাইরের আবরণ যা ভূ-ত্বক নামে পরিচিত তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারলাম। পৃথিবীর সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় বাস্পপিন্ড থেকে যে তরল এবং তরল থেকে ঘনীভূত হয়ে একটি পর্দা বা আবরণ সৃষ্টি হয়। এই পর্দাই পরে আরো কঠিন হয় এবং একে ভূ-ত্বক বলা হয়। এই ভূ-ত্বক সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর নানা ধরনের মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়। সরাসরি তথ্য আহরণ সম্ভব নয়। গঠন উপাদানের দিক থেকে ভূ-ত্বকের ওপরের অংশ গ্রানাইট জাতীয় শিলা দ্বারাও নিম্নাংশ ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন খনিজের রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই শিলাগুলি গঠিত হয়েছে। এছাড়াও ভূ-ত্বকের গঠন বিন্যাসের ভিন্নতায় দুটি অংশে বিভক্ত স্থল ও জলভাগের বিন্যাসেও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময়- ৫ মিনিট) ঃ

১.১. পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী-

ক. বায়বীয় খ. তরল
গ. কঠিন ঘ. আঁঠাল ছিল

১.২. পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ভূ-অভ্যন্তরের দিকে পৃথিবীর স্তরগুলো যথাক্রমে-

ক. কেন্দ্রমন্ডল, গুরুমন্ডল ও অশ্মমন্ডল খ. গুরুমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল
গ. কেন্দ্রমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও গুরুমন্ডল ঘ. অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল

১.৩. ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব বেশী -

ক. মহাদেশের তলদেশে খ. নিমজ্জিত ভূ-খন্ডের তলদেশে
গ. মহাসাগরের তলদেশে ঘ. ডুবো পাহাড়ের তলদেশে

১.৪ মহাদেশীয় ভূ-ত্বক যে দুই ধরনের শিলাস্তরে গঠিত

ক. সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম খ. লৌহ ও সিলিকন
গ. মেফিক ও ফেলসিক ঘ. ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম

১.৫ ভূ-ত্বক গঠনকারী মৌলিক উপাদান এর সারণীর ৩নং স্থানে আছে-

ক. অক্সিজেন খ. এলুমিনিয়াম
গ. সিলিকন ঘ. ম্যাগনেসিয়াম

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী** (সময় ৩X৩ = ৯ মিনিট) ঃ

১. ভূ-ত্বকের সৃষ্টি কিভাবে হয়?
২. ভূ-ত্বক গঠনকারী প্রধান উপাদানগুলো কি কি?
৩. জলভাগ ও স্থলভাগের বিন্যাস এর দু'টি বৈশিষ্ট্য কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. ভূ-ত্বক কি? ভূ-ত্বকের গঠন ও উপাদান সম্পর্কেলিখুন।
২. ভূ-ত্বক সম্পর্কে তথ্য আহরণের উৎস কি? স্থল ও জলভাগের বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.৩ : খনিজ (Mineral)

এই পাঠে আমরা পৃথিবীর পাতলা বহিরাবরণ, যা ভূ-ত্বক নামে পরিচিত তার গঠনকারী উপাদান খনিজ এবং তার ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলী এবং ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে -

- ◈ খনিজ এর গঠনকারী উপাদান
- ◈ খনিজের ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলী এবং
- ◈ খনিজের ধরন সম্পর্কে।

ভূ-ত্বক বিভিন্ন প্রকার খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত। বিভিন্ন প্রকার খনিজের সংমিশ্রণে শিলা গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠে নানা রকম রাসায়নিক মৌলিক উপাদান রয়েছে। এদের কয়েকটি একত্রে মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং এগুলোই খনিজ। তবে কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে যারা শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন: সোনা, রূপা, হীরা, তামা, গন্ধক প্রভৃতি। প্রত্যেকটি খনিজ রাসায়নিক উপাদান দ্বারা এমনভবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যে উহাদের দ্বারা গঠিত খনিজ পদার্থের ধর্ম ভিন্ন থাকে।

*রাসায়নিক মৌলিক উপাদান, যৌগিক*

*শিলা খনিজ দ্বারা তৈরী না খনিজ শিলা দ্বারা তৈরী?*

## খনিজের গঠন

অধিকাংশ খনিজ পদার্থই দুই বা ততোধিক উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত। কতকগুলি খনিজ পদার্থের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট বা স্থির। যেমন- কোয়ার্টজ।

সিলিকনের একটি পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের দুইটি পরমাণুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে কোয়ার্টজ ($Si0_2$) এর একটি অণু গঠিত হয়। তবে বেশীর ভাগ খনিজের গঠন পরিবর্তনশীল।

## খনিজের গুরুত্ব

ভূ-পৃষ্ঠে এ পর্যন্ত ১০৫টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও কম উপাদানবহুল পরিচিত ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ১০৫ টি মৌলিক উপাদানের মধ্যে মাত্র ১৫ টি উপাদান দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ৯৯ শতাংশেরও বেশী অংশ গঠিত হয়েছে। সারণি ৩.৩.১-তে এই উপাদানগুলোর তালিকা দেয়া হল।

*১০৫ টি মৌলিক*

সারণি ৩.৩.১ : **ভূ-পৃষ্ঠের ৯৯ শতাংশ গঠনকারী উপাদানসমূহ**

| ক্রমিক নং | মৌলিক উপাদান | সাংকেতিক চিহ্ন | ভূ-পৃষ্ঠের শতাংশ |
|---|---|---|---|
| ১. | অক্সিজেন (Oxygen) | $O_2$ | ৪৬.৪৬ |
| ২. | সিলিকন (silicon) | Si | ২৭.৬১ |
| ৩. | এলুমিনিয়াম (Aluminium) | Al | ৮.০৭ |
| ৪. | লৌহ (Iron) | Fe | ৫.০৬ |
| ৫. | ক্যালসিয়াম (Calcium) | Ca | ৩.৬৪ |
| ৬. | সোডিয়াম (Sodium) | Na | ২.৭৫ |
| ৭. | পটাসিয়াম (Potasium) | k | ২.৫৮ |
| ৮. | ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) | Mg | ২.০৭ |
| ৯. | টিটানিয়াম (Titanium) | Ti | ০.৬২ |
| ১০. | হাইড্রোজেন (Hydrozen) | H | ০.১৪ |
| ১১. | ফসফরাস (Phosphorus) | P | ০.১২ |
| ১২. | ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) | Mn | ০.১০ |
| ১৩. | কার্বন (Carbon) | C | ০.০৯ |
| ১৪. | সালফার (Sulphur) | S | ০.০৬ |
| ১৫. | ক্লোরিন (Chlorine) | cl | ০.০৫ |
| **মোট** | | | **৯৯.৪২** |

*অক্সিজেন ও সিলিকন।*

উপরোক্ত মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ অক্সিজেন ও সিলিকন দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ৭৪.০৭% বা চার ভাগের তিনভাগ গঠিত হয়েছে। মোট ১০৫ টি উপাদানের মধ্যে ১৫টি উপাদান দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ৯৯.৪২% ভাগ গঠিত এবং বাকী ৯২টি উপাদানের মোট পরিমাণ হল মাত্র ০.৫৮%।

*ভূ-পৃষ্ঠ গঠনকারী মূখ্য উপাদান কয়টি?*

*খনিজের দেড় হাজারের মত*

ভূ-পৃষ্ঠে খনিজের প্রায় দেড় হাজারের মত প্রজাতি রয়েছে। সোনা, রূপা, তামা, হীরা, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি খনিজের পরিমাণ খুব কম। আবার তেজস্ক্রিয় খনিজের পরিমাণ এতই কম যে তা খুঁজে বের করা খুব কঠিন। এদের মধ্যে রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম, জিরকন, প্লাটিনাম প্রভৃতি বহু ভারী পদার্থ রয়েছে। বিভিন্ন পারমানবিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তেজস্ক্রিয় খনিজের মূল্য অপরিসীম।

*বায়বীয় তরল ও কাঠন।*

ভূ-ত্বক গঠনকারী এ খনিজ পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকে যেমন: বায়বীয়, তরল ও কঠিন। খনিজ আমাদের বর্তমান সভ্যতার বেশ কিছু চাহিদা মিটিয়ে থাকে তার বিভিন্ন রূপে। যেমন: ভারি খনিজ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম পারমানবিক চুল্লীতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহার আছে। এদের তালিকা দেয়া হল।

সারণী ৩.৩.২ : *উল্লেখযোগ্য খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহার:*

| খনিজের নাম | সংকেত | অর্থনৈতিক ব্যবহার |
|---|---|---|
| হেমাটাইট | $Fe_20_3$ | লোহার আকরিক |
| মেগনেটাইট | $Fe_30_4$ | লোহার আকরিক |
| কোরানডাম | $Al_20_3$ | জেমস্টোন, ঘর্ষণ |
| গেলেনা | Pbs | সীসার আকরিক |
| স্ফেলেরাইট | Zns | দস্তার আকরিক |
| পাইরাইট | $FeS_2$ | সালফিউরিক এসিড উৎপাদন |
| চেলকোপাইরাইট | $CuFeS_2$ | তামার আকরিক |
| জিপসাম | $CaSo4\text{-}2H_20$ | প্লাস্টার |
| এনহাইড্রাইট | CaSo4 | প্লাষ্টার |
| সোনা | Au | বাণিজ্যিক কাজও গহনা |
| তামা | Cu | তড়িৎ পরিবাহী |
| হীরা | C | জেমন্টোন, ঘর্ষন |
| সালফার | S | সালফা জাতীয় ঔষধ, রাসায়নিক |
| গ্রাফাইট | C | পেনসিলের সীস, শুষ্ক লুব্রিকেন্ট |
| ফ্লোরোইট | $CaF_2$ | স্টীল তৈরি, রাসায়নিক |
| কেলসাইট | $Calo_3$ | পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট |
| ডোলোমাইট | $CaMg(co3)_2$ | কৃষির জন্য চুন জাতীয় সার |
| কোয়ার্টজ | $Sio_2$ | গ্লাস তৈরির প্রধান উপাদান |

*খনিজ কঠিন, প্রাকৃতিক, মৌল, অজৈব, রাসায়নিক গঠন, ভৌত ধর্ম।*

## খনিজের গুণাবলী

১. এটি কঠিন স্ফটিকাকার হবে।
২. এটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট।
৩. এটি এক, দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত।
৪. এটি অজৈব হবে।
৫. এর নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন থাকবে।
৬. এর সুনির্দিষ্ট ভৌত ধর্ম থাকবে।

*খনিজের কি কি গুণাবলী থাকতে হবে?*

## খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম

*রাসায়নিক ও ভৌত*

প্রত্যেকটি খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে খনিজ চিনতে পারা যায়। একটি খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মসমূহ এর রাসায়নিক গঠন ও আণবিক কাঠামোর খনিজের যে কোন অংশের গুণাবলী সমবৈশিষ্ট পূর্ণ হবে। যেমন: আফ্রিকার কোন খনি থেকে পাওয়া লোহা আকরিক হেমাটাইট-এর গুণাবলী ভারতের কোন খনি থেকে আহরিত হেমাটাইটের মতই অনুরূপ রাসায়নিক ও ভৌত গুণাবলী সম্পন্ন হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খনিজ ও তার গঠিত শিলা যে প্রাকৃতিক অবস্থায়ই সৃষ্টি হউক না কেন, এদের প্রকৃতি আণবিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।

*একটি নির্দিষ্ট খনিজের প্রতিটি অংশের গুণাবলী কি এক?*

## খনিজের আণবিক গঠন

যেকোন মৌলর ক্ষুদ্রতম একক পরমাণু। এই ক্ষুদ্রতম পরমাণু দুটি মৌলের সংযুক্তিতে সহায়তা করে থাকে। একটি পরমাণুর সংলিকৃত কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস (Nucleus)। নিউক্লিয়াস ধণাত্মক চার্জবাহী প্রোটন ও নিরপেক্ষ নিউট্রন নামক পদার্থ ধারণ করে আছে। এর চারদিকে ঋণাত্মক চার্জবাহী ইলেকট্রন নামক পদার্থ ঘুরছে। পরমাণুর কেন্দ্রে ধারণকৃত প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা পারমানবিক সংখ্যা ও মৌলের নাম নির্ধারিত হয়। যেমন: ৬টি প্রোটন বিশিষ্ট সব পরমাণু কার্বন এবং ৮টি প্রোটন বিশিস্ট সব পরমাণু অক্সিজেন।

*নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন, প্রোটিন, নিউট্রন*

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্রানাইট শিলা গঠনকারী কোয়ার্টিজ ($Si0_2$) খনিজের কথা। এখানে সিলিকন ও অক্সিজেন রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হয়ে সিলিকন ডাইঅক্সাইড নামে খনিজ উৎপন্ন করে। এই খনিজ এর ধর্ম উক্ত উভয় মৌল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম বিশিষ্ট।

*দুটি ভিন্ন মৌল হতে উৎপন্ন একটি খনিজের ধর্ম ঐ মৌল দুটির ধর্ম হতে স্বতন্ত্র। (হ্যা অথবা না)*

নিচের ছকের মাধ্যমে গ্রানাইট শিলা গঠনকারী কোয়ার্টজ খনিজের গঠন কাঠামো দেখানো হলো:

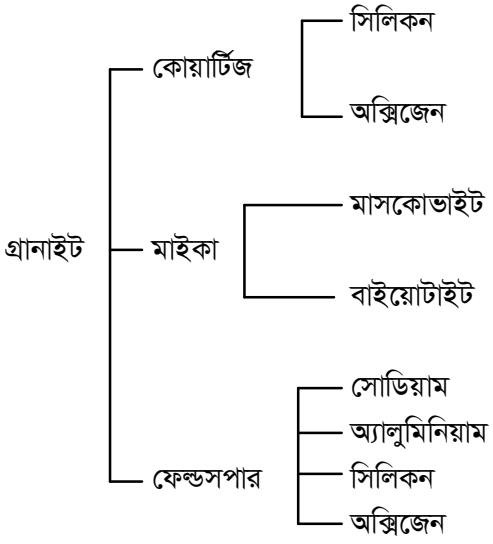


*চিত্র ৩.৩.১: শিলা ও খনিজের গঠন কাঠামো।*

এখানে একটি জিনিস উল্লেখ্য যে ম্যাগনেটাইট শিলার খনিজ উপাদান শুধুমাত্র তখনই দৃশ্যমান হয় যখন ঐ শিলা তীব্রভাবে চৌম্বত্ব প্রাপ্ত হয়।

*খনিজের নিজস্ব ভৌত ধর্ম থাকে।*

## খনিজের ভৌত ধর্ম

প্রত্যেকটি খনিজের নিজস্ব ভৌত বৈশিষ্ট্য থাকে, এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একটি খনিজ থেকে সহজেই অন্য খনিজকে পৃথক করা যায়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

কেলাসরূপ (Crystal form)
দ্যুতি (Lustre)
বর্ণ (Colour)
কষ (Streak)

কাঠিণ্যতা (Hardness)
চিড় (Cleavage)
ফাঁটল (Fracture) ও
আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)।

**কেলাস**

এটি খনিজের বাহ্যিক রূপ। এটি মূলত: পরমাণুর ভিতরের সুবিন্যস্ত আয়োজন প্রকাশ করে। একটি খনিজকে বাধাহীন বাড়তে দিলে, আলাদা আলাদাভাবে পূর্ণ কেলাস প্রকাশিত হয়।

*দ্যুতি, বর্ণ, কষ কাঠিন্যতা, ফাঁটল*

**দ্যুতি:** খনিজের পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন মাত্রার ওপর দ্যুতি নির্ভর করে। দ্যুতি দু'ধরনের ধাতব এবং অধাতব, অধাতব দ্যুতি বিভিন্ন বিশেষণে প্রকাশ করা হয়। যেমন: কাঁচিক, মুক্তার মত, রেশমি, মেটে, অনুজ্জ্বল, মসৃন ইত্যাদি।

**বর্ণ:** খনিজের বর্ণ একটি বৈশিষ্ট হলেও বর্ণের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলী ও খনিজ নির্ধারনে ব্যবহার করা উচিত। যেমন: কোয়ার্টজ খনিজে স্বল্প মাত্রার অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণ ভেদে তা গোলাপী, বেগুনী, সাদা, এমনকি কালোও হতে পারে।

**কষ:** খনিজ পাউডার অবস্থায় যে বর্ণ প্রকাশ করে তাকে কষ বলে। কষ্টি পাথরের সঙ্গে খনিজ ঘষলে এ পাউডার পাওয়া যায়। কষ দেখে ধাতব এবং অধাতব দ্যুতি সহজে আলাদা করা যায়।

**কাঠিন্যতা:** এটি খনিজের গায়ের আঁচড় বা দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। খনিজের কাঠিণ্যতা একটি আপেক্ষিক ধর্ম। কাঠিণ্যতা জানা আছে এমন একটি খনিজের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে অজানা খনিজের কাঠিন্যতা জানা যায়। শিলার কাঠিন্যতা পরিমাপের মাপনীকে 'মোহ' কাঠিন্যতা মাপনী নামে পরিচিত। মোহ একজন বিজ্ঞানীর নাম। এ মাপনীতে সবচেয়ে নরম (১) থেকে কঠিনতম (১০) মোট ১০টি খনিজ ব্যবহৃত হয়।

নিচে এ সমস্ত খনিজের একটি তালিকা দেওয়া হল:

সারণী ৩.৩.৩ : **খনিজের কাঠিন্যতা**

| কাঠিন্যতা | খনিজের নাম | সমকাঠিন্যতা সম্পন্ন বস্তু |
|---|---|---|
| ১ | টেল্‌ক | |
| ২ | জিপসাম | আঙুলের নখ |
| ৩ | ক্যালসাইট | তামা মুদ্রা |
| ৪ | ফ্লোরাইট | চাকুর ব্লেড |
| ৫ | এপাটাইট | গ্লাস প্লেট |
| ৬ | অর্থক্লেজ | -- |
| ৭ | কোয়ার্টজ | স্টীল ফাইল |
| ৮ | টোপাজ | -- |
| ৯ | কোরানডাম | -- |
| ১০ | হীরা | -- |

*আপেক্ষিক ধর্ম, মোহ কাঠিন্যতা মাপনী।*

**ফাঁটল:** খনিজের ফাঁটলের ভিন্নতা দেখে খনিজ নির্ণয় করা যায়। প্রধান ফাঁটল বৈশিষ্টগুলো হল শাংখিক, সুষম, অসম, দাঁতাল ও বন্ধুর।

**আপেক্ষিক গুরুত্বঃ** এটি খনিজের ওজনের তুলনায় একই আয়তনের পানির ওজনের অনুপাত। যেমনঃ কোন খনিজের ওজন সম আয়তন পানির ওজনের চেয়ে ২গুণ বেশি হলে উক্ত খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে ২ (এছাড়াও খনিজের স্বাদ, ঘ্রাণ, স্থিতিস্থাপকতা, অনুভূমি, চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য, দ্বৈত প্রতিসরণ এবং হইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

## পাঠ সংক্ষেপ

পৃথিবীর পাতলা বহিরাবরণ যা ভূ-ত্বক নামে পরিচিত তা গঠনকারী উপাদান খনিজ নামে পরিচিত। এই সকল খনিজের মিশ্রণে শিলা গঠিত। খনিজ পদার্থ তরল বায়বীয় ও কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। ভূ-ত্বক গঠনকারী উপাদান ছাড়াও খনিজ মানুষের নানা রূপ অর্থনৈতিক কাজে এবং বর্তমান সভ্যতার বেশ কিছু চাহিদা মিটিয়ে থাকে। খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম রয়েছে। এই ধর্ম দ্বারা খনিজকে আলাদা করা যায় পরস্পর থেকে। এছাড়া প্রতিটি খনিজের আলাদা আণবিক গঠন কাঠামো আছে। এটা রাসায়নিক ধর্ম। ভৌত ধর্ম ও খনিজের পার্থক্য বা একটি খনিজ থেকে অন্য খনিজ এর পার্থক্য সনাক্ত করণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ খনিজ উপাদানের মিশ্রণকে বলে-
ক. শিলা খ. অণু
গ. মৌল ঘ. পরমাণু

১.২ পারমানবিক চুল্লীতে ব্যবহৃত হয় কোন খনিজ-
ক. দস্তা, তামা, নিকেল খ. হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, জিধ
গ. ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম ঘ. অক্সিজেন, টিটানিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ

১.৩ ভূ-পৃষ্ঠ গঠনকারী মূখ্য উপাদান কয়টি?
ক. ১৫টি খ. ১০টি
গ. ১৬টি ঘ. ৮৮টি

১.৪ সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয় যে খনিজ হতে-
ক. জিপসাম খ. পাইরাইট
গ. গেলেনা ঘ. তামা

১.৫ ৭ কাঠিন্যতা কোন খনিজের-

ক. টেল্‌ক খ. কোর্য়াটজ

গ. হীরা ঘ. টোপাজ

**২. শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

২.১ সিলিকনের একটি পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের দুইটি পরমাণুর রাসায়নিক সংমিশ্রনে ... ... ... ... এর একটি অণু গঠিত হয়।

২.২ ভূ-পৃষ্ঠে এ পর্যন্ত ... ... ... ...টি মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়েছে।

২.৩ খনিজের পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন মাত্রার ওপর ... ... ... ... নির্ভর করে।

২.৪ খনিজ পাউডার অবস্থায় যে বর্ণ প্রকাশ করে তাকে ... ... ... ... বলে।

২.৫ ... ... ... ... একটি খনিজের গাঁয়ের আঁচড় বা দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী** (সময় ৫X২ = ১০ মিনিট) ঃ

১. খনিজ বলতে কি বুঝেন?

২. খনিজের গুরুত্ব কি?

৩. খনিজের গুণাবলী কি?

৪. খনিজের ভৌত গুণাবলী কি?

৫. খনিজের কাঠিন্যতা মাপনী কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. খনিজের গুরুত্ব ও খনিজের রাসায়নিক ভৌত ধর্ম বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.৪ : শিলা (Rock)

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ শিলা পরিবার কি?
- ◈ শিলার শ্রেণী বিভাগ।

## শিলা পরিবার

*শিলা পরিবার, ভূ-*

বিভিন্ন ধরনের শিলাকে একত্রে শিলা পরিবার বলা যায়। মানব সমাজে আমরা যেমন একে অপরের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে থাকি, তেমনি বিভিন্ন ধরনের শিলা নানা ভাবে একত্রিত হয়ে বা পারস্পরিক সহাবস্থানে ভূ-ত্বক গঠন করে থাকে।

## শিলা পরিবারের বৈশিষ্ট্য

*পারস্পারিক সহাবস্থান, বন্ধন, সংমিশ্রণ।*

- ❑ এরা পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে ভূ-ত্বক গঠন করে।
- ❑ এরা প্রাকৃতিকভাবে বন্ধনে আবদ্ধ।
- ❑ বিভিন্ন প্রকার শিলার সংমিশ্রণই মৃত্তিকার উৎস।

*শিলা পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?*

## শিলার শ্রেণীবিভাগ

ভূ-ত্বক নানাজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভূ-ত্বক গঠনকারী এসকল পদার্থকে সাধারণভাবে শিলা বলে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-ত্বকের সকল কঠিন পদার্থই শিলা। এগুলো গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত বা কাঁদার মত নরমও হতে পারে। ভূ-ত্বক নানা উপায়ে গঠিত হয়েছে বলে এতে নানা প্রকার শিলা পাওয়া যায়। কাজেই শিলাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

- ❑ আগ্নেয় শিলা
- ❑ পাললিক শিলা
- ❑ রূপান্তরিত শিলা

*শীতল ও ঘনীভূত।*

**আগ্নেয়শিলা** (Igneous Rocks) **:** আদিম অবস্থায় পৃথিবী উত্তপ্ত গলিত অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে কঠিন হয়ে যে শিলার উৎপত্তি তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এই শিলার সৃষ্টি হয়েছিল তাই একে আগ্নেয় শিলা বলা হয়। কারণ ইগনিয়াস (Igneous) শব্দের অর্থ আগুন। সকল প্রকার শিলার মধ্যে আগ্নেয়শিলা সর্ব প্রথম সৃষ্টি হওয়ায় একে প্রাথমিক শিলাও (Primary Rock) বলা হয়। ইহার মধ্যে স্তর নাই বলে একে অস্তরীভূত শিলাও (Unstratified) বলা হয়। উদাহরণ: ব্যাসাল্ট, গ্রানাইট, গ্যাব্রো।

*ইগনিয়াস, প্রাথমিক অস্তরীভূত শিলা।*

*আগ্নেয়শিলার উৎপত্তি কোথা থেকে?*

*চিত্র ৩.৪.১ : আগ্নেয় শিলা*
*ছবি: N. king Huber. U.S Geological survey [উৎস: Principles of Geology Gilluly. J. (Pg. 48)]*

## আগ্নেয়শিলার বৈশিষ্ট্য

**ক. স্তরবিহীন:** উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় তাই এদের মধ্যে কোন স্তর থাকে না।

*স্তরাবহীন, জীবাশ্মবিহীন, কেলাসিত, অপ্রবেশ্য, সুদৃঢ় ও সুসংহত এবং প্রাচীনতম।*

**খ. জীবাশ্ম বিহীন:** এত উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থেকে আগ্নেয়শিলার উৎপত্তি যে ওখানে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব আশা করা যায় না। এ ছাড়াও কোন কোন আগ্নেয়শিলার উৎস ভূ-গর্ভের এত নীচে যে সেখানে কোন জীবও থাকেনা। এ কারণে এ জাতীয় শিলার মধ্যে জীবাশ্ম পাওয়া যায় না।

গ. **কেলাসিতঃ** উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে এ জাতীয় শিলা ক্ষেত্র বিশেষে কেলাসিত হয় বা নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধে।

ঘ. **অপ্রবেশ্যঃ** আগ্নেয় শিলার দানাগুলির মধ্যে কোন ছিদ্র না থাকায় এই শিলায় পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই আগ্নেয়শিলা জিবাশ্ম বিহীন।

ঙ. **সুদৃঢ় ও সুসংহতঃ** উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে উৎপন্ন হয় বলে এ শিলা সুদৃঢ় ও সুসংহত।

চ. **প্রাচীনতমঃ** আগ্নেয়শিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। এই শিলা থেকে অন্যান্য শিলার উৎপত্তি হয়েছে।

*আগ্নেয়শিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি?*

## পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)

*প্রাথামক শিলা সঞ্চায়ন জমাট বেঁধে স্তরীভূত।*

ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক শিলাগুলো যুগ যুগ ধরে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, সাগর তরঙ্গ প্রভৃতির নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খন্ড বিখন্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালি, কাঁকর, কাঁদা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ক্ষয়িত এই অংশগুলি নদী প্রবাহ, বৃষ্টির পানিধারা, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বাহিত হয়ে বিভিন্ন সমুদ্র, হ্রদ বা অন্য কোন নিম্নভূমিতে পলিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে বহু বৎসর ধরে পলি জমা হয়ে স্তরের সৃষ্টি করে। কালক্রমে উপরিভাগের বিশাল পানিরাশি ও পলিস্তরের ভয়ানক চাপে, ভূ-গর্ভের তাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিম্নস্থ স্তরগুলি ক্রমশ জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। পলি দ্বারা গঠিত হয় বলে একে পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks) বলে। আবার এই জাতীয় শিলা স্তরে স্তরে গঠিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও (Stratified) বলে।

*পাললিক শিলা, স্তরীভূত শিলা।*

*পাললিক শিলা তৈরির প্রক্রিয়া কি?*

### পাললিক শিলার উদাহরণ

চুনাপাথর, বেলে পাথর, পাথুরিয়া কয়লা, সৈন্ধব লবন, খড়িমাটি প্রভৃতি পাললিক শিলার উদাহরণ।

### পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য

ক. **স্তরীভূতঃ** পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট হল এরা স্তরীভূত অর্থাৎ এরা স্তরে স্তরে অবস্থান করে চিত্র : ৩.৪.২ 'ঝুলন্ত তরঙ্গ চিত্র'। তাই একে স্তরীভুত শিলাও বলে। এই স্তরগুলো সাধারণত আনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকে। এই স্তর স্থুল কিংবা সূক্ষ্ম হতে পারে।

*স্তরীভূত জীবাশ্ম বিশিষ্ট অকেলাসিত তরঙ্গ চিহ্ন কোমলতা।*

খ. **জীবাশ্মবিশিষ্টঃ** পাললিক শিলাস্তরে জীবাশ্মের উপস্থিতি এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে সকল জীব এই শিলাঞ্চলে বাস করে তাদের মৃতদেহ কালক্রমে পলির নীচে চাপা পড়ে। এর ফলে উহাদের দেহের কঠিন অংশ প্রস্তরীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়। তাই পাললিক শিলা জীবাশ্ম বিশিষ্ট।

গ. **অকেলাসিতঃ** ইহা অকেলাসিত (Non-Crystalline) শিলা। কারণ ইহা কখনও উত্তপ্ত অবস্থা হতে শীতল হয়ে সৃষ্টি হয় না।

ঘ. **তরঙ্গচিত্র:** ইহা তরঙ্গ চিহ্নযুক্ত শিলা। জলভাগের তলদেশে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে ইহার মধ্যে তরঙ্গ চিহ্ন (Ripple marks) বর্তমান থাকে। আবার বায়ু দ্বারা গঠিত পাললিক শিলায় ও বাতাসের দ্বারা তরঙ্গ চিহ্নের সৃষ্টি হয়।

ঙ. **কোমলতা:** আগ্নেয়শিলার ভগ্নাংশ সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় বলে এই শিলা অন্য শিলা থেকে অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে।

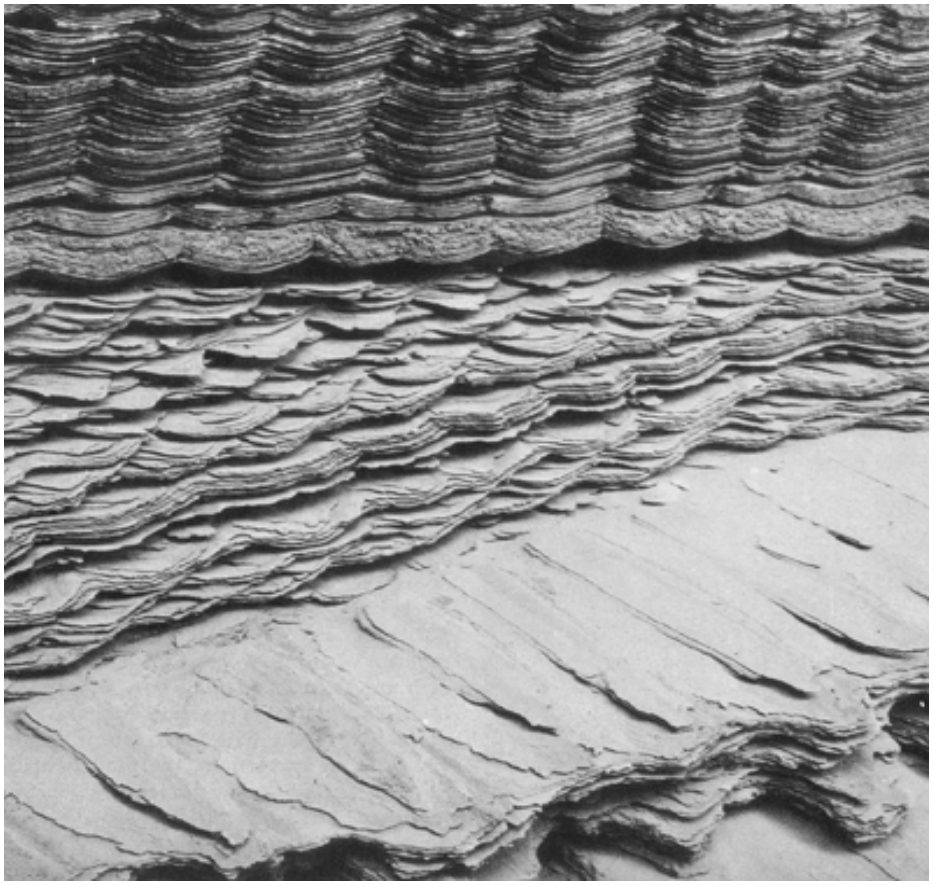

*চিত্র ৩.৪.২ : ঝুলন্ত তরঙ্গ চিত্র (climbing ripplemarked) ক্যালির্ফোনিয়ার কলোরাডো নদীর তলায় পললায়নে গঠিত পাললিক শিলা।*

*ছবি: Tad Nichols, Tucson., Arizona [উৎস: Principles of Geology Gilluly., J. (pg. 382)]*

*পাললিক শিলায় জীবাশ্ম থাকে কি?*

আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলার রূপান্তর।

**রূপান্তরিত শিলা (**Metamorphic Rock**):** আগ্নেয় এবং পাললিক এই উভয় প্রকার শিলা অত্যাধিক তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে নুতন এক প্রকার শিলায় পরিণত হয়, এই শিলাকে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা বলে। ভূ-আন্দোলন, অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের সময় উর্ধ্বস্তরের চাপে ও তাপের প্রভাবে মাঝে মাঝে আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলায় রূপ নেয়।

উদাহরণ:

চুনাপাথর (limestone) পরিবর্তিত হয়ে মার্বেল (Marble)

বেলেপাথর (sandstone) কোয়ার্টজাইটে (Quartgite)
কাঁদা (clay) স্লেটে (slate)
গ্রানাইট (Granite) নীসে (Gneiss)
কয়লা (coal) গ্রাফাইটে (Graphite) পরিণত হয়।

## রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য

**ক. কেলাসিত:** তাপ ও চাপে আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তন হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে উহা সাধারণত কেলাসিত।

**খ. কাঠিণ্য:** আগ্নেয় ও পাললিক শিলা তাপ ও চাপে পরিবতর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে রূপান্তরিত শিলা বেশি শক্ত ও মজবুত হয়।

*কেলাসিত কাঠিন্যতা জীবাশ্মবিহীন সমান্তরাল গঠন তরঙ্গ চিত্র।*

**গ. জীবাশ্মবিহীন:** ইহা জীবশ্মবিহীন শিলা। আগ্নেয়জাত শিলা থেকে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হলে জীবাশ্মের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তবে পাললিক শিলা অতিরিক্ত তাপ ও চাপে রূপান্তরিত হবার সময় উহার মধ্যকার জীবাশ্মগুলির অস্তিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়।

**ঘ. সমান্তরাল গঠন:** সমান্তরাল গঠন এই শিলার একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ ইহার উপাদানগুলি সাধারণত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এই সমান্তরাল অবস্থান আনুভূমিক, তির্যক বা বক্স যে কোন ভাবেই হতে পারে।

**ঙ. তরঙ্গ চিত্র:** তাপ ও চাপে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে এতে তরঙ্গ চিহ্ন (Ripplemarks) থাকে না।

*রূপান্তরিত শিলার উৎস কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা শিলা পরিবার অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার শিলাগুলো সহাবস্থান করছে এবং পরস্পরিক প্রাকৃতিক বন্ধনে ভূ-ত্বক গঠন করেছে, এ সম্পর্কে জানতে পারলাম। এছাড়াও শিলার শ্রেণীবিভাগ এবং ভূ-ত্বক গঠনকারী এই বিভিন্ন প্রকার শিলার একে অপরের পাথর্ক্য ও তাদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের চেষ্টা করলাম। দেখা যাচ্ছে , আগ্নেয়শিলা আদি শিলা। এর থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তলানী জমে পাললিক শিলার সৃস্টি। রূপান্তরিত শিলা আগ্নেয় ও পাললিক শিলার রূপান্তরিত রূপ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময়- ৫ মিনিট) ঃ

১.১ শিলা পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে ... ... ... গঠন করে।

১.২ শিলা গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত অথবা কাঁদার মত ... ... ... ... হতে পারে।

১.৩ আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি সর্বপ্রথম হওয়ায় একে ... ... ... ... শিলাও বলে।

১.৪ পাললিক শিলা ... ... ... ... সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়।

১.৫ তরঙ্গ চিহ্ন থাকে না ... ... ... ... ও ... ... ... ... শিলায়।

২. **সঠিক উত্তর দিন** (সময়- ৫ মিনিট) ঃ

২.১ অপ্রবেশ্য শিলার উদাহরণ আগ্নেয়শিলা। (হ্যা অথবা না)

২.২ পাললিক শিলা অন্তরিভূত শিলা। (হ্যা অথবা না)

২.৩ চুনা পাথর পাললিক শিলার উদাহরণ। (হ্যা অথবা না)

২.৪ রূপান্তরিত শিলা শুধুমাত্র পাললিক শিলা থেকে হতে পারে। (হ্যা অথবা না)

২.৫ গ্রানাইট রূপান্তরিত হয় নিজে। (হ্যা অথবা না)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন** (সময়- ৪X২= ৮ মিনিট) ঃ

১. শিলা পরিবারের বৈশিষ্ট্য কি?

২. আগ্নেয়শিলার বৈশিষ্ট্য কি কি?

৩. পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪. রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. শিলা পরিবার বলতে কি বুঝায়? শিলার শ্রেণীবিভাগ করুন ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

# পাঠ ৩.৫ : আগ্নেয়শিলা (Igneous Rock)

এ পাঠে আমরা যা জানব-

- ◈ আগ্নেয়শিলা কাকে বলে;
- ◈ আগ্নেয়শিলার বুনট;
- ◈ আগ্নেয়শিলার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে।

## আগ্নেয়শিলা কাকে বলে

*ম্যাগমা, শীতল ও কেলাসিত,*

ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয়শিলা গঠিত হয়। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার শুরুতেই এর বহির্ভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ সমস্ত পদার্থ ধীরে ধীরে শীতল ও কেলাসিত হয়ে পৃথিবীর আদি ভূ-ত্বক সৃষ্টি করে।

আগ্নেয়শিলার প্রধান উপাদান ম্যাগমা গুরুমন্ডলের উপরিভাগ থেকে ওপরে উঠে আসে। ভূ-অভ্যন্তরের গভীর তলদেশ থেকে (প্রায় ২০০ কি.মি.) ভূ-পৃষ্টের দিকে যাত্রা পথে ম্যাগমা কখনও ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরেই জমাট বদ্ধ হয়। আবার কখনও বা ম্যাগমা ভূ-ত্বকের গভীরে ফাঁটল বরাবর সজোরে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসে।

*আগ্নেয়শিলার সংজ্ঞা দিন।*

## আগ্নেয়শিলার বুনট

*মিহি, বুনট, মোটা*

শিলার বুনট বলতে এর গঠনকারী খনিজ উপাদানের আকার, আকৃতি বুঝায়। শিলার বুনট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিলার উৎপত্তির সময় কি ধরনের পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া কাজ করছে তা বুনটের বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। যেমন, ম্যাগমা খুব দ্রুত শীতল ও কেলাসিত হয়ে মিহি বুনটের শিলা গঠন করে। যেমন- রাইয়োলাইট।

ম্যাগমা ধীরে ধীরে শীতল হলে মোটা বুনটের শিলা গঠন করে। যেমন- গ্রানাইট।

আগ্নেয় শিলায় প্রধানত: ৫ ধরনের বুনট দেখা যায়। যথা-

১. কাঁচের মত দানাহীন, যেমন গ্লাস;

২. এফেনিটিক (Aphanitic) অতি সুক্ষ দানা খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন-ব্যাসল্ট, অ্যান্ডেসাইট।

*কাঁচের মত, এফেনিটিক, ফেনারিটিক, পরফাইটিক*

৩. ফেনারেটিক (Phaneritic) ক্ষুদ্র দানা কিন্তু খালি চোখে দেখা যায়, যেমন- গ্রানাইট।

৪. পরফাইটিক (Porphytic) দুই ধরনের দানা বিশিষ্ট (বড় ও ছোট), যেমন - পরফাইটিক রায়োলাইট।

৫. পাইরোক্লাস্টিক (Pyroclastic) বৃহৎ আকৃতির দানা বিশিষ্ট আগ্নেয় শিলা। যেমন, টাফ (Tuff) ও ছাই-ধুম্র।

*পাঁচ ধরনের বুনটের পাঁচটি উদাহরণ দিন।*

## আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ

আগ্নেয়শিলাকে নিম্নলিখিত দুই ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। যথা ঃ

১. গঠনকারী খনিজ উপাদানের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়শিলাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. ফেলসিক: অধিক পরিমাণ ফেলড্সপার, সিলিকা মিশ্রিত থাকে বলে এই নামে পরিচিত। এরা হালকা বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন- গ্রানাইট, রাইয়োলাইট।

*গঠনকারী খনিজ উপাদান এবং উৎপাদিত গঠনভেদে।*

খ. মেফিক: এতে ম্যাগনেশিয়াম ও লোহার আধিক্য থাকে। এরা ব্যাসল্ট জাতীয়। ধুসর থেকে কালো বর্ণের হয়। যেমন, ব্যাসল্ট, গ্যাব্রো।

গ. ফেলসিক ও মেফিকের মাঝামাঝি: এরা এ্যান্ডেসাইট জাতীয়। প্রধান খনিজ হল হর্নব্লেন্ড, সোডিয়াম, ফেলস্পার, বর্ণ গাঢ়। যেমন - ডাইয়োরাইট, অ্যান্ডেসাইট।

ঘ. উচ্চমাত্রায় মেফিক: অধিক মাত্রায় লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। প্রধান খনিজ হল অলিভিন, পাইরক্সিন। গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্নের। যেমন, পেরিডোটাইট, কমাডোটাইট।

*খনিজ উপাদান ভিত্তিক আগ্নেয় শিলাগুলির গুনাগুন ও উদাহরণ দিন।*

২. উৎপত্তিগতভেদে আগ্নেয়শিলা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- ক) বহিঃজ খ) অন্তঃজ

*গলিত পদার্থ।*

**ক. বহিঃজ আগ্নেয়শিলা:** পৃথিবীর ভিতরের গলিত পদার্থ জ্বালামুখ বা ফাঁটল দিয়ে বাইরে নির্গত হয়ে ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যে শিলা হয় তাহাই বহিজ: আগ্নেয়শিলা। যেমন, ব্যাসল্ট, পিউমিক। এই শিলা আবার দুই প্রকার। যথা -

**১. বিষ্ফোরক:** অগ্ন্যুৎপাতের সময় কিছু পদার্থ প্রচন্ড বেগে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পতিত হয় এবং পরে জমাট বেঁধে শিলা হয় বলে বিষ্ফোরক আগ্নেয়শিলা বলে।

*প্রচন্ড বেগে।*

**২. শান্ত:** অগ্ন্যুৎপাতের সময় অপেক্ষাকৃত ভারী গলিত পদার্থ ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্টে পতিত হয়ে শিলায় পরিনত হয় বলে শান্ত আগ্নেয়শিলা বলে।

*অপেক্ষাকৃত ভাবী গালিত পদার্থ।*

**খ. অন্তঃজ আগ্নেয়শিলা:** কোন কোন সময় তরল ম্যাগমা ভূ-পৃষ্টে পৌঁছুতে না পেরে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই জমাট বেধেঁ অন্ত:জ শিলা গঠন করে। এই শিলা আবার দুই প্রকার। যথা -

*তরল ম্যাগমা।*

**১. পাতালিক:** ভূ-পৃষ্টের বহু নীচে অবস্থিত এই শিলা সম্পূর্ণ কেলাসিত। যেমন- গ্যাব্রো।

*কেলাসিত, জমাট বেঁধে।*

**২. উপ-পাতালিক:** ভূ-গর্ভস্থ ম্যাগমা উপরে আসার সময় ভূ-পৃষ্টের কাছাকাছি এসে জমাট বেঁধে এই শিলা গঠন করে। যেমন-ডলোরাইট।

## পাঠ সংক্ষেপ

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আঁঠালো পদার্থ দ্বারা গঠিত। এদের ম্যাগমা বলে। ভূ আভ্যন্তরীণ নানা প্রকৃয়ার ফলে এই ম্যাগমা ভূ-ত্বকের নানা দূর্বল পথে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-অভ্যন্তরের এই উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয়শিলা গঠন করে। আগ্নেয় শিলার গঠনকারী খনিজ উপাদানের আকার, আকৃতি ও বিন্যাসের উপর নির্ভর করে পাঁচ ধরনের বুনট দেখা যায়। যেমন কাঁচের মত দানাহীন, ফেনারেটিক, পারফাইটিক ও পাইরোক্লাস্টিক। এছাড়াও আগ্নেয়শিলাকে দুইভাবে শ্রেনীবিভাগ করা যায়। গঠনকারী খনিজ উপাদানের ওপর ভিত্তি করে এবং উৎপত্তিগত ভাবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন** (সময়- ৫ মিনিট) ঃ

১.১ ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও ... ... ... ... হয়ে আগ্নেয় শিলা গঠিত হয়।

১.২ প্রচন্ড বেগে যে বহি:জ আগ্নেয় শিলা পতিত হয় তাকে ... ... ... ... ... বলে।

১.৩ মেফিক শিলার উদাহরণ হল ... ... ... ...।

১.৪ উচ্চ মাত্রার মেফিক আগ্নেয় শিলার উদাহরণ হল ... ... ... ...।

১.৫ উৎপত্তিগতভাবে আগ্নেয়শিলা দুই ভাগে বিভক্ত বহি:জ ও ... ... ... ...।

**২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন** (সময়- ৫ মিনিট) ঃ

২.১ আগ্নেয় শিলায় বুনট চার ধরনের হয়।

২.২ গঠনকারী খনিজ উপাদানের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়শিলাকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

২.৩ উৎপত্তি ও গঠনভেদে আগ্নেয়শিলাকে বহি:জ, অন্ত:জ এবং মাধ্যমিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

২.৪ বহি:জ আগ্নেয়শিলা দুই প্রকার বিস্ফোরক এবং শান্ত।

২.৫ অন্ত:জ আগ্নেয়শিলা দুই প্রকার পাতালিক ও উপপাতালিক।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন** (সময়- ৩X২ = ৬ মিনিট) ঃ

১. আগ্নেয়শিলা কাকে বলে।

২. আগ্নেয়শিলার বুনট গুলি কি কি?

৩. আগ্নেয়শিলার শ্রেণীবিভাগ করুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আগ্নেয় শিলা কাকে বলে? আগ্নেয় শিলার বুনট সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

২. আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ দিন।

# পাঠ ৩.৬ : পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

পাললিক শিলা

এই পাঠে আমরা যা জানব-

- ◈ পাললিক শিলা কি;
- ◈ পাললিক শিলার প্রকৃতি;
- ◈ পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ;
- ◈ পাললিক শিলার উৎপত্তি;
- ◈ পাললিক শিলার গুরুত্ব সম্পর্কে।

## পাললিক শিলা কি?

ভূ-পৃষ্টের প্রাথমিক শিলাগুলি ক্রমে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে নদী, বায়ু প্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্র,হ্রদ বা কোন নিম্নভূমিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এভাবে সঞ্চিত শিলাসমূহ উপরের স্তরের চাপে, ভূ-গর্ভের চাপে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। পলি দ্বারা গঠিত বলে একে পাললিক শিলা বলে।

*স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়।*

## পাললিক শিলার প্রকৃতি

পলি সুদৃঢ় বা জমাটবদ্ধ হয়ে যে কঠিন শিলা গঠন করে তাকেই পাললিক শিলা বলে। পলি পাললিক শিলার বিশেষ উপাদান। এটি বিভিন্ন পর্যায়ের সংমিশ্রণ হতে পারে। যেমন,

*সুদূর অতীত কালের প্রাকৃতিক পরিবেশ।*

১. অন্য শিলা বা খনিজের টুকরা, যেমন-নদীবাহিত নুড়ি,

২. রাসায়নিক অধ:ক্ষেপ, যেমন- লবন,হ্রদের লবন, চুন ইত্যাদি,

৩. জৈব পদার্থ, যেমন-প্রবাল, জলজ উদ্ভিদ।

এ সমস্ত পদার্থ সবই পলি দ্বারা গঠিত এবং পাললিক শিলায় পরিণত হতে পারে।

পাললিক শিলার পুরোনো পলি সর্ব নিম্ন স্তরে থাকে এবং উপরের দিকের স্তরের বয়স ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এই স্তর লক্ষ্য করলে দেখা যায়-

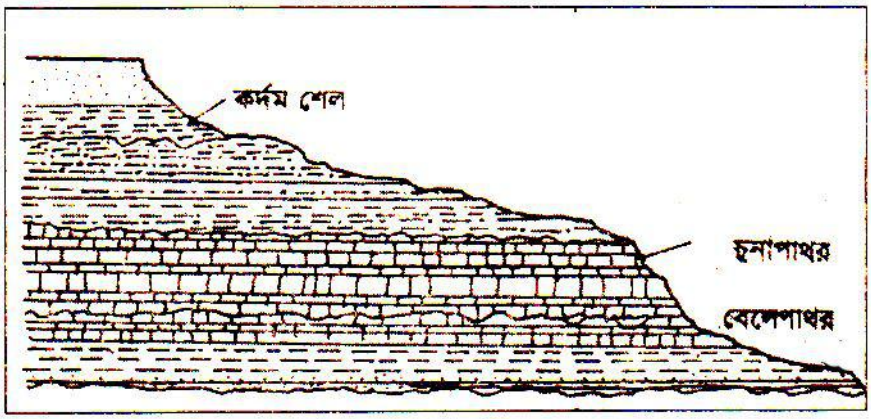


*চিত্র ৩.৬.১ : পাললিক শিলার স্তরায়ণ*

১. পাললিকশিলা বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত।

*স্তরে সাজ্জত, পরিবেশে ভিন্নধর্মী*

২. প্রতিটি স্তর কি পরিবেশে গঠিত তা প্রতিফলিত হয়।

৩. প্রতিটি স্তরের পলি ভিন্নধর্মী।

পাললিক শিলা স্তরে সুদূর অতীতকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত: জলবায়ু, ক্ষয় প্রক্রিয়া এবং প্রাচীনরূপের ভূমির চিহ্ন সংরক্ষিত থাকে, যা জীবাশ্ম নামে পরিচিত। এ সমস্ত জীবাশ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

*পাললিক শিলার স্তর গুলিতে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?*

## পাললিক শিলার শ্রেনীবিভাগ

পাললিক শিলা গঠনকারী উপাদানের আকৃতি, আকার, এবং গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

*যান্ত্রিক, রাসায়ক*

১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঞ্চিত পলি, যেমন-বেলেপাথর;

২. রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঞ্চিত পলি, যেমন-চুনাপাথর;

৩. জৈব পলি।

*লাভজাত ক্ষায়তচূর্ণ।*

১. **যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলি:** এই পলি দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-আগ্নেয় শিলার লাভাজাত এবং পূর্ববর্তী পাললিক বা রূপান্তরিত শিলার ক্ষয়িতচূর্ন। এ জাতীয় পলিসমূহের আকার ও শিলা গঠনকারী খনিজে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

*পলি অধ:ক্ষেপ।*

২. **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলি:** রাসায়নিক বিচুর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি পলি অধ:ক্ষেপ থেকে এ শিলার উদ্ভব হয়।

এ প্রক্রিয়ার পানিতে দ্রবিভূত অবস্থায় থাকা পদার্থসমূহ বিভিন্ন অজৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি তলায় থিতায় এবং

*সারণি ৩.৬.১ : যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাত পলির শ্রেণীবিভাগ*

| পলি | পলির নাম | আকার সে:মি: | শিলা |
|---|---|---|---|
| গ্রাবেল | বড় পাথর | ২৫৬ | |
| | মাঝারি পাথর | ৬৪ | |
| | নুড়ি পাথর | ৪ | কংগ্লোমারেট |
| | পাথুরে দানা/কুচি | ২ | |
| | অত্যন্ত মোটা বালি | ১ | |
| | পাথুরে দানা/কুচি | ২ | |
| বালি | মোটাবালি | ০.৫ | |
| | মধ্যম বালি | ০.২৫ | বেলেপাথর |
| | মিহি বালি | ০.১২৫ | |
| | অত্যন্ত মিহি বালি | ০.৬২৫ | |
| | সিল্ট | | *পলিপাথর* |
| কর্দম | কাঁদা | ০.০০৩১ | শেল |

*সারণি ৩.৬.২ : রাসায়নিক অধ:ক্ষেপজনিত ও জৈব পলিজাত খনিজ উপাদান ও শিলা*

| পলির ধরন | প্রধান খনিজ | উপাদান | শিলার নাম |
|---|---|---|---|
| রাসায়নিক | ক্যালসাইট | ক্যালসিয়াম কার্বনেট | চুনাপাথর |
| অধ:ক্ষেপজনিত পলি | ডলোমাইট | ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট | ডলোমাইট |
| | জিপসাম | হাইড্রাস-ক্যালসিয়াম সালফেট | জিপসাম |
| | হেলাইট | সেডিয়াম ক্লোরাইড | পাথুরে লবণ |
| জৈব পলি | চার্ট | সিলিকনডাই অক্সাইড | ডায়াটম |
| | চুন | ক্যালসিয়াম কার্বনেট | চুনাপাথর,চক,কোকিনা |
| | উদ্ভিজ্জ পদার্থ | কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন | কয়লা |

জমাটবদ্ধ হয়। যেমন কোথাও আটকে পড়া পানি বাস্পায়িত হয়ে গেলে এর সাথে দ্রবিভূত লবন থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বাস্পায়ন একটি অজৈব পক্রিয়া এবং থিতানো লবনকে পলি হিসাবে ধরা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পানিতে বসবাস কারী বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ জৈব পলি হিসাবে জমা হয় এবং শেষে জমাটবদ্ধ হয়ে রাসায়নিক অধ:ক্ষেপজাত পাললিক শিলায় রূপ নেয়। যেমন, চুনাপাথর, ক্যালসাইট, ডোলোমাইট, জিপসাম ইত্যাদি।

*রাসায়নিক অধঃক্ষেপজাত পাললিক শিলা।*

৩. **জৈব পলি (Organic Sediments):** উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ জাত পলি থেকে এ শিলার উৎপত্তি হয়। কয়লা ও চুনাপাথর এ জাতীয় পাললিক শিলার উদাহরণ। জলজ পরিবেশে অতীতে যে গাছপালা ছিল তা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভূঅভ্যন্তরে চাপা পরে যায় এবং ওপরের পলির প্রচন্ড চাপে এর পরিবর্তন হয় এবং কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের জামালগঞ্জের কয়লা এবং গোপালগঞ্জের পিট কয়লা এ জাতীয় শিলার উদাহরণ।

*উদ্ভিদ ও প্রাণীর*

## পাললিক শিলার উৎপত্তি (Origin of Sedimentay Rocks)

ভূ-পৃষ্ঠে ক্রিয়ারত বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই পাললিক শিলার উৎপত্তির জন্য দায়ী। যে সমস্ত প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো:

*ভূপৃষ্ঠে ক্রিয়ারত বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া।*

১. **বিচুর্ণীভবন (Weathering):** সৌরতাপ যে প্রক্রিয়ায় ভূ-ত্বকের উন্মুক্ত শিলার উপর কাজ করে শিলা চুর্ণবিচুর্ণ বা রাসায়নিকভাবে গলিয়ে দেয় তাকেই বিচুর্ণীভবন বলে। বিচুর্ণীত শিলা পানি প্রবাহ, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে অন্যত্র সঞ্চিত হয়।

২. **পরিবহন (Transportation):** বর্ষায় নদীর উর্ধ্ব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, এর ফলে শিলা ক্ষয়ে বিপুল পরিমানে পলির সৃষ্টি হয়। আবার বিচুর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত নদীর একপাড়ের পলি পানির স্রোতে অন্য পাড়ে সঞ্চিত হয়। নদীর স্রোতের সাহায্যে পরিবাহিত পলি বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত হয় এবং পাললিক শিলা গঠিত হয়।

*বিচুর্ণীভবন, পরিবহন সঞ্চয়ন, সুদৃঢ়করণ ও রূপান্তর।*

৩. **সঞ্চয়ন (Deposition):** পলি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া পাললিক শিলার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। পলি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈব পরিবেশে স্থল ও জলভাগে সঞ্চিত হয়। এ সমস্ত পরিবেশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পাললিক শিলার

ভূমি গড়ে উঠে। যেমন, পাহাড়ের পাদদেশে পলল পাখা, নদীর মাঝে চর, প্লাবনভূমি, সমুদ্র মোহনায় দ্বীপ, উপকুলীয় সমভূমি ও বালিয়াড়ি।

*চিত্র ৩.৬.৪ : পলল পাখা, চর, সমুদ্র মোহনায় দ্বীপ।*

৪. **সুদৃঢ়করণ ও জোড়ন (Compaction and Cementation):** সুদৃঢ়করণ প্রক্রিয়ায় আলগা ও অসংহত পলিকণা সমূহ ওপরে সঞ্চিত পলির ওজনের চাপে সুসংহত এবং পলি কণার ফাঁকে আটকে পড়া পানি ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। জোড়ন প্রক্রিয়ায় চুয়ানো পানির মাধ্যমে পলি কণার ফাঁকে চুন-সিলিকা, লোহা-অক্সাইড কণা সঞ্চিত হয়ে ফাঁকা জায়গা ভরাট করে এবং কণাসমূহ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। বেশীর ভাগ পাললিক শিলা গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আলাদাভাবে কাজ করে। তবে কখনও উভয় প্রক্রিয়া একত্রেও শিলা গঠন সম্পন্ন করে থাকে।

## পাললিক শিলার গুরুত্ব

*বর্তমান সভ্যতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের উৎস পাললিক শিলা।*

পাললিক শিলা আমাদের শিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে একটি নিয়ন্ত্রনকারী নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। আদি মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য পাললিক শিলা থেকে প্রাপ্ত উপাদান দ্বারা বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরী করেছে। বর্তমান সভ্যতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু খনিজ পদার্থ পাললিক শিলা থেকে পাওয়া যায়। যেমন-কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম। তা ছাড়া দালান-ইমারত, রাস্তা-ঘাট, পুল-ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মার্বেল, ইট, বালি, সিমেন্ট সবই আসে পাললিক শিলা থেকে। কোয়ার্টজ বালি দ্বারা গ্লাস শিট তৈরী করা হয়। শিশা, দস্তা, লোহা এ শিলায় পাওয়া যায় যা বহুবিধ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চুনাপাথর দিয়ে গ্রীকরা, রোমানরা ভাস্কর্য তৈরী করেছে যা এখনও দর্শনীয় বস্তু হিসাবে স্বীকৃত।

*পাললিক শিলা কি কি কাজে লাগে?*

## পাঠ সংক্ষেপ

পলি দ্বারা যে শিলা গঠিত হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। নানা প্রাকৃতিক মাধ্যমের সাহায্যে পলি সুদৃঢ় বা জমাট বাঁধার ফলে এই শিলায় সৃষ্টি হয়। বেলে পাথর, চূনাপাথর প্রভৃতি পাললিক শিলার উদাহরণ। কতগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন- বিচূর্ণীভবন, পরিবহন, সঞ্চয়ন, সুদৃঢ়করণ ও জোড়ন প্রভৃতির ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলেই এই শিলার উৎপত্তি হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ পাললিক শিলা -
ক) সম্পূর্ণ শিলা খ) শিলা বা খনিজের টুকরা গ) কোনটি নয়

১.২ পাললিক শিলা -
ক) স্তরিভূত খ) দানাদার গ) শীটের ন্যায়

১.৩ পাললিক শিলায়-
ক) জীবাশ্ম পাওয়া যায় খ) তেল পাওয়া যায় গ) কয়লা পাওয়া যায়

১.৪ পাললিক শিলার উৎপত্তি হয় -
ক) বিচুর্ণীভবনে খ) কেলাসনে গ) বাস্পায়নের মাধ্যমে

১.৫ কোয়ার্টজ বালি দ্বারা তৈরী হয়-
ক) প্লাষ্টিক শিট খ) গ্লাস শিট গ) সিমেন্টের শিট

**২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

২.১ পলি পাললিক শিলার বিশেষ উপাদান।
২.২ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলির উদাহরণ চুনাপাথর।
২.৩ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলির উদাহরণ বেলে পাথর।
২.৪ অধ:ক্ষেপ জনিত পলির উদাহরণ ডলোমাইট।
২.৫ জৈব পলির উদাহরণ চুন।

**নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন** (সময় ৩X২ = ৬ মিনিট) ঃ

১. সুদৃঢ়করণ ও জোড়ন বলতে কি বুঝেন?
২. পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ লিখুন?
৩. পাললিক শিলার সংজ্ঞা লিখুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পাললিক শিলা কি? পাললিক শিলার প্রকৃতি, উৎপত্তি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. পাললিক শিলা কি? এর শ্রেণীবিভাগ করুন।

# পাঠ ৩.৭ : রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)

রূপন্তরিত শিলা

এই পাঠ শেষে আমরা যা জানব–

- ◈ রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য;
- ◈ রূপান্তরিত শিলার গুরুত্ব;
- ◈ রূপান্তরিত শিলার বণ্টন;
- ◈ রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

## রূপান্তরিত শিলা কি?

আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলায় তাপ, চাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরায়ণ (Metamorphism) বলে।

## রূপান্তরিত হবার পরিবেশ

*পাঁড়ন, শ্লেট, পিট,*

একটি উদাহরণের মাধ্যমে শিলার রূপান্তর বুঝানো যায়। যেমন, শেল অসমান পীড়নের (Stress) কারণে পরিবর্তিত হয়ে সূক্ষ্ম কণা বিশিষ্ট শ্লেটে পরিণত হয়। শ্লেট দেখতে শেল এর চেয়ে ভিন্ন, অনেক শক্ত ও মজবুত এবং ভাঙলে পাতলা প্লেটের ন্যায় সমতল পিঠ পাওয়া যায়। শ্লেট আরও তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে নিস নামে উন্নত পর্যায়ের রূপান্তরিত শিলায় পরিনত হতে পারে। শিলার এ রূপান্তর মূলত: ভূত্বকের গভীর তলদেশে (প্রায় ২০ কি.মি. অভ্যন্তরে) তিন ধরনের পরিবেশে সংঘটিত হয়।

**ক.** ভূত্বকের শিলা যেখানে ম্যাগমার সংস্পর্শে এসেছে;

**খ.** ভূত্বকের অভ্যন্তরে যেখানে পর্বত গঠন প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল এবং

**গ.** ভূত্বকের গভীরে চ্যুতি বরাবর।

শিলা রূপান্তরায়ণের সময় যে দিকে চাপ কম থাকে সেদিকে নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়। ফলে একটি সমতল শিলা কাঠামো (Planer rock structure) তৈরি হয় যা পত্রায়ন (Foliation) নামে পরিচিত। রূপান্তরিত শিলা সাধারনত কঠিন ও শক্ত এবং উচ্চ আপেক্ষিক ঘনত্ব সম্পন্ন। তাছাড়া, অতি চাপে সৃষ্টি হওয়ার কারণে শিলার ভিতর কোন ফাঁকা স্থান থাকে না।

## রূপান্তরিত শিলার গুরুত্ব ও বণ্টন

*রূপান্তরিত শিলা ও আগ্নেয়শিলা একত্রিত হয়ে৮৫ ভাগ ভূ-ত্বক গঠন করেছে।*

রূপান্তরিত শিলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আগ্নেয় শিলার সঙ্গে একত্রে ভূত্বকের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ গঠন করেছে। ভূতাত্ত্বিক সময় ব্যাপী মহাদেশের যে সঞ্চারণ এবং উত্থান-পতন হয়েছে এ শিলা থেকে তা জানা যায়। এ শিলা সুদূর অতীতকালের প্লেট সঞ্চারণের স্বাক্ষ্য বহন করে।

রূপান্তরিত শিলা বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ ধারণ করে থাকে। যেমন– মার্বেল পাথর, গার্নেট, শ্লেট ও শিস্ট ইত্যাদি। স্থলভাগের উন্মুক্ত পুরোনো শিল্ডসমূহের (যেমন– কানাডীয় শিল্ড) ব্যাপক এলাকা জুড়ে রূপান্তরিত শিলা দেখা যায় (চিত্র ৩.৭.১ দেখুন)। তাছাড়া, স্থির প্লাটফরম (Stable

platform) সমূহের ওপরের পাললিক শিলার তলদেশে গভীর কূপ খনন করে জানা গেছে যে এরা রূপান্তরিত শিলায় গঠিত। ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতের তলদেশে এ শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

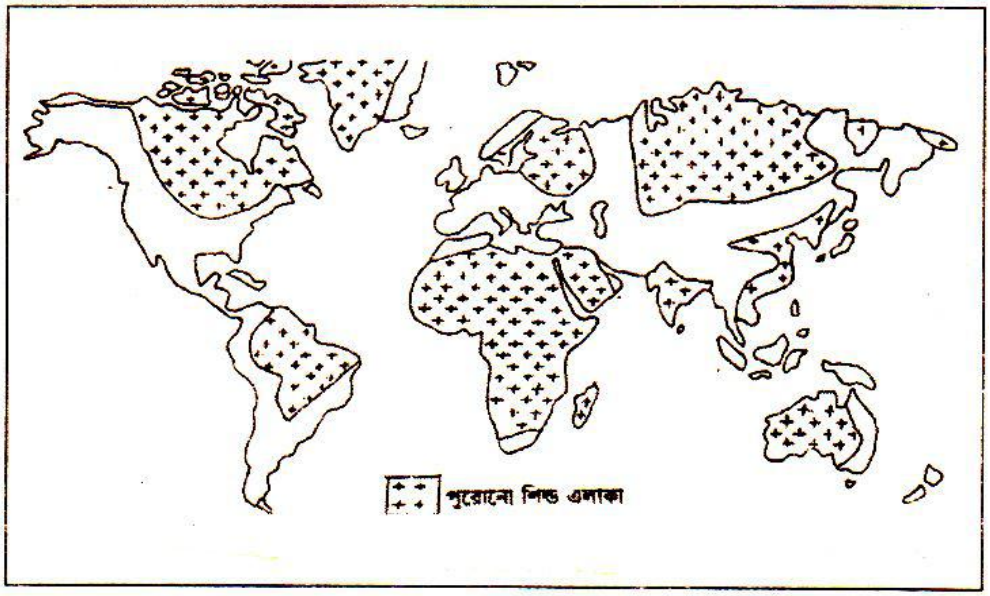


*চিত্র ৩.৭.১ : রূপান্তারত শিলার বণ্টন– পুরনো শিল্ড এলাকা (সূত্র : উ. মা. প্রা. ভূগোল, ডঃ শা. আলম, পৃষ্ঠা-৩১)।*

*রূপান্তরিত শিলা কোন কোন খনিজ পদার্থ ধারণ করে?*

## রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া (Metamorphic Processes)

শিলার রূপান্তরায়ণে তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রধান ভূমিকা রাখে–

**তাপ:** শিলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খনিজ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এ অবস্থায় শিলার ভিতর তরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আরও তাপ বৃদ্ধি পেলে তরলের পরিমাণও বাড়ে এবং সেই সাথে রাসায়নিক ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। এ অবস্থায় স্ফটিকের (Crystal) আদি গঠন কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং নতুন করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তা সংঘটিত হতে থাকে। এ ভাবেই নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়।

*তাপ, চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া।*

**চাপ:** ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলার ভারে এর তলদেশের শিলার চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে শিলার খনিজসমূহ সংকোচিত হয়। এ অবস্থায় খনিজ আবার কেলাসিত হয়, এবং আরও ঘনসন্নিবেশিত পরমাণু কাঠামো বিশিষ্ট নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়।

**রাসায়নিক ক্রিয়া:** রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নিম্ন তাপমাত্রা সম্পন্ন খনিজসমূহ গলতে শুরু করে। এ অবস্থায় পরমাণু সহজেই এ সমস্ত তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও শিলার বেশির ভাগ অংশই কঠিন অবস্থায় থাকে, অধিকতর তাপ ও চাপ-এর কারণে খনিজের বহু পরমাণু কেলাস কাঠামো থেকে মুক্ত হয়। এ সমস্ত পরমাণু খনিজ কণার তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পরমাণুর এ স্থানান্তর পুরনো কেলাস কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কেলাস কাঠামো গঠন করে। এভাবেই খনিজের রূপান্তর কাজ সম্পন্ন হয়।

## পাঠ সংক্ষেপ

আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলায় তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে শিলায় সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। শিলা রূপান্তরায়নের সময় যে দিকে চাপ কম থাকে সেদিকে নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়। ফলে একটি সমতল শিলা কাঠামো তৈরি হয়। রূপান্তরিত শিলা সাধারণত: কঠিন, শক্ত ও উচ্চ আপেক্ষিপ ঘনত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া অতি চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে শিলার মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা থাকে না।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ তাপ, চাপ, রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়–
ক. আগ্নেয় শিলা খ. পাললিক শিলা গ. সবগুলো

১.২ রূপান্তরিত শিলা গঠন প্রক্রিয়াকে বলে–
ক. কেলসিফিকেশান খ. সেডিমেন্টেশন গ. মেটামরফিজম

১.৩ রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য হল–
ক. শক্ত, মজবুত, পাতলা খ. হালকা, কর্দমাকার গ. শুষ্ক, দানাদার

১.৪ কয় ধরনের পরিবেশে Metamorphism হয়?
ক. ৪ খ. ৫ গ. ৩

১.৫ ভূ-ত্বকের কত শতাংশ রূপান্তরিত শিলা?
ক. ৪৫% খ. ৬৫% গ. ৮৫%

২. **শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

২.১ --------- অথবা --------- শিলার তাপ, চাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে।

২.২ শিলার রূপান্তরের সময় যেদিকে চাপ কম থাকে সেদিকে নতুন -------- সৃষ্টি হয়।

২.৩ রূপান্তরিত শিলা বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ ধারণ করে থাকে, যেমন------ ।

২.৪ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নিম্ন তাপমাত্রা সম্পন্ন খনিজসমূহ -------- শুরু করে।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন** (সময়–৪X২=৮ মিনিট) ঃ

১. রূপান্তরিত শিলা কাকে বলে?

২. শিলার রূপান্তরিত হবার বিশেষ পরিবেশগুলো কি কি?

৩. কি কি পরিবেশে রূপান্তরিত শিলা গঠিত হয়?

৪. শিলার রূপান্তরে কি কি নিয়ামক প্রধান ভূমিকা রাখে?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. রূপান্তরিত শিলা কি? রূপান্তরিত হবার পরিবেশ এবং এর গুরুত্ব ও বন্টন বর্ণনা করুন।

২. রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.৮ : ক্ষয়কার্য (Degradation)

এই পাঠ শেষে আমরা যা শিখব–

◈ ক্ষয়কার্য কি;

◈ কি প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্য হয়ে থাকে সম্পর্কে।

ক্ষয় ও সঞ্চয়ন পাশাপাশি

ভূ-ত্বক সর্বত্র সমান নয়, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। আবার কোথাও সমতল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ক্রমাগত কার্যের জন্য ভূ-ত্বকের এই নানারূপ পরিলক্ষিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল। তার ফলেই কোন জায়গার ভূ-ত্বক ক্ষয় হয়ে অন্যত্র সঞ্চয়ন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ভূ-ত্বকের এই পরিবর্তন অর্থাৎ ক্ষয় ও সঞ্চয়ন পাশাপাশি চলতে থাকে। কোথাও ক্ষয় হলে ঐ ক্ষয়িত পদার্থ অন্যত্র সঞ্চিত হয়।

বিচুর্নীভবনের সময় ভূ-ত্বকের উপরের স্তরের শিলা ভেঙ্গেচুরে প্রস্তরখন্ড, নুড়ি, বালুকা, কাঁদা প্রভৃতিতে পরিনত হয় কিন্তু অপসৃত হয় না। এদের শিলাবরনী বলা হয় (Rock Mantle)। এসব আলগা পদার্থ নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অপসারিত হলে তাকে অবক্ষয় (Degradation) বলে। যেসব প্রাকৃতিক শক্তির বলে এই ক্ষয়কার্য সমাধান হয় তাদের মধ্যে মাটির অধ:মুখী গতি, বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ, সমুদ্র ও মানুষ প্রধান। এদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

*শিলাবরণী এবং অবক্ষয় কি?*

মাধ্যাকর্ষণ, বৃষ্টির ফলে বা অন্য

**১. মাটির অধ:মুখী গতির সাহায্যে:** কোন উঁচু স্থানের মাটি মাধ্যাকর্ষণ গতির টানে এবং বৃষ্টির ফলে বা অন্য কোন কারণে যখন বৃহদাকার একটি খন্ড হঠাৎ নিচে নেমে আসে তখন নিচু এলাকায় ঐ মাটি স্তুপ হয়ে জমা হয়।

*চিত্র ৩.৮.১ : মাটির স্তুপায়ন (উৎস : Principles of Geology, pg. 183)*

**২. বায়ুর কার্য** (Action of Rain)**:** বায়ুর ক্ষয়কার্য মরুভূমির এলাকায় বেশি দৃষ্ট হয়। মরু এলাকা শুষ্ক, প্রায় বৃষ্টিহীন এবং গাছপালা শূন্য। ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানে গাছপালা থাকলে সেখানকার মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি গাছের শিকড় দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। ফলে ঐ সব এলাকায় বায়ু দ্বারা মৃত্তিকার অপসারণ হয় না। কিন্তু মরু এলাকায় বৃক্ষহীন বলে মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি দৃঢ় সংলগ্ন থাকে না। এছাড়া দিনের প্রচন্ড উত্তাপে এবং রাত্রের শীতলতায় এই অঞ্চলের শিলা সংকোচন ও প্রসারণের ফলেও শিথিল হয়ে যায়। ফলে বায়ুর ক্ষয়সাধনের ফলে ইয়ারডাঙ, জুগেন, গৌর, পিডমোট প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়।

তাপের সংকোচন-প্রসারণে শিলার কি পরিণতি হয়?

**৩. বৃষ্টির কার্য** (Action of Rain)**:** বৃষ্টির পানি ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উপায়ে ভূ-পৃষ্ঠকে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করে। প্রবাহিত হবার সময় ঐ পানি শিলাকে আংশিকভাবে ক্ষয় ও আলগা করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাকে অপসারিত করে। বৃষ্টির পানি ভূ-পৃষ্ঠের বালুকা ও মৃত্তিকা ধৌত করে নিয়ে যায়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে কর্ষিত জমির সুক্ষ্ম কণাগুলি পানিস্রোতে ধৌত হয়ে যায়। আবার অনেক পর্বত বিভিন্ন জাতীয় স্তর দ্বারা গঠিত। এসব পর্বতের কর্দমাস্তরের উপর অনেক ভারী শিলাস্তর হেলানো অবস্থায় থাকে। পর্বতের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির পানি ঐ কর্দমাস্তরের উপর থাকতে না পেরে নিচে ধসে পড়ে। একে মৃত্তিকাপাত (Land-slide) বলে। মৃত্তিকাপাতের ফলে পাহাড়ের পাদদেশের শিলাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

*উত্তাপ ও শীতলতায় শিলার সংকোচন ও*

ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হবার সময় বৃষ্টির পানিতে বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত হয়। এই গ্যাস মিশ্রিত পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করে অনেক শিলাকে বিশেষত: স্বচ্ছিদ্র চুনাপাথর, মার্বেল পাথর প্রভৃতিকে দ্রবীভূত করে শিলার ক্ষয়সাধন করে।

*মৃত্তিকাপাত।*

**৪. নদীর কার্য** (Action of River)**:** যেসব প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-পৃষ্ঠের নিয়তই পরিবর্তন করছে, নদী তাদের মধ্যে অন্যতম। নদীর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশি। নদীর ক্ষয়কার্য রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হয়। নদীর প্রবল স্রোতের আঘাতে বাহিত পাথর, নুড়ি প্রভৃতির আঘাতে বা ঘর্ষণে নদীগর্ভ ও নদীপার্শ্ব যান্ত্রিক উপায়ে ক্ষয় হয়। পার্বত্য অঞ্চলে জমি খুব ঢালু হয় এবং উঁচু-নিচু হয়। সেজন্য নদী উচ্চস্থান হতে খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে দুর্বার গতিতে নিচের দিকে ধাবিত হয়। প্রবল স্রোতের আঘাতে ভূত্বক থেকে শিলাখন্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং স্রোতের সাথে নিচের দিকে গড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকে। স্রোতের প্রবল আঘাতে নদীর খাদে কোন কিছুই সঞ্চিত হতে পারে না। এই প্রকারে শিলাখন্ডগুলি পরস্পরের সাথে এবং নদীগর্ভের সাথে সংঘর্ষের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমশ মসৃণ, গোল, নুড়ি, বালু, কঙ্কর প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এটাই নদীর যান্ত্রিক ক্ষয়ীভবন। এছাড়া ভূ-ত্বকের রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ নদীর পানির সাথে দ্রবীভূত হয় এবং মৃত্তিকার দ্রুত ক্ষয়সাধন করে। এটাই নদীর রাসায়নিক ক্ষয়সাধন। নদীর ক্ষয়কার্য জলবায়ু, নদী গর্ভের শিলার উপাদান, বাহিত শিলার কঠিনতা, নদী-পানির গলানোর শক্তি, নদী গর্ভে ফাটল বা সন্ধির অবস্থান প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। নদীর ক্ষয়ক্রিয়ার দরুন ভূ-পৃষ্ঠে (U) আকৃতির উপত্যকা, গিরিখাত, খরস্রোত, জলপ্রপাত, নদীমঞ্চ, নদীগর্ভে বর্তুলাকার গর্ত (Pot-holes) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

*নদীর ক্ষরণ, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক*

*রাসায়নিক*

*রাসায়নিক*

*যান্ত্রিক ক্ষয়ীভবন ও রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন কি?*

*চিত্র ৩.৮.২ : নদীর সাহায্যে ক্ষয়কার্য (উৎস- Principles of geology page : 226)*

**৫. হিমবাহের কার্য** (Action of glacier)**:** হিমবাহের দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। হিমবাহ প্রধানত: দুই প্রকারে ক্ষয়কার্য করে থাকে। প্রথমত: প্রক্রিয়াটি হল হিমবাহের তলদেশের পর্বতগাত্রে যে সমস্ত প্রস্তরসমূহ থাকে তাহা হিমবাহের চাপে পর্বতগাত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে নীত হয়। এই সব প্রস্তরসমূহের নিকট পর্বতগাত্রে যদি ছিদ্র বা ফাঁটল থাকে তবে সে ছিদ্র বা ফাঁটলের ভিতর দিয়ে পানি প্রবেশ করে বরফে পরিণত হয়ে প্রস্তগুলিকে আলাদা করে দেয় এবং হিমবাহের চাপে ইহা পর্বতগাত্র থেকে সহজেই আলাদা হয়ে যায়। মোট কথা হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়া ঘর্ষণ, আঁচড়ান, মসৃণ করা, উৎপাটন প্রভৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

*হিমবাহ দুই উপায়ে ক্ষয়কার্য করে।*

হিমবাহের গতি নদীর মত দ্রুত নয়। হিমবাহের চাপে এবং ঘর্ষণে এর গতিপথের পার্শ্ব এবং তলদেশের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হিমবাহ উপত্যকার সৃষ্টি করে। ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে হিমবাহ উপত্যকা খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হয়ে ইংরেজী 'ইউ' উপত্যকার আকৃতি ধারণ করে বলে হিমবাহ উপত্যকাকে 'ইউ' (U) আকৃতির উপত্যকা বলে। 'ইউ' (U) আকৃতির উপত্যকার সাথে অনেক উপত্যকা অবস্থান করে। মূল উপত্যকার সাথে এদের ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging valley) বলে।

*'ইউ' উপত্যকা, ঝুলন্ত উপত্যকা।*

হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সার্ক, সার্কহ্রদ, এরিটি, পিরামিডাল শৃঙ, নানাট্যাক্স, শৈলময় পর্বত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

*চিত্র ৩.৮.৩ : হিমবাহের সাহায্যে ক্ষয়কার্য*
*(উৎস- Principles of geology page : 255)*

***'ইউ' উপত্যকা এবং ঝুলন্ত উপত্যকা কি?***

**৬. সমুদ্রের কার্য** (Action of Sea)**:** সমুদ্র উপকূলের সাগর তরঙ্গ, জোয়ার ভাটা, সমুদ্র স্রোত প্রভৃতিও নিয়ত শিলাকে ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। সমুদ্র তরঙ্গ যখন ভীষণ আকার ধারণ করে তখন এর ধাক্কায় উপকুলের শিলা ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়া জোয়ার ভাটা ও সমুদ্র স্রোতের প্রভাবেও উপকূলের শিলা ভেঙ্গে যায়। অনেক সময় সমুদ্র উপকূলের পাহাড় থেকে বড় বড় প্রস্তরখন্ড সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়ে। পরে এসব প্রস্তর খন্ড সমুদ্র স্রোত ও সমুদ্র তরঙ্গ এবং জোয়ার ভাটার ফলে নুড়ি ও বালুকাতে পরিণত হয়। আবার উপকূলভাগের কোন স্থান কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত হলে সমুদ্রের তরঙ্গ ও সমুদ্রস্রোত তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে না, অথচ এর উভয় পার্শ্ব ক্ষয় করে ফেলে। এরূপ সমুদ্রোপকূলে অনেক অন্তরীপের (Cape) সৃষ্টি করে। সমুদ্রের উপকূলবর্তী কঠিন শিলার চারদিকের নরম শিলার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বেষ্টিত হলে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এরূপে সৃষ্ট দ্বীপকে মহাদেশীয় দ্বীপ (Continental Island) বলে।

অন্তরীপ, মাহাদেশীয়

*চিত্র ৩.৮.৪ : (ভূঙ cliff ) সমুদ্রের তরঙ্গের ক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ।*
*(উৎস- Principles of geology page : 347)*

এছাড়া সমুদ্রের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের উপর ঝুঁকে পড়াতে উচ্চ খাড়া পাহাড় বা ভৃগু (cliff) এবং তরঙ্গ কবলিত মঞ্চের (Wave cut platform) সৃষ্টি হয়।

**৭. ভৃগু** (Cliff)**:** ধরা যাক একটি মসৃণ উচ্চ মূল ভূখন্ড ক্রমশ: ঢালু হয়ে নিচে নেমে আসছে। এই উচ্চ ভূমিটির উপর প্রথম দিকে সমুদ্র তরঙ্গ এসে আঘাত করবে এবং ঢালু মসৃণ ভূমিভাগের উপর একটি খাঁজের সৃষ্টি করবে। এই খাঁজ তরঙ্গের আঘাতে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে এবং এক সময়ে উপকূলস্থ উচ্চ ভূমিভাগের খানিকটা অংশ খাড়া পাহাড়রূপে সমুদ্রের দিকে ঝুলতে থাকবে এবং ভৃগু তার নিচে অবস্থিত কর্তিত মঞ্চের উপর ঝুলতে থাকবে।

খাঁজের সৃষ্টি করে।

সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে উপকুলস্থ উচ্চ খাড়া পাহাড় বা ভৃগু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যতই পিছু হঠে যায় তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ ততই গড়ে উঠতে থাকে।

**৮. মানুষের কার্য** (Action of Man)**:** সভ্যতার উন্নতি সাধন এবং আধুনিকিকরণের জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে থাকে। নানাভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে তা ক্ষয় হয়। পরিবর্তিত হয় এবং নানা বিচিত্র রূপ লাভ করে। শহর, বন্দর, রাস্তা–ঘাট, বিমানবন্দর, ইমারত নির্মাণে মৃত্তিকা, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতি নির্বিচারে অবক্ষয়ের শিকার হয়। এই ধরনের অবক্ষয় নিশ্চিতভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু মানুষের দুর্ণিবার প্রয়োজন এই নিশ্চিত আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে পারছে না।

প্রাকৃতিক

ভূ-পৃষ্ঠের এই অবক্ষয় ক্রমাগত দিবা নিশি চলছে। তবে কোথাও ক্ষয় হচ্ছে আবার কোথাও গঠন প্রক্রিয়া চলছে। পৃথিবীর এই ভাঙ্গা-গড়ার বিচিত্র খেলাই তার অজানা রহস্য।

## পাঠ সংক্ষেপ

ভূ-ত্বক পুরোপুরি সমতল একটি স্থান নয়। এর কোথাও উঁচু কোথাও নিচু আবার কোথাও সমতল। প্রাকৃতিক শক্তির অবিশ্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ফলেই এইরূপ পরিবর্তন এর জন্য দায়ী। এই প্রাকৃতিক শক্তির কারণে ভূ-ত্বকের কোথাও ক্ষয় হয় আবার কোথাও এই সকল ক্ষয়িত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে এই সকল ভূমি রূপের ভিন্নতার সৃষ্টি করে। এই ক্ষয় ও সঞ্চয়ন কার্য একটি পাশাপাশি চলতে থাকা প্রক্রিয়া। সাধারণত: বিচূর্ণীভবনের সময় ভূ-ত্বকের উপরের স্তরের শিলা ভেঙ্গে-চুরে ধীরে ধীরে বড় আকার থেকে ক্রমান্বয়ে নানা প্রভাবকের সহায়তায় ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক প্রভাবকগুলো হল- মাটির অধ:মুখীগতি, বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ, সমুদ্র ও মানুষ। ভূ-পৃষ্ঠের এই গঠন ও ক্ষয়কার্য ক্রমাগত চলছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৮

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. এক কথায় উত্তর দিন** (সময় ৬X১=৬ মিনিট) ঃ

১.১ ক্ষয় এবং সঞ্চয়ন কি ক্রমাগত চলে?

১.২ মাটির নিম্নগতি কেন হয়?

১.৩ বায়ুর সাহায্যে ক্ষয় কোথায় বেশি হয়?

১.৪ পর্বতের কর্দম নিচে নেমে আসাকে কি বলে?

১.৫ ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে বেশি ক্ষয়সাধন হয় কিসের দ্বারা?

১.৬ ঝুলন্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয় কোথায়?

**২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

২.১ বিচূর্ণীভবনে বিচূর্ণীত পদার্থ

ক. স্থানান্তরিত হয় খ. হয় না

গ. সামান্য হয় ঘ. হারিয়েযায়

২.২ বৃষ্টির সাহায্যে শিলা কিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়?

ক. যান্ত্রিক উপায়ে খ. রাসায়নিক উপায়ে

গ. উভয় উপায়ে ঘ. কোনটাই নয়

২.৩ বায়ুর ক্ষয়সাধনে

ক. পিডমোট খ. ভৃগু

গ. বর্তুলাকার গর্ত ঘ. 'ইউ' উপত্যকা

২.৪ ঝুলন্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়–

ক. হিমবাহ খ. নদী

গ. সমুদ্র ঘ. মানুষের ক্ষয়কার্য

২.৫ হিমবাহ উপত্যকাকে কি আকৃতির উপত্যকা বলে?

ক. 'ভি' খ. 'ইউ'

গ. ডব্লিউ ঘ. 'এল' (L)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন** (সময় ২x৭=১৪ মিনিট) ঃ

১. ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়ন বলতে কি বুঝায়?

২. মাটির গতির অধ:মুখির সাহায্যে কিভাবে ক্ষয়কার্য হয়?

৩. মৃত্তিকা পাত (land slide) কাকে বলে?

৪. বায়ুর ক্ষয়কার্যে কি কি ভূমিরূপ তৈরি হয়?

৫. নদীর ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ কি কি?

৬. হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়া সৃষ্ট ভূমিরূপ কি কি?

৭. 'ভৃগু' কোন ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. ক্ষয়কার্য কি? কি কি প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্য হয়ে থাকে বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.৯ : মৃত্তিকা (Soil)

এই পাঠ শেষে যা জানব–

- ◈ মৃত্তিকা কি;
- ◈ মৃত্তিকা গঠনের উপাদান;
- ◈ মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া;
- ◈ মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র;
- ◈ মৃত্তিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে।

*ভূগোল পাঠের সাথে মৃত্তিকা পাঠের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে*

ভূগোল পাঠের সাথে মৃত্তিকা পাঠের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূ-পৃষ্ঠ এবং তার গঠন উপাদানগুলির মধ্যে মৃত্তিকা অন্যতম। তাই ভূগোল পাঠের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে মৃত্তিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা এই পাঠে মৃত্তিকা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে চেষ্টা করব।

পৃথিবীতে তিনটি শ্রেষ্টতম প্রাকৃতিক উৎস হল মাটি, পানি এবং বায়ু। এই তিনটি প্রাকৃতিক উৎস মানুষের প্রতি প্রকৃতির আশীর্বাদস্বরূপ। সুতরাং ৩টি প্রাকৃতিক উৎসের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং তাদের সম্পর্কে মানুষের প্রকৃত বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এগুলির ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। মৃত্তিকা এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যার উপর গোটা পৃথিবী দন্ডায়মান অবস্থায় আছে। এই মৃত্তিকার সৃষ্টি রহস্য, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, তার বিভিন্ন উপাদান, মৃত্তিকার প্রকারভেদ, তার ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিষয়ের নাম হল "মৃত্তিকা বিজ্ঞান"। অত্যন্ত সংগত কারণে এই মৃত্তিকা বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য মৌলিক বিষয় যেমন– পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, খনিজ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক খুব গভীর। তাই মৃত্তিকা বিষয়ের জ্ঞান একটি বিশাল ব্যাপার। কিন্তু আমরা আলোচ্য পাঠে শুধুমাত্র মৃত্তিকা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব।

*মৃত্তিকা বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য মৌলিক বিষয় এর সম্পর্ক গভীর।*

*মৃত্তিকা কি?*
*মৃত্তিকা বিজ্ঞান কাকে বলে?*

## মৃত্তিকা কি?

*শিলা, হিমবাহ,*

মৃত্তিকা হল ভূ-পৃষ্ঠের ওপর একটি আচ্ছাদন। শিলা হতে মৃত্তিকার উৎপত্তি। ভূ-ত্বকের শিলাগুলি বৃষ্টি, রৌদ্র, তুষার, হিমবাহ প্রভৃতির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সুক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হয়। এইসব শিলাচূর্ণ আবার জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকার সৃষ্টি করেছে।

*কৃষকাজে মূল্যবান*

এই মৃত্তিকাই প্রতিটি দেশে কৃষি কাজের একটি অতি মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মৃত্তিকা পথ-ঘাট, রাস্তা, ইমারত, প্রভৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কাজেই ফসল এবং উদ্ভিদ জন্মানো, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র প্রস্তুতিতে, পথ-রাস্তা-ইমারত নির্মাণে মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

*মৃত্তিকা কাকে বলে?*
*মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়তা কি?*

## মৃত্তিকা গঠনের উপাদান

প্রধানত: শিলাচূর্ণ ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে মাটির সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিকভাবে (পার্শ্বচিত্র ৩.৯.১) বিভিন্ন স্তর সৃষ্টিকে মাটির গঠন বলে। একটু ব্যাপক অর্থে, শিলার মাটির কণায় রূপান্তরকে মাটির গঠন বলে। শিলার ক্ষয়ক্রিয়ার সাথে সাথে মাটির গঠনকাজ শুরু হয়। মাটি গঠনে নিচের পাঁচটি উপাদান প্রধানত কাজ করে। যেমন–

*শিলাচূর্ণ ও জৈব*

উৎসবস্তু, জলবায়ু, সজীববস্তু, ভূ-প্রকৃতি ও সময়।

**ক) উৎস বস্তু (Parent Material)ঃ** যেহেতু শিলা থেকেই মাটির উৎপত্তি তাই শিলাকেই উৎস বস্তু বলে। মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া ও তার গুণাগুণ প্রধানত মূল শিলার গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। যেমন: বালুময় শিলা থেকে উৎপাদিত মাটি বেলে মাটি এবং চুনাপাথর থেকে উৎপত্তি লাভকারী মাটি কাঁদামাটি হিসেবে পরিচিত।

*শিলা উৎসবস্তু।*

**খ) জলবায়ু (Climate)ঃ** মৃত্তিকা গঠনে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। কারণ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার তারতম্যে শিলার উপর যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্তিকা গঠন করে।

*বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা*

**গ) সজীব বস্তু (Living Organism)ঃ** বৃহৎ বৃক্ষরাজি শিলার অভ্যান্তরে শেকড় বিস্তার করে শিলাকে চূর্ণ ক'রে শিলাকে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত করে। আবার মস্, তৃণ, গুল্ম, উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা, পত্র ইত্যাদি পচে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ হিসেবে মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকা গঠনে সাহায্য করে এবং মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। গর্ত খননকারী প্রাণী কেঁচো, উঁই, পিপঁড়া, ইঁদুর ইত্যাদিও শিলাকে সুক্ষ্ম কণায় পরিণত ক'রে মৃত্তিকা গঠনে সহায়তা করে।

*শেকড় বিস্তার।*

**ঘ) ভূ-প্রকৃতি (Topography or Relief)ঃ** ভূ-প্রকৃতির উপরও মাটির সৃষ্টি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বৃষ্টিবহুল পার্বত্য ভূমির ঢালে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না বলে তথায় জঙ্গল সৃষ্টি হতে বিলম্ব হয়। অথচ সমতল ও গর্তযুক্ত শিলাতে অধিক পরিমাণ বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হওয়ায় দ্রুত গতিতে উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এ কারণে দেখা যায় সমতল অঞ্চলে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয় অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে এবং পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা গঠনের গতি ধীরে।

*উৎসবস্তু, জলবায়ু, সজীববস্তু, ভূ-*

**ঙ) সময় (Time)ঃ** মৃত্তিকার উৎপত্তি মাত্র কয়েকদিন বা কয়েক মাস বা কয়েক বছরের ব্যাপার নয়। ৫–১০ বছরের মধ্যেই শিলা হতে লাইকেন, মস্ প্রভৃতি জন্মানোর উপযোগী মৃত্তিকা উৎপত্তি হয়। কিন্তু একটি পরিণত বা সম্পূর্ণ মৃত্তিকা গঠিত হতে দু'শ হতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে। মৃত্তিকা তৈরি ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক এ যুগপৎ নিয়মে চলে। প্রথমে প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন– তাপ, বৃষ্টি, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতি দীর্ঘ সময় ধরে শিলাকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে। এসব পদার্থ কালক্রমে বাহিত হয়ে সঞ্চিত হতে হতে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এ কারণেই মৃত্তিকা গঠনে দীর্ঘ সময়ের দরকার।

*দু'শ হতে কয়েক হাজার বছর।*

## মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া (Soil Forming Process)

মৃত্তিকা গঠনের বিভিন্ন উপাদান সমন্বিত ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানীয় পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়া স্থায়ী থাকতে সাহায্য করে। মৃত্তিকা গঠনের শেষ পর্যায়ে মাটিতে একটি পার্শ্বচিত্র (চিত্র ৩.৯.১) সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা গঠনের প্রধান প্রধান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

*জৈববস্তু, বিয়োজিত, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের পচনশীল ধ্বংসাবশেষ।*

**১. জৈবকরণ (Humification) ঃ** যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার উপরের স্তরের জৈববস্তু সৃষ্টি হয় তাকে জৈবকরণ বা Humification বলে। মৃত্তিকার উপর কি ধরনের জৈবপদার্থ জমা হয়, কি প্রকারে তা বিয়োজিত হয় এবং বিয়োজিত পদার্থ কি কি যৌগ সংশ্লেষণ করে প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর জৈবস্তরের গুণাগুণ নির্ভর করে। মৃত্তিকার জৈব পদার্থের প্রধান উৎস উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের

পচনশীল ধ্বংসাবশেষ। আর্দ্র-উষ্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকার উপরের স্তরে তীব্র অনুজীব ও জৈব কার্যাবলীর ফলে সাধারণত: 'জৈব পদার্থ' সঞ্চিত হয় না। মৃত্তিকার উপরের স্তরের মাধ্যমে পানি চুয়ানী বৃদ্ধি পেলে মৃত্তিকার সামান্য পরিমাণ জৈব এসিড দ্রবীভূত হয়। এ এসিডই নিচের দিকে গিয়ে মৃত্তিকার 'ক' ও 'খ' স্তর গঠনে সহায়তা করে (চিত্র ৩.৯.১ দেখুন)।

**২. চুয়ীসরণ ও চুয়ীক্ষেপন** (Eluviation and Illuviation) ঃ যে প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার উপরের স্তর হতে বিভিন্ন দ্রব্য অনুস্রবণের মাধ্যমে নিম্নস্তরে চলে যায় তাকে চুয়ীসরণ বলে। যে স্তর হতে বিভিন্ন দ্রব্য অপসারিত হয় তাকে চুয়ীক্ষেপন (Eluvial) স্তর বলে। এটাই 'ক' স্তর। চুয়ানো দ্রব্যসমূহ যে স্তরে গিয়ে জমা হয় তাকে চুয়ানো স্তর বা 'খ' স্তর বলে। ভৌত চুয়ীক্ষেপনের ফলে উপরের স্তর হতে নিচের স্তরে ক্ষুদ্রাকার কঠিন কণাসমূহ জমা হলে উপরের স্তর কিছুটা বেলে-প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু রাসায়নিক চুয়ীকরণের ফলে প্রধানত: জৈব পদার্থ, সিলসিক এসিড, লবণ, বিনিময়যোগ্য ক্ষারক, সোদক ফেরিক অক্সাইড ইত্যাদি নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয়। চুয়ীসরনে অপসারিত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা মৃত্তিকার গুণাবলী স্থির করা হয়।

*চুয়ীক্ষেপন, বিনিময়যোগ্য ক্ষারক, সোদক ফেরিক*

**৩. পড্‌জলীকরণ** (Podzolization) ঃ এটি এক প্রকার চুয়ীসরন প্রক্রিয়া। উপরের স্তরের জৈবপদার্থ পঁচে প্রচুর জৈব এসিড তৈরি হয়। এ জৈব এসিড উপরের স্তরে বিদ্যমান লৌহ, এ্যালুমিনিয়াম, খনিজ দ্রব্য দ্রবীভূত করে নিচের স্তরে জমা হয়। এই প্রক্রিয়াকে পড্‌জলীকরণ বলে জঙলময় বৃষ্টি বহুল অঞ্চলে মাটি গঠনের এ প্রক্রিয়া বেশি দেখা যায়।

*চুয়ীসরণ প্রক্রিয়া।*

**৪. লেটারীকরণ** (Laterization) ঃ এ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার সিলিকা প্রধান কর্দম দ্রবীভূত হয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। উপরের 'ক' স্তরে কেবলমাত্র লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম বিদ্যমান থাকে এবং তারা লালচে বর্ণের গুটি তৈরি করে। পরিমিত আর্দ্রতার উপস্থিতিতে অধিক তাপমাত্রা ও উৎস শিলার তীব্র বিয়োজন সংঘটিত হলে এ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর হয়।

*সিলিকা প্রধান কর্দম।*

**৫. কেলসিকরণ** (Calcification) ঃ এ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে চুন জাতীয় পদার্থ জমা হয়। প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক পদার্থ হতে প্রাপ্ত ঝিনুক, শামুক, চুনাপাথর, ডলোমাইট ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে মৃত্তিকাতে চুনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। জলবায়ু চূনীকরণ প্রক্রিয়া সংঘটনে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় চুনা মৃত্তিকা তৈরি হয়।

*চুন জাতীয় পদার্থ জমা হয়।*

*মৃত্তিকা গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো কি কি।*

## মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র (Soil Profile)

নৈসর্গিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক পদ্ধতির ফলে সম্পূর্ণরূপে গঠিত এবং অনালোড়িত মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতিপয় স্তর দেখতে পাওয়া যায়। এ স্তর বিন্যাসকে মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র বলে। মৃত্তিকার উর্ধ্ব ভূমি অক্ষ বরাবর উপর স্তর হতে নিম্নস্তরের উৎস দ্রব্য পর্যন্ত কেটে ছেদ করলে স্তর বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়।

*প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর।*

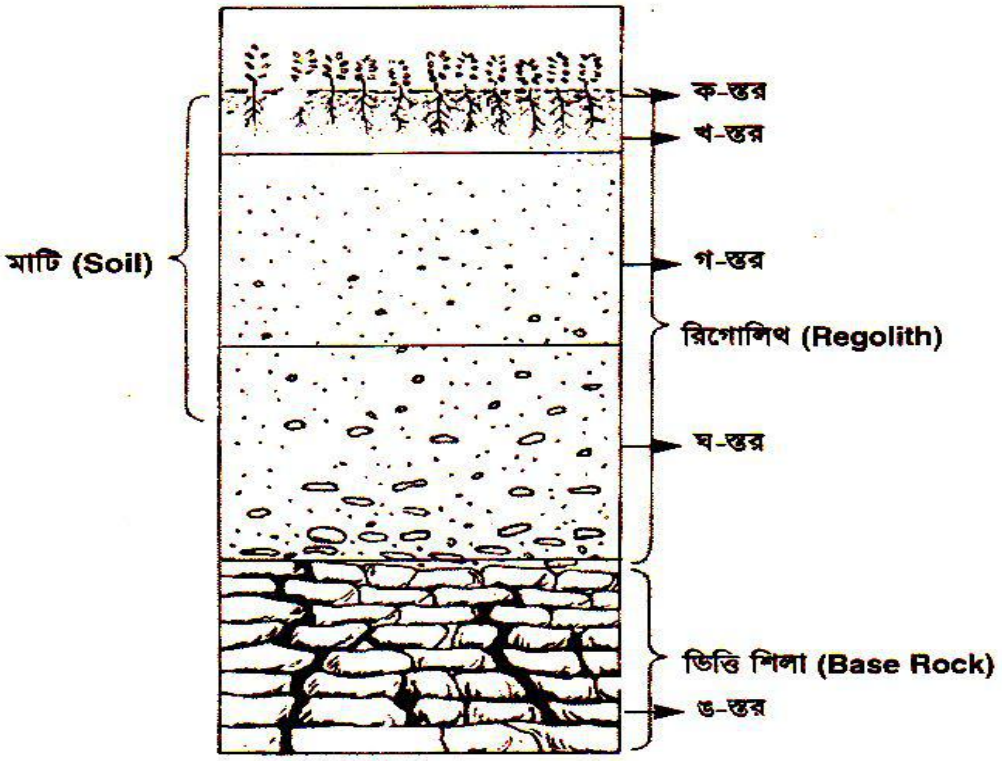


*চিত্র ৩.৯.১ : মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র*

*ক-স্তর : জৈব পদার্থ*
*খ-স্তর : কৃষ্ণবর্ণ,*
*গ-স্তর : কাঁদাবেশী*
*ঘ-স্তর : অল্পবিকৃত শিলা,*
*ঙ-স্তর : কঠিন শিলা।*

**ক-স্তরঃ** মৃত্তিকার উপরের স্তরকে 'ক' স্তর বলে। এই স্তরে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকে বলে এই স্তর খুব উর্বর। এই স্তর সাধারণতঃ ২৫.৪–৫০.৮ সে.মি. পুরু হয়।

**খ-স্তরঃ** 'ক' স্তরের নিচের স্তরই খ-স্তর। এখানে জৈব পদার্থ থাকে, এই স্তর কৃষ্ণ বর্ণের হয়। এতে পানি কম থাকে।

**গ-স্তরঃ** একে তৃতীয় স্তর বলে। এতে কাঁদা বেশি এবং প্রথম স্তর অপেক্ষা অধিক আর্দ্র। এতে খনিজের পরিমাণ বেশি থাকে।

**ঘ-স্তরঃ** এ স্তরে অল্প বিকৃত শিলা থাকে। এবং এটি উদ্ভিদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

**ঙ-স্তরঃ** এই সর্বশেষ স্তরের মৃত্তিকা কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত।

*কোন স্তর সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং কেন?*

## মৃত্তিকার সংরক্ষণ (Soil Conservation)

*মৌলিক সম্পদ, কৃষিকার্যের উন্নতি।*

মৃত্তিকা মানুষের একটি মৌলিক সম্পদ। মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর দেশের কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভরশীল। তাই এ মৌলিক সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ, মানবকূল দ্বারা যাতে মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হতে না পারে এবং মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি যাতে সর্বদা ঠিক থাকে, এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন–

**ক. অরণ্যরোপন (Afforestation) ঃ** বৃক্ষরোপন করে মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা যায়।

**খ. নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ (Controlled Grazing) ঃ** একই ভূমিতে পশুচারণ না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভূমিতে পশুচারণ করলে মৃত্তিকা কম ক্ষয় হয়।

**গ. ঘাস লাগানো (Turfing) ঃ** ঘাস লাগিয়ে মৃত্তিকা ধৌতকরণ রোধ করা যায়।

**ঘ. আবরণ শস্য রোপন (Cover crops) ঃ** মূল শস্য কাটার পর কলাই, ডাল, মটর ইত্যাদি লাগালে মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়।

**ঙ. বায়ুপ্রবাহ রোধক পর্দা (Wind screen) ঃ** এক্ষেত্রে ভূমির পাশ দিয়ে বৃক্ষরোপন করা হয়।

**চ. উপযুক্ত ঢাল রক্ষা (Maintaining proper slope) ঃ** রাস্তা বা বাঁধ নির্মাণ করার সময় উপযুক্ত ঢাল রাখলে মৃত্তিকা কম ক্ষয় হয়।

**ছ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ (Scientific Method of Cultivation) ঃ** এই উপায়ে চাষাবাদ করলে মৃত্তিকা কম ক্ষয় হয়। এভাবে মৃত্তিকা রক্ষা করা সম্ভব।

*অবণ্য রোপন, নিয়ান্ত্রত পশুচারণ, ঘাস লাগানো, আবরণ শস্যরোপন, বায়ু প্রকাহ রোধক পর্দা, উপযুক্ত চাল রক্ষা, বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ।*

## পাঠ সংক্ষেপ

আজকের পাঠের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক উৎসের মধ্যে অন্যতম মৃত্তিকা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পেলাম। মৃত্তিকা এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যার ওপর গোটা পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। এই মৃত্তিকার সৃষ্টি রহস্য, সৃষ্টির উপাদান, সৃষ্টির প্রক্রিয়া, মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র, এছাড়াও মৃত্তিকার সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা পাবার চেষ্টা করেছি।

মৃত্তিকা ভূ-পৃষ্ঠের ওপর একটি আচ্ছাদন, শিলা হতে মৃত্তিকার উৎপত্তি। মৃত্তিকা গঠনে কিছু উপাদান কাজ করে যেমন উৎস বস্তু, জলবায়ু, সজীব বস্তু, ভূ-প্রকৃতি ও সময়। মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া কতগুলো ধাপ মেনে চলে যেমন জৈবকরণ, চুয়ীসরন ও চুয়ীক্ষেপন, পডজলীকরণ, লেটারীকরণ, কেলাসিকরণ। মৃত্তিকার গঠনে নৈসর্গিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক পদ্ধতির ফলে সম্পূর্ণরূপে গঠিত এক অনালোড়িত মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু স্তর দেখা যায়। এরাই মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র। এছাড়াও মৃত্তিকার যথাযথ সংরক্ষণ না হলে এই অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই এর যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৯

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৬ মিনিট) ঃ

১.১ --------- বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য মৌলিক বিষয় যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, খনিজবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক খুব গভীর।

১.২ -------- হতে মৃত্তিকার উৎপত্তি।

১.৩ মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া ও তার গুণাগুণ প্রধানত ------ গুণাগুণের ওপর নির্ভরশীল।

১.৪ মৃত্তিকার জৈব পদার্থের প্রধান উৎস ----- ও ------- এর পচনশীল ধ্বংসাবশেষ।

১.৫ যে স্তর হতে বিভিন্ন দ্রব্য অপসারিত হয় তাকে --------- স্তর বলে।

১.৬ যে প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে চুন জাতীয় পদার্থ জমা হয় তাকে ------ বলে।

**২. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট)ঃ

২.১ মৃত্তিকা একটি–
ক. কৃত্রিম খ. মৌলিক গ. প্রাকৃতিক সম্পদ

২.২ মৃত্তিকার উপরে তৈরি করা হয়–
ক. বাড়ি-ঘর খ. বিমান বন্দর গ. সবগুলি

২.৩ দেশের উন্নতি নির্ভর করে–
ক. মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির উপর
খ. মৃত্তিকার ব্যবহার না করার উপর
গ. মৃত্তিকা প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যাবার উপর।

২.৪ মৃত্তিকা গঠনের উপাদান কোনটি?
ক. শিলা ও জলবায়ু খ. সময় ও সজীব বস্তু গ. উপরের সবগুলি

**সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন** (সময় ৫X২=১০ মিনিট)ঃ

১. মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়তা কি?
২. কিভাবে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়?
৩. মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বলতে কি বুঝেন?
৪. মৃত্তিকা গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো কি কি?
৫. মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র আঁকুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. মৃত্তিকা কি? মৃত্তিকা গঠনের উপাদান ও গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন।
২. মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্রের বর্ণনা দিন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে লিখুন।

# বায়ুমন্ডল (Atmosphere)

*৩.১০ থেকে ৩.২৫ পর্যন্ত পাঠে আপনারা বায়ুমন্ডল সম্পর্কে জানবেন।*

## পাঠ ৩.১০ : বায়ুমন্ডলের সাধারন গঠন (General Structure of Atmosphere)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন –

◈ বায়ুমন্ডল কাকে বলে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর গুরুত্ব;
◈ বায়ুর বিভিন্ন উপাদান, আনুপাতিক হার এবং উপাদান সমূহের ভূমিকা;
◈ বায়ুর আর্দ্রতার সাথে জলবায়ু ও আবহাওয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে।

### বায়ুমন্ডল

বায়ুমন্ডল পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বিশাল পুরুত্বের গ্যাসীয় আবরণ রয়েছে সেটিই বায়ুমন্ডল। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০,০০০ কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশব্যাপী বায়ুমন্ডল বিস্তৃত। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন জনিত বলের প্রভাবে বায়ুমন্ডল ভূপৃষ্ঠের সাথে আবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুমন্ডলের বয়স ৩৫০ কোটি বছর, ভূ-অভ্যন্তরের নির্গত গ্যাস থেকে এর সৃষ্টি বলে অনুমান করা হয়। জীবজগৎ মূলত বায়ুমন্ডল (Hydrosphere), বারিমন্ডল (Lithosphere) ও ভূত্বকের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। বায়ু সমুদ্রের তলদেশেই প্রাণের উদ্ভব, সমুদ্র সমতলে বায়ুর ঘনত্ব সর্বাধিক, উচ্চতার সাথে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। মাত্র ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে বায়ুমন্ডলের ৯০ শতাংশ অবস্থান করছে।

### বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি (Origin of Atmosphere)

*বায়ুমন্ডলীয় গ্যাসের উৎস, ভূ-অভ্যন্তর থেকে নির্গত গ্যাস।*

পৃথিবীর জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি একটি উত্তপ্ত গলিত শিলা পিন্ডের ন্যায় ছিল। ধীরে ধীরে পৃষ্ঠদেশ শীতল ও কঠিনাকার ধারণ করলে অভ্যন্তরীন গলিত ম্যাগমা ফাটল দিয়ে উৎক্ষেপিত হতে থাকে। এ সমস্ত অগ্নুৎপাতের রাসায়নিক ও ভৌত গঠন মোটামুটি বর্তমান সময়ের নির্গত লাভার মতই ছিল বলে অনুমান করা যায়। ফলে, বায়ুমন্ডলও ঐ গ্যাসীয় উপাদানের মত ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। বায়ুমন্ডলের তখনকার গ্যাসীয় উপাদান মাত্রা:

জলীয় বাস্প ৬০-৭০ শতাংশ
কার্বন-ডাই-অক্সাইড ১০-১৫ শতাংশ
নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগ ৮-১০ শতাংশ

শীতলতার ফলে জলীয় বাস্পের এ বিশাল পরিমাণ মেঘে পরিনত হয়। এ সব মেঘ থেকে সৃষ্ট বৃষ্টিপাত অতিউচ্চতাপমাত্রায় ভূত্বকের কিম্বা তার কাছাকাছি আসার আগেই আবার বাস্পীভূত হয়ে যেত। দীর্ঘ দিনের এ অব্যাহত প্রক্রিয়ার ফলে পুরোমেঘের স্তর পৃথিবীর হাজার হাজার বছর আচ্ছাদিত থাকে। পৃথিবী যখন যথেষ্ট শীতল হয় কেবল তখনই অবিশ্রান্ত বারিপাত শুরু হয় এবং তা প্রায় ৪০,০০০ বছর ব্যাপী স্থায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয়। বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$) এ বারিপাতের সাথে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, অক্সিজেনের আগমন হয়েছে অনেক পরে। অজৈব মহাযুগের (Archaeozoic Era) শেষভাগে জৈব মহাযুগের (Phanerozoic Era) সূচনায় কিছু কিছু জীবের অস্তিত্ব সমুদ্র বক্ষে

ছিল যারা অক্সিজেন গ্রহণ করত না বরং অক্সিজেনের সংস্পর্শে মৃত্যু বরণ করত। এসব থেকে অনুমান করা হয় যে ব্যাপক ভাবে অক্সিজেন তখন বাতাসে অনুপস্থিত ছিল। কার্বনিফেরাস যুগে (Carboniferious Period) পৃথিবীতে বিশালায়তন বনভূমির অবস্থান ছিল বলে ধারণা করা হয়। এর আগেই অক্সিজেনের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ব্যাপকভাবে বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতি ও পরিমাণগত আধিক্যের জন্য ঐ বিশালায়তনের বনভূমিই ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে হয়। তবে অক্সিজেনের আদি জন্ম হয়েছে পৃথিবীর প্রাথমিক পর্যায়ের জলীয় বাস্প সূর্যালোকের অতি বেগুনী রশ্মির সাহায্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, অক্সিজেন পরমাণু ($2H_20 = 2H_2+0_2$) থেকে এর অণুর সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন বিগত ২০০ কোটি বছর অক্সিজেনের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া বায়ুমন্ডলের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

*কার্বানফেরাস যুগ, সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি।*

## বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব (Importance of Atmosphere)

বায়ুমন্ডলের দুটি মূলস্তর রয়েছে যথা- সমস্তর (Homosphere) ও অসম স্তর (Heterosphere)। সমস্তরের উপাদান সমূহ প্রায় একই রকম থাকে। ফলে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য Homosphere গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে Heterosphere মহাবিশ্বের ক্ষতিকর রশ্মি সমূহ থেকে পৃথিবীকে এক ধরনের আচ্ছাদন দিয়ে আগলে রাখে। সমস্তর ও অসমস্তরের মধ্যরেখা প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতার বলে ধরা হয়।

*বায়ুমন্ডলের দুটি মূল স্তর : সমস্তর ও অসমস্তর।*

Homosphere এ স্থানভেদে বিভিন্ন উপাদানগত (উষ্ণতা, আর্দ্রতা) তারতম্য জীবের কর্মকান্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বায়ুমন্ডলীয় উপাদানের সামান্য পরিবর্তন জীবের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। পরিবেশীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বিগত কয়েক দশকে পানি ও মাটির সঙ্গে বায়ুমন্ডল ও ব্যাপকভাবে দূষিত হয়েছে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, কারখানার বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন ও ধোয়া, প্রাকৃতিক গ্যাসের অতিমাত্রায় ব্যবহার বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে তুলেছে। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হচ্ছে। কার্বন যৌগ বায়ু স্তরের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে ক্ষতিকর রশ্মি আগমনকে প্রতিহত করতে অক্ষম করে তুলছে, অন্যদিকে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফাচ্ছাদন ও হিম শিখরের বরফ গলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কার ফলে, সমুদ্রতলের স্ফিতি, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা (E1 Nino-La-Nino) ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সীমাহীন আকার ধারণ করতে পারে।

*উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তর।*

## বায়ুর উপাদান (Composition of Atmosphere)

সমস্তরের (Homosphere) বায়ুর রাসায়নিক গঠন প্রায় একই রকম, বিভিন্ন গ্যাসীয় অবস্থা ও পরিমাপ সাধারনত অপরিবর্তনীয় হয়। এ গঠনের মধ্যে থাকে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাস (Constant gases), অনির্দিষ্ট চলক গ্যাস (Variable gases) এবং কিছু ধূলিকণা (Impurities)।

বায়ুর গঠনের জন্য দুটি উপাদানই ৯৯ শতাংশ স্থান দখল করে আছে, নাইট্রোজেন ৭৮ ভাগ ও অক্সিজেন ২১ ভাগ প্রায়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Argon) ও এ দুটি উপাদান কে নির্দিষ্ট গ্যাসের আওতায় ধরা হয়। অনির্দিষ্ট বা চলক গ্যাস গুলির মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাস্প ও ওজোন (Ozone) অন্যতম। অতি সামান্য মাত্রার হলেও এই গ্যাস সমূহ বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ৩.১০.১ সারণিতে বায়ুমন্ডলের নিম্ন স্তরে এই উপাদান সমূহের আয়তনগত বিন্যাস দেখানো হলো।

*বায়ুর প্রধান গঠন উপাদান নাইট্রোজেন (৭৮%) এবং অক্সিজেন (২১%)।*

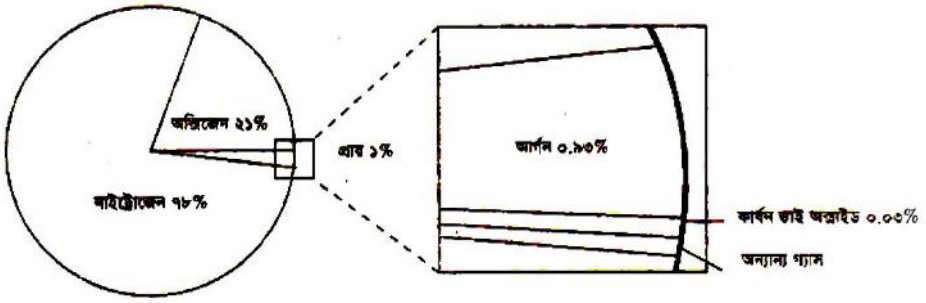


*চিত্র ৩.১০.১ : বায়ুর নিম্ন স্তরের গ্যাসের আয়তনিক শতকরা হার।*

**সারণি ৩.১০.১ : বায়ুস্থ বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের শতকরা হার (আয়তন অনুযায়ী)।**

| উপাদান | আয়তন (%) | | স্বল্পমাত্রায় গ্যাসীয় উপাদান |
|---|---|---|---|
| নাইট্রোজেন ($N_2$) | ৭৮.০৮ | নিয়ন (Ne) | ওজোন ($O_3$) |
| অক্সিজেন ($O_2$) | ২০.৯৫ | হিলিয়াম (He) | সালফার ডাই অক্সাইড ($SO_2$) |
| আর্গন (Ar) | ০.৯৩ | মিথেন ($CH_4$) | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ($NO_2$) |
| কার্বন ডাই অক্সাইড | ০.০০৩ | ক্রিপটন (Kr) | আয়াডিন ($I_2$) |
| | | নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$) | অ্যামোনিয়া ($NH_4$) |
| | | হাইড্রোজেন ($H_2$) | কার্বন মনোক্সাইড (CO) |
| | | জেনন (Xe) | |

**ধ্রুব গ্যাস** (Constant Gases)

ধ্রুব গ্যাস অপরিবর্তনীয় এবং এটি ক্ষতিকর ও সক্রিয় নয়। বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন অক্সিজেনের দ্রাবক হিসাবে কাজ করে; এটি দ্বারা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার পরিবর্তিত ও যৌগ গঠিত হয়, যা খাদ্য উৎপাদন ও অঙ্গজ গঠনে উদ্ভিদকূলে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

*অপারবর্তনীয় এবং ক্ষতিকর।*

বাতাসের অক্সিজেন সহজেই অন্য মৌলের সাথে যৌগ গঠন করে, ফলে এটিকে সক্রিয় বলে ধরা হয়। আমাদের জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। শ্বসনের মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন দেহ কোষে খাদ্য উপাদান বিশ্লেষন করে রক্তের মাধ্যমে শক্তি পরিবহনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এভাবে বিপাক ক্রিয়া সম্পাদনে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। শক্তি উৎপাদনে জ্বালানীর প্রজ্বলনে ও অক্সিজেন অপরিহার্য।

*শ্বসন, শক্তি পারবহণ, বিপাক ক্রিয়া।*

জ্বালানী গ্যাস তেল ইত্যাদি দ্রুত জারিত (Oxidized) হলেই শক্তির অবমুক্তি হয় এবং তা ব্যবহার যোগ্য হয়। অন্যদিকে ধীর গতির জারন এ লোহা জাতীয় দ্রব্যে মরিচা (Rust) ধরে। কার্বন ও হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন যৌগ গঠন করে যা জৈব গঠনের মূল একক।

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনর পরই বায়ুর উপাদান হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির অন্যতম হচ্ছে আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন ইত্যাদি। শুষ্ক অবস্থায় বায়ুতে এগুলোর মিশ্রণ একটি মাত্র গ্যাসের মত আচরণ করে। কোন কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বাণিজ্যিক ভূমিকা থাকলে ও এদের পরিবেশীয় গুরুত্ব কম।

**অনির্দিষ্ট / চলক গ্যাস** (Variable Gases)

স্বল্প মাত্রার উপস্থিতি হলেও চলক গ্যাসসমূহ বায়ুমন্ডলের অবস্থাও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে **১.** কার্বন ডাই অক্সাইড, **২.** জলীয় বাস্প বা বায়ুর আর্দ্রতা ও **৩.** ওজোনস্তর।

## ১. কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$)

যদিও শুষ্ক বায়ুতে মাত্র ০.০০৩ শতাংশ থেকে ০.০৪ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তবুও এর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত: দুটি বিশেষ কার্যে অবদান রাখে-

ক. সালোক সংশ্লেষণ ও

খ. তাপশক্তি শোষণ।

সালোক সংশ্লেষণ উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ ও ব্যবহার করে কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) গঠন করে যা জীবের কোষ কলা গঠন ও খাদ্য উৎপাদনে গ্লুকোজ তৈরী করে সরবরাহ করে। সকল জীবের খাদ্য প্রকৃত পক্ষে এভাবেই তৈরী হয়।

*নিষ্ক্রিয় গ্যাস।*

পৃথিবীর কিছু বিকিরিত তাপ শক্তি তথা সৌর বিকিরণের তাপশক্তি শোষণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা স্থিত রাখে, বর্তমানে এর মান প্রায় ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, জীবের প্রাণ রক্ষায় যা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

*চলক গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাস্প ও ওজোন স্তর।*

কার্বন ডাই অক্সাইডের অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে বিচুর্ণীভবন অন্যতম। চুনাপাথরের (Limestone) ক্ষয় ও ভূমিরূপ নিয়ন্ত্রনে এটি ভূমিকা রাখে। বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ১৯৬০ সালের পর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির (Global warming) ফলে মারাত্নক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

## ২. বায়ুর আর্দ্রতা (Water Vapour)

বায়ুর আর্দ্রতা হচ্ছে বায়ুস্থ জলীয়বাস্প ($H_2O$)। স্থান ভেদে জলীয়বাস্পের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মরুদেশে এর পরিমাণ মাত্র ০.০২ শতাংশ, অন্যদিকে নিরক্ষীয় আর্দ্র বা উষ্ণ সমুদ্র পৃষ্ঠে এর পরিমাণ ৪ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্বল্প মাত্রার হলেও বায়ুমন্ডলের ভৌতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলীয়বাস্প জলবায়ু ও আবহাওয়াকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রভাবিত করে।

*মরু এলাকায় বায়ুর আর্দ্রতা সর্বনিম্ন (০.২%) এবং নিরক্ষীয় এলাকায় এর পরিমাণ সর্বোচ্চ (৪%)*

ক. জলীয়বাস্প বায়ুমন্ডলের একমাত্র উপাদান যা স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রায় ঘনীভূত হয়। জলীয়বাস্প সবধরনের ঘনীভবন (Condensation) ও বারিপাতের (Precipitation) একমাত্র উৎস। জলীয় বাস্পের তাপমাত্রা ও ধরনের উপর নির্ভর করে বারিপাতের ধরন (বৃষ্টিপাত, তুষার, শৈলপাত) ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ. সূর্যালোকের বিকিরণ শক্তি শোষণ করে এটি একটি তাপীয় আচ্ছাদন হিসাবে কাজ করে, বায়ু প্রবাহের ফলে এ তাপ পৃথিবীব্যাপী বন্টনেও কার্যকরী অবদান রাখে, ফলে সহনীয় তাপমাত্রা জীবজগতকে রক্ষা করে।

*জলীয় বাস্প, সূয্যালোকের বিকিরণ শক্তি, সুপ্ততাপ ও সঞ্চিত শক্তি।*

গ. সুপ্ত তাপ ও সঞ্চিত শক্তির উৎস হিসাবে জলীয় বাস্প অনন্য। পানির বাস্পীভবনের লীনতাপ ৬০৭ ক্যালরী অন্যদিকে ঘনীভবন/বিগলনের লীনতাপ ৭৯ ক্যালরী। বাস্পীভবনের ফলে লীনতাপটি স্থিতিশক্তি অবমুক্ত করে। ফলে বায়ুমন্ডলের ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত কিম্বা প্রবাহের মূল উৎস হচ্ছে বাস্পীয় স্থিতিশক্তি। বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া ও চরিত্র মূলত: জলীয় বাস্পই নিয়ন্ত্রন করে। বায়ুমন্ডলের জলীয় বাস্পের শতকরা ৫০ ভাগই থাকে মাত্র দুই কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে।

**৩. ওজোন স্তর (Ozone)**

অক্সিজেন অণুর ($O_2$) গঠনের সদৃশ হলেও ওজোন তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়। ওজোন বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর নামক স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এ স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বেশীর ভাগ ওজোনই ২০-২৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পাওয়া যায়।

*ওজোন স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।*

বায়ুমন্ডল এ উচ্চতায় বা তারও উপরে সূর্যের অতিবেগুনী (Ultra violet) রশ্মি শোষনের ফলে অক্সিজেন অণু ($O_2$) ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থায় একটি অক্সিজেন পরমাণু অন্য একটি নিরপেক্ষ অণুর উপস্থিতিতে অক্সিজেন অণুর সাথে মিলিত হয়ে ওজোন ($O_3$) গঠন করে। ওজোনের পরিমাণ বায়ুমন্ডলে খুবই কম মাত্রায় (০.০০০১ শতাংশ) পাওয়া যায়।

বায়ুস্থ ওজোন স্তর জীব জগতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ সূর্যের থেকে অতিবেগুনী রশ্মির বেশীর ভাগই ওজোন স্তরে শোষিত হয়। অতি বেগুনী রশ্মি জীবদেহের জন্য ক্ষতিকর, ক্যান্সার ও বিবিধ রোগের সৃষ্টি করে এটি জৈব জগতকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ওজোন স্তর ধ্বংস হয় প্রধানত প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত নাইট্রিক অক্সাইড (NO) (দ্বারা ৫০-৭০%); মুক্ত অক্সিজেন পরমাণু ওজোনের সাথে মিশে অক্সিজেন তৈরী করে (১৮% উৎপাদিত ওজোন), ক্লোরিনের সাথে মিশে (১১%) এবং অন্যান্য ভাবে (২০%)।

**অন্যান্য চলক গ্যাস (Other Variable Gases)**

বাতাসের অন্যান্য স্বল্পমাত্রার উপাদানগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, এ্যামোনিয়া, মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইড অন্যতম। এগুলো মিলিয়নের এক ভাগ বা তার বেশী হলে ক্ষতিকর হয়।

**ধূলিকণা (Impurities)**

*জৈব জগত, নাইট্রিক অক্সাইড, ক্লোরিন, অক্সিজেন।*

বায়ুমন্ডলের নিম্ন স্তরে প্রচুর ধূলিকণা বিদ্যমান থাকে। শিল্প বা নগর এলাকায় ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশী হয়, আবার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বাতাসে প্রচুর ধুলিকণা মিশে যেতে পারে। বাতাসে ধূলিকণা সাধারণত ভাসমান অবস্থায় কুয়াশা বা ধোঁয়া (Aerosols) আকারে থাকে।
বায়ুমন্ডলে ধূলিকণার বিভিন্ন ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

*কুয়াশা বা ধোঁয়া।*

১. সূর্যালোকের প্রতিফলন ও বিচ্ছুরন ঘটিয়ে স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘের (Short wave length) আলো ছড়িয়ে দেয়। এজন্য আকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রং এ পরিলক্ষিত হয়। রং বৈচিত্রে কখনো নীলচে আবার সূর্যাস্তের সময় লাল রং দৃষ্টি গ্রাহ্য হয়।

২. ধূলিকণায় অনেক সময় বৃষ্টিকণা জমে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে, কুয়াশা সৃষ্টি করে ও মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরী করে।

৩. অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ধূলিকণা এবং বৃহৎ নগরীর ধূলিকণা আকাশে ধোঁয়ার সষ্টি করলে সূর্যালোকের স্বল্পতা হেতু স্থানীয় তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

*রং-এর বৈচিত্র, মেঘাচ্ছন্ন পরবেশ, স্থানীয় তাপমাত্রার হ্রাস।*

ধূলিকণা (Impurities) এর মধ্যে ধোয়া, মাটির কণা, সমুদ্র ঢেউয়ের ভেঙ্গে পড়ায় সৃষ্ট লবন কণা, নিম্নবায়ু স্তরে উদ্ভিদের পরাগ (Pollen and Spores) এবং ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একটি মেট্রোপলিটন এলাকায় বাতাসে প্রতি ঘন মিলিমিটারে ২০০টি কণা এবং শিল্পোন্নত এলাকায় প্রায় ৪০০০ কণা থাকতে পারে। অতিরিক্ত ধুলিকণা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

*বায়ুর প্রধান গ্যাসীয় উপাদান কি কি এবং এদের আয়তন কত?*

**পাঠসংক্ষেপ**

ভূ-অভ্যন্তরের নির্গত গ্যাস থেকে বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি। সমস্তর ও অসমস্তর - এ দুই ধরনের স্তর নিয়ে বায়ুমন্ডল গঠিত। সমস্তরে বায়ুমন্ডলের গঠন উপাদানে কোন তারতম্য থাকে না; যা অসমস্তরে দেখা যায়। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন ও কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলের প্রধান গ্যাসীয় উপাদান।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১০

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ বায়ুমন্ডলের ৯০ শতাংশ অবস্থান করছে ভূত্বক থেকে
- ক. ৫ কি.মি
- খ. ১৫ কি.মি
- গ. ৩০ কি.মি.
- ঘ. ১০০ কি.মি. এর মধ্যে

১.২ ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে
- ক. নাইট্রোজেন পার অক্সাইড
- খ. নাইট্রিক এসিড
- গ. জলীয় বাস্প
- ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড

১.৩ বায়ুতে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় আছে
- ক. অক্সিজেন
- খ. ধুলিকণা
- গ. নাইট্রোজেন
- ঘ. মেঘ

১.৪ ওজোন স্তর সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় যে উচ্চতায়
- ক. ১০-১৫ কি.মি
- খ. ১৫-২০ কি.মি.
- গ. ১৫-৫০ কি.মি.

ঘ. ২০-২৫ কি.মি.

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১. বায়ুমন্ডল কাকে বলে?

২. বায়ুর প্রধান গঠন উপাদান সমূহ কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বায়ুমন্ডল কাকে বলে? কিভাবে বায়ুমন্ডল গঠিত হয়েছে? বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. বায়ুমন্ডলের উপাদান কি কি? উপাদানগুলোর আয়তনিক হার ও কার্য বর্ণনা করুন। ওজোনস্তর ও তার কাজ কি?

# পাঠ ৩.১১ : বায়ুমন্ডলের স্তর বিন্যাস (Layered Structure of the Atmosphere)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন–

◈ বায়ুমন্ডলের স্তর বিন্যাস, উচ্চতার সাথে চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন;

◈ পরিবেশ ও জীবজগতকে রক্ষায় প্রতিটি বায়ুমন্ডলীয় স্তরের ভূমিকা ও গুরুত্ব।

উচ্চতার সাথে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এই তাপমাত্রায় পার্থক্যের উপর নির্ভর করে বায়ুমন্ডলেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্রে (চিত্র ৩.১১.১) বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা পরিবর্তন, চাপের ক্রমহ্রাস ও বায়ুমন্ডলের ভাগগুলো দেখানো হল -

বায়ুমন্ডলের প্রধান চারটি ভাগ হচ্ছে

১. ট্রপোমন্ডল (Troposphere)

২. স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere)

৩. মেসোমন্ডল (Mesosphere)

৪. তাপমন্ডল (Thermosphere)।

বায়ুমন্ডলের চাপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি উচ্চতার সাথে হ্রাস পায়। মাত্র ১৮ কি.মি. পর্যন্তই চাপের পরিবর্তন হয়ে একদশমাংশে দাঁড়ায়। নিচে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

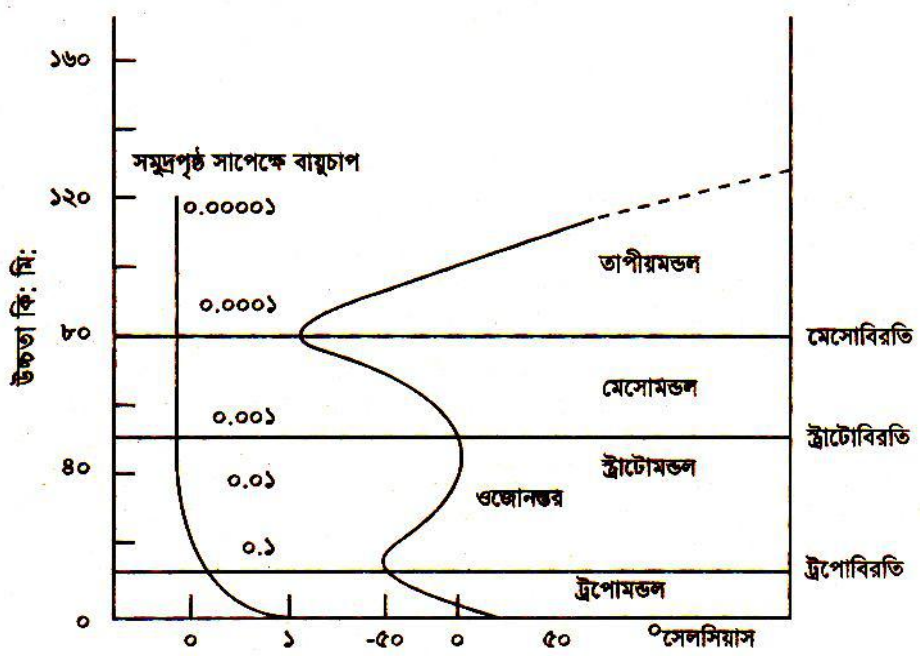


*চিত্র ৩.১১.১ : উচ্চতার সাথে বায়ুমন্ডলের তাপ ও চাপের পারবর্তন।*

## ১. ট্রপোমন্ডল (Troposphere)

ট্রপোমন্ডল বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হওয়ায় এ স্তর জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। ট্রপোবিরতি মেরু এলাকায় প্রায় ৮ কিলোমিটার ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৬ থেকে ১৯

কিলোমিটার উঁচুতে। অর্থাৎ ট্রপোমন্ডলে বায়ুর গড় গভীরতা প্রায় ১২ কিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ১.৫ কিলোমিটার থেকে ২ কিলোমিটার উচ্চতায় ভূমির বন্ধুরতার জন্য বায়ু প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে ওঠা নামার কারণে বায়ু অশান্ত থাকে। ভূমির উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলেও বায়ু ওঠা নামা করে। জলীয় বাস্প ধূলিকণা সব মিলেমিশে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ঝড় বৃষ্টি ঘটায়। তাপমাত্রার ক্রম হ্রাস (Lapse rate) এই মন্ডলে ৬.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ট্রপোমন্ডলে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। ঝড়-মেঘ, বৃষ্টি ও আবহাওয়া পরিবর্তন এ মন্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে। ২৫° এবং ৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে ট্রপোমন্ডলে কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। দ্রুত গতি সম্পন্ন বায়ু ঐ সকল স্থান দিয়েই স্ট্রাটোমন্ডল থেকে ট্রপোমন্ডলে প্রবেশ করে, এভাবে শক্তি ও উৎপাদন বিনিময় হয়। ট্রপোমন্ডলের নিচে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ২০° সে: এবং ট্রপোবিরতিতে তাপমাত্রা কমে গিয়ে প্রায় -৫০° থেকে -৬০° সে: পর্যন্ত হয়।

*ট্রপোমন্ডল বায়ুস্তরের সর্বনিম্ন স্তর। এ মন্ডলের বায়ুর গড় গভীরতা প্রায় ১২ কি.মি.।*

## ২. স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere)

স্ট্রাটোমন্ডল ট্রপোবিরতি থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রপোবিরতির পর ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না। তারপর তাপমাত্রা -৫০°/-৬০° সে: থেকে বাড়তে থাকে এবং স্ট্রাটোবিরতি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। স্ট্রাটোবিরতিতে তাপমাত্রা ০° সে: বা তার কাছাকাছি হয়। বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরের বেশীর ভাগ এ মন্ডলেই থাকে। ওজোন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষন করে উত্তপ্ত হয় বলেই এ স্তরে তাপের উৎক্রম দেখা দেয়। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ খুব কম থাকে, জলীয় বাস্প নেই বললেই চলে। বিমান চলাচলের জন্য এ শান্ত পরিচ্ছন্ন মেঘহীন স্তরই ব্যবহার করা হয়।

*৫০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।*

## ৩. মেসোমন্ডল (Termosphere)

স্ট্রাটোমন্ডলের উপর ৫০ থেকে ৮০ কি.মি. উচ্চতায় স্টাস্ট্রোবিরতি ও মেসোবিরতির মধ্যকার বায়ুস্তর হচ্ছে মেসোমন্ডল। মেসোমন্ডলে বায়ুর তাপমাত্রা ০° সে: থেকে ক্রম হ্রাসের ফলে মেসোবিরতিতে গিয়ে ৯০° সেলসিয়াস হয়। এ স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম; ৫০ কি.মি. উচ্চতায় ১ মিলিবার থেকে কমতে কমতে ৯০ কিলোমিটার উচ্চতায় এর মান হয়ে যায় ০.০১ মিলিবার। মেসোমন্ডলে মূলত মেঘহীন ও জলীয়বাস্পহীন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলে রাতে এই সব স্তরে মেঘ সদৃশ্য কিছু বস্তু দেখা যায় এগুলো হচ্ছে উল্কাপিন্ডের গ্যাস ও তার আবরনে জমাট বরফে আলোর প্রতিফলন মাত্র। সূর্যরশ্মির প্রভাবে অণুভেঙ্গে যখন আধানযুক্ত আয়ন গঠন করে যা Ionization নামে পরিচিত তার ফলে সৃষ্ট স্তরকে ডি-স্তর (D-layer) বলা হয়। ডি-স্তর বেতার তরঙ্গ প্রবাহে প্রতিবন্ধক তৈরী করে। মহাশূণ্যযানকে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় মেসোমন্ডলের ডি-স্তরের বাঁধাকে কাটিয়ে আসতে হয়।

*মেসোমন্ডল স্ট্রাটোমন্ডলের উপরের স্তর। তাপমাত্রা ০° সে. থেকে ৯০° সে. এ সীমাবদ্ধ।*

## ৪. তাপমন্ডল (Thermosphere)

তাপমন্ডল মেসোবিরতি (৮০ কি.মি.) থেকে শুরু করে বায়ুমন্ডলের সর্বশেষ সীমা অতিক্রম করে প্রায় ৬০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। মেসোবিরতির -৯০° সে: তাপমাত্রা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ৩৫০ কি:মি: উচ্চতায় ৯০° সে: পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ উচ্চতায় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু অত্যন্ত খাটো তরঙ্গ মাপের সৌরশক্তি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। অক্সিজেন অণুগুলো ভেঙ্গে আধান যুক্ত কণায় পরিনত হয়। আধান যুক্ত কণাকে আয়ন বলে। আয়ন মন্ডল মেসোবিরতি থেকে শুরু করে তাপমন্ডলে প্রায় ১০০ কি:মি: উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ আয়ন মন্ডল বেতার তরঙ্গ প্রতিফিলিত

*তাপমন্ডল বায়ুমন্ডলের সর্বশেষ স্তর। এর পুরুত্ব প্রায় ৬০,০০০ কি.মি.।*

করে। আয়ন মন্ডলের দুটি স্তরকে যথাক্রমে ই-স্তর (E-layer) এবং এফ-স্তর (F-layer) বলে। আয়ন মন্ডলে পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে এসব আধান যুক্ত কণা জড় হয়ে উভয় গোলার্ধে মেরু আলো (Aurora) সৃষ্টি করে। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে এ মেরু-আলো যথাক্রমে মেরু-বোরিয়ালিস ও মেরু-অস্ট্রালিস নামে পরিচিত।

*এক্সমন্ডল ও চুম্বকীয় মন্ডল।*

আয়ন মন্ডলের উপর স্তর দুটি যথা: এক্সমন্ডল (X-sphere) ও চুম্বকীয় মন্ডল (Magnetosphere)। এক্সোস্ফিয়ার প্রধানত অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু দ্বারা গঠিত। এটি প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে অণুর ঘনত্ব এত কম যে অণুসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না। এক্সোস্ফিয়ার বায়ুর বহি:সীমানা নির্ধারণ করে। ধারণা করা হয় যে, চুম্বকীয় মন্ডল আরো অনেক বাইরে বিস্তৃত। এর বাইরের সীমানা চুম্বকীয় বিরতি (Magnetopouse) নামে পরিচিত এবং এরূপ নামকরনের কারণ হচ্ছে এ স্তরে পৃথিবীর অভিকর্ষ অপেক্ষা চৌম্বিক বলের প্রভাব অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়। চৌম্বকীয় মন্ডল আবহাওয়া মন্ডলকে সূর্য থেকে আগত অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুতায়িত বিকিরণ (Ionized Radiation) থেকে রক্ষা করে। এ বিদ্যুতায়িত সৌরঝড় (Solar-radiation) হিসাবে (অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন ও প্রোটন) চুম্বকীয় মন্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে যায়; যার ফলে সমস্ত জীবজগৎ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রান পায়।

*বায়ুমন্ডলের প্রধান স্তরসমূহ কিকি ?*

**বায়ুমন্ডলীয় চক্র (**Atmospheric Cycles)

পৃথিবীর উৎপত্তির শুরু থেকেই (প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর পূর্বে) তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত গ্যাসীয় পদার্থ থেকে। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় বায়ুর গঠন উপাদান গুলো এমন ভাবে একটি গতিশীল সমতায় পৌঁছেছে যে ব্যাপক দূষনের মাধ্যমে দূষিত করা সত্বেও এ সমতা বজায় থকছে। বায়ুস্তরের ভিন্নতা ও বিভিন্নস্তরের মিশ্রনে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধারনত হয় না। তবে বায়ুর নিম্নস্তরে সংকটাপন্ন প্রবাহ হয় যেখানে বায়ু ভূত্বকের সাথে বারিমন্ডল ও জীবজগতে এক হয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ন চক্রগুলো এ নিম্নস্তরে পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণগত পরিবর্তন ও আবর্তনের মাধ্যমে সূচীত হয়।

*পানিচক্র, অক্সিজেন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন-ডাই-অক্সাইড চক্র।*

**ক. পানিচক্র ঃ** পানির আবর্তন যা মহাসমুদ্র, বায়ুস্থ জলীয় বাস্প, ভূত্বক জৈবজগৎ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে আবর্তিত হয়।

*পানির আবর্তন, শ্বসন প্রক্রিয়া, ব্যাকটেরিয়া।*

**খ. অক্সিজেন চক্র ঃ** অক্সিজেন বাতাসে সালোক সংশ্লেষনের সহ উৎপাদক হিসাবে অবমুক্ত হয়। আর তা বিমুক্ত বা যুক্ত হয়ে আবদ্ধ হয় জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় অথবা রাসায়নিক বন্ধনে জারিত (Oxidation) হলে।

**গ. নাইট্রোজেন চক্র (**Nitrozen Cycle**) ঃ** নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ব্যাকটেরিয়া (Nitrozen fixing bacteria) যা বায়ু ও মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেন গ্রহন করে গাছের প্রয়োজনে জৈবিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ জৈব যৌগের বেশীর ভাগই জৈবিক আমিষ (Organic Protein) এর কিছুটা প্রাণীতে গ্রহন করে উদ্ভিদ ভক্ষনের মাধ্যমে। জীবের মৃত্যুর পর এ নাইট্রোজেন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে, তারপর নাইট্রেট এবং সর্বোপরি গ্যাসীয় বা বায়বীয় নাইট্রোজেন হিসাবে বাতাসে ফিরে যায়।

**ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড চক্র (**Carbon-di-oxide Cycle**):** বায়ু ও সমুদ্রের মাঝে এ আবর্তন বড় বেশী মাত্রায় হয়। সমুদ্রের এ গ্যাস সরাসরি বায়ু থেকে দ্রবীভূত হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিপাকের

মাধ্যমে এবং জৈব বস্তুর অক্সিডেশনের (Oxidation) মাধ্যমে ও কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু মন্ডল থেকে হ্রাস পায়। অন্যদিকে প্লাংকটোন (Plankton) নামক ক্ষুদ্র অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবের মাধ্যমে অবমুক্ত হয়ে বায়ু মন্ডলে ফিরে যায়। স্থলজ উদ্ভিদের মাধ্যমে ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আরেক বিশাল চক্র বায়ুমন্ডলের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সালোক সংশ্লেষণে গ্রহন ও প্রশ্বাসে এবং মৃত্যুতে প্রকৃতিতে নির্গমন হয়। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রজ্বলনের ফলে জৈব যৌগের বা জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে বাতাসে ক্রমাগত কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে।

*বিপাক, জৈববস্তুর অক্সিজেশন।*

*প্রধান বায়ুমন্ডলীয় চক্র সমূহ কি কি?*

## পাঠসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ৬০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত। এ বিস্তৃত বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্নের স্তরের নাম ট্রপোমন্ডল, এর উপরের স্তর যথাক্রমে স্ট্র্যাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল ও তাপমন্ডল। বায়ুর চাপ ট্রপোমন্ডলেই সর্বাধিক। বায়ুমন্ডলের গঠনগত গ্যাসীয় উপাদান একটি গতিশীল সমতায় আছে, বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া এ সমতার সাধারনত পরিবর্তন হয় না।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১১

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক** (√) **চিহ্ন দিন** (সময় ২ মিনিট) ঃ

১.১ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়

ক. এক্সমন্ডলে খ. আয়নমন্ডলে

গ. চুম্বকীয়মন্ডলে ঘ. মেসোমন্ডলে

১.২ ট্রপোমন্ডলের নিচে ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা–

ক. ২০° সে. খ. ১০° সে.

গ. ৩০° সে. ঘ. ৪০° সে.

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১. বায়ুমন্ডলের প্রধান স্তরগুলি কি কি?

২. বায়ুমন্ডলীয় চক্রগুলো কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো কি কি? প্রতিটি স্তরের তাপমাত্রার সীমা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

২. বায়ুমন্ডলের চক্র কি? এ ধারণাটির বিস্তারিত আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.১২ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু : উপাদান ও গঠন

(Weather and Climate : Properties and Composition)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন –

- ◈ আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে?
- ◈ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব;
- ◈ জলবায়ুর উপাদান সমূহ ও তার ভূমিকা ;
- ◈ জলবায়ুর প্রকারভেদ সম্পর্কে।

## আবহাওয়া ও জলবায়ু (Weather and Climate)

কোন স্থানের বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, আলোর ব্যবস্থা ও বৃষ্টিপাতের তাৎক্ষনিক (মিনিট/মাসাধিক) পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সেই অঞ্চলের আবহাওয়া বলে। জলবায়ু হচ্ছে আবহাওয়াগত অবস্থার কয়েক বৎসরের গড়। যত বেশী সময়ের গড় হয় অসামঞ্জস্য অবস্থার তত বেশী সরলীকরণ হয়। এ জন্য বেশী সময় ব্যাপী অবস্থার গড় জলবায়ু বিশ্লেষনে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। সাধারনত কোন স্থানের ৩০/৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ুতে গড় ফল হিসাব করা হয় বলে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো স্থানের জৈববিন্যাসে, জলবায়ু পর্যবেক্ষনে আবহাওয়ার চরম ও নিম্ন অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জলবায়ু জৈব বিন্যাসের শক্তি ও জল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রন করে।

*কোন স্থানের ৩০-৩৫ বৎসরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।*

জলবায়ুগত পরিবর্তন বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে বা ট্রপোমন্ডল (Troposphere) এ সংগঠিত হয়। স্ট্রাটোমন্ডলের নিম্নভাগ কদাচিৎ এতে অংশগ্রহন করে। ওজোন স্তরে হ্রাসবৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রাজনিত পরিবর্তন জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।

*আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে?*

## জলবায়ুর উপাদান (Properties of Climate)

কোন স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা থেকে সেই স্থানের জলবায়ুর ভিত্তি তৈরী হয়। দৈনন্দিন আবহাওয়া মূলত: চারটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত উপাদান গুলো হচ্ছে-

*আবহাওয়ার প্রধান উপাদানঃ সূর্যালোক, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ।*

ক. সূর্যালোক (Sunlight) খ. উষ্ণতা (Temperature)
গ. আর্দ্রতা (Humidity) ঘ. বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Air pressure and wind direction)।

সূর্যালোক তাপমাত্রাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রন ও প্রভাবিত করে। তাপমাত্রা আবার বায়ুপ্রবাহ, স্থল ও জল ভাগের বন্টনের উপর নির্ভর করে আর্দ্রতার উপর প্রভাব রাখে। ভূমিরূপের বন্ধুরতা সরাসরি আবহাওয়াগত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। এ পারস্পরিক সম্পর্ক পৃথিবীর উপর সকল উপাদানের বন্টন দ্বারা পরিচালিত হয়। নিরক্ষ রেখার সন্নিবেশিত বা দূরবর্তী অবস্থানের জন্য জলবায়ুর তারতম্য

পরিলক্ষিত হয়। জলবায়ু অঞ্চল ভাগে ও প্রকৃতি নির্ধারনে কয়েকটি উপাদানের ভিত্তি আলোচনা করা হলো।

## উষ্ণতা

উষ্ণতার উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর বিভাজন সরাসরি সূর্যালোকের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নলিখিত সারণিতে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

*উষ্ণতা ভিত্তিক জলবায়ু বিভাজন সূর্যালোকের সাথে সম্পর্কিত।*

*সারণি ৩.১২.১ ঃ উষ্ণ দিনের সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক*

| অঞ্চল | উষ্ণ দিনের সংখ্যা |
|---|---|
| উপমেরু অঞ্চল (Subarctic) | ১-৬০ |
| উচ্চ অক্ষাংশ (High latitude) | ৬১-১২০ |
| মধ্য অক্ষাংশ (Mid Latitule) | ১২১-১৮০ |
| উষ্ণভাবাপন্ন (Subtropical) | ১৮১-২৪০ |
| উষ্ণ মন্ডল (Tropical) | ২৪১-৩০০ |

## আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

*আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত।*

বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। বায়ুর স্থানিক আর্দ্রতার উপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ভর করে না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ু আর্দ্র হলেও বায়ু তাড়িত হয়ে অনেক সময় অনত্র বারিপাত হয় ফলে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে; আবার বাস্পীভবন দ্রুত হয় বলে শুষ্কতার মাত্রাও বাড়ে। বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে জলবায়ুকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১. শুষ্ক; ২. শুষ্ক ভাবাপন্ন; ৩. আর্দ্র ভাবাপন্ন; ৪. আর্দ্র; ৫. অতিসিক্ত।

এ সমস্ত জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণগত তারতম্য সারণি ৩.১২.২ দেখানো হলো।

*সারণী ৩.১২.২ বৃষ্টিপাতের সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক*

| জলবায়ুর ধরন | বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত (সে. মি.) |
|---|---|
| শুষ্ক (Arid) | ০-২৫ |
| শুষ্কভাবাপন্ন (Semi-arid) | ২৬-৫০ |
| আর্দ্রভাবাপন্ন (Semi-humid) | ৫১-১০০ |
| আর্দ্র (Humid) | ১০১-২০০ |
| অতিসিক্ত (Very Wet) | ২০১ বা তার বেশী |

*আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য কি ?*
*জলবায়ুর প্রধান উপাদানগুলি কি কি ?*

*উষ্ণতা ও বারিপাত।*

বনভূমি হচ্ছে জলবায়ুর উপাদানের মধ্যে উষ্ণতা ও বারিপাতের ঋতুকালীন পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর, এর উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর যে বিশেষ প্রকারভেদ করা যায় তা নিম্নরূপ:

**১. ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (Tropical moist Climate) ঃ** সব ঋতুতেই উষ্ণ;

**২. শুষ্ক জলবায়ু (Dry Climate) ঃ** শুষ্ক থেকে প্রায় শুষ্কভাবাপন্ন, যেখানে বাস্পীভবন বারিপাতের চেয়ে বেশী মাত্রায় সংগঠিত হয়;

**৩. আর্দ্র মাঝারি উষ্ণতার জলবায়ু (Humid Mesothermal) ঃ** মৃদু শীত কিন্তু মাঝারি গ্রীষ্মকাল;

**৪. আর্দ্র সুক্ষ্ম উষ্ণতার জলবায়ু (Humid Microthermal) ঃ** তীব্র শীত কিন্তু নমনীয় গ্রীষ্মকাল;

**৫. মেরু দেশীয় জলবায়ু (Polar Climates) ঃ** চির তুষার রাজ্য, উষ্ণতা সারা বছর হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

## শক্তি ও আর্দ্রতা (Energy and Moisture)

শক্তি ও আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে জলবায়ু মন্ডল ভাগে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমত: বারিপাত ও বাস্পীয় ভবনের সূচক (Precipitation/Evaporation Index) তৈরী করা হয় এবং তাপমাত্রার সাথে বাস্পীয় ভবনের অনুপাত করে (T/E) তাপমাত্রার কার্যকারিতা (Temperature Efficiency) পরিমাপ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে ভাগগুলি নিম্নরূপ দেখানো যায়:

*বারিপাত ও বাস্পীয় ভবনের সূচক এবং তাপমাত্রার সাথে বাস্পী ভবনের অনুপাত।*

*সারণি ৩.১২.৩ ঃ বারিপাত, আর্দ্রতা, বনভূমি ও তাপ বলয়ের বিন্যাস*

| বারিপাত/বাস্পীভবন (P/E) এবং তাপমাত্রা ও বাস্পীভবন (T/E) সূচক (১২ মাসের গড় অনুপাত) | আর্দ্রতা অঞ্চল | উদ্ভিদের ধরন | তাপ বলয় (Temperature Realm) |
|---|---|---|---|
| > ১২৭ | A | নিবিড় বন (Rain Forest) | ক্রান্তীয় (Tropical) |
| ৬৪-১২৭ | B | বনভূমি (Forest) | মধ্য তাপীয় (Mesothermal) |
| ৩২-৬৩ | C | সাভানা (Savana) | মৃদু তাপীয় (Microthermal) |
| ১৬-৩১ | D | স্তেপ (Steppe) | তইগা (Taiga) |
| < ১৬ | E | মরুজ (Desert) | তুন্দ্রা (Tundra) |
| ০ | F | মেরুজ (Polar) | মেরুদেশীয় (Polar) |

## পাঠ সংক্ষেপ

কোন স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ু চাপ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত এর গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী গড় অবস্থাই জলবায়ু। দৈনন্দিন আবহাওয়া মূলত: চারটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত উপাদান গুলো হচ্ছে -

ক. সূর্যালোক (Sunlight) খ. উষ্ণতা (Temperature)
গ. আর্দ্রতা (Humidity) ঘ. বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Air pressure and wind direction)

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১২

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ কোনটি জলবায়ুর উপাদান নয় -

ক. উষ্ণতা খ. আর্দ্রতা
গ. সমুদ্র স্রোত ঘ. বায়ুপ্রবাহ

১.২ জলবায়ুর উপাদান হিসাবে কাজ করে না -

ক. সমুদ্র সান্নিধ্য খ. অক্ষাংশ
গ. দ্রাঘিমাংশ ঘ. উচ্চতা

১.৩ আর্দ্রভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত সেন্টিমিটার -

ক. ৪০-১০০ খ. ৫১-১০০
গ. ৫১-১১০ ঘ. ৪০-১১০

১.৪ উষ্ণতার উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর বিভাজন সরাসরি সম্পর্কেত-

ক. সূর্যালোকের খ. উষ্ণতার ওপর
গ. আর্দ্রতার ওপর ঘ. বায়ুর ওপর

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২ X ৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে?
২. জলবায়ুর উপাদান কি কি?
৩. বনভূমির উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর প্রকারভেদ করুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আবহাওয়া ও জলবায়ু কি? জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.১৩ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক
## (Factors of Weather and Climate)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন –

◈ আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক, তাদের কার্যপ্রণালী ও প্রভাব সম্পর্কে।

আবহাওয়া উপাদান সমূহ অনেকগুলো ভূ-প্রাকৃতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. অক্ষাংশ ভিত্তিক সূর্যালোকের আপতন মাত্রা ও দিবা ভাগের স্থায়িত্ব
২. স্থল ভাগ ও জলভাগের বন্টন
৩. বায়ুপ্রবাহ
৪. উচ্চতা
৫. ভূ-প্রকৃতি
৬. ভূমির ঢাল
৭. আধা স্থায়ী নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়সমূহ
৮. সমুদ্রস্রোত
৯. বনভূমির অবস্থান
১০. সমুদ্র থেকে দূরত্ব।

এসব নিয়ামক সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে না, বরং স্থানভেদে বিভিন্ন নিয়ামকের সংমিশ্রনে একটি স্থানের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। নিম্নে নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

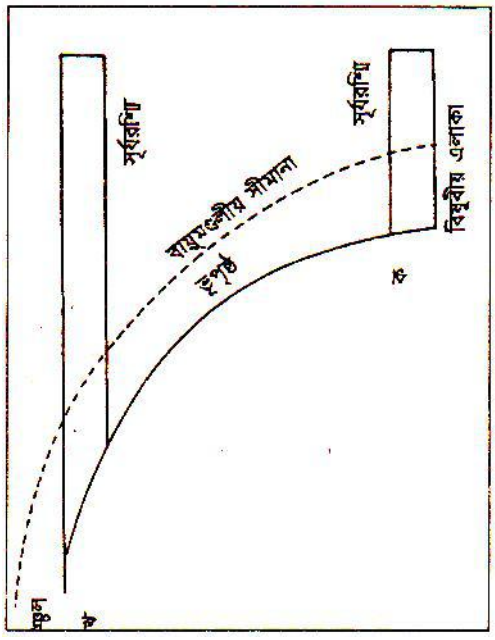


*চিত্র ৩.১৩.১ : সূর্যরশ্মির আপতনে অক্ষাংশের প্রভাব।*

### অক্ষাংশ (Latitude)

*নিরক্ষীয় অঞ্চলে লম্বভাবে সূর্যকিরণ দেয়।*

সূর্যের কিরণমাত্রা অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে অল্প স্থানে সূর্যালোক আপতিত হয় বলে বায়ু সহজেই উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া লম্বভাবে পতিত হওয়ায় স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে। ফলে শোষিত বা প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনা মূলক ভাবে কম থাকে। অপরদিকে উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তীর্যকভাবে কিরণ দেয়, ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কম। অক্ষাশভেদে সূর্যরশ্মিও এ আপতন বৈশিষ্ট্য চিত্র ৩.১৩.১ এর সাহায্যে দেখানো হল। চিত্রে লক্ষ করুন মেরু এলাকায় আপতিত রশ্মি অনেকখানি কৌনিকভাবে পতিত হওয়ায় আলোকরশ্মি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেই তুলনায়, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় স্বল্প স্থান জুড়ে কিরণ দেয় এবং দূরত্বও কম।

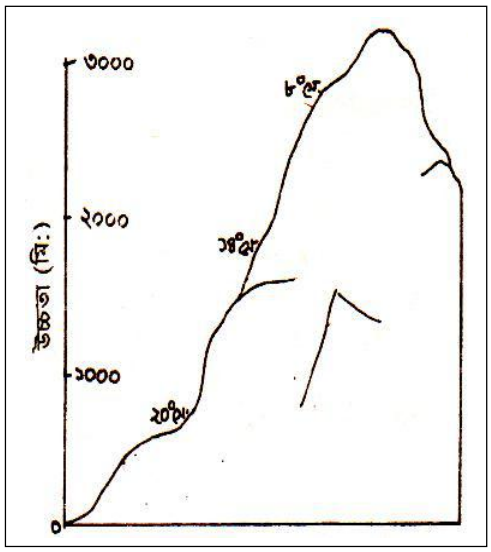


*উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে উষ্ণতা হ্রাস পায়।*

**উচ্চতা (Altitude)**

ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্র সমতল থেকে কত উঁচু তা ঐ এলাকায় তাপ, চাপ ও আর্দ্রতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। চিত্র ৩.১৩.২ এ উচ্চতা বৃদ্ধিও সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক দেখানো হলো। উষ্ণতা হ্রাসের হার প্রতি হাজার মিটাতে ৬ সেলসিয়াস। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্তেও একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু সম্পন্ন হয়। যেমন, দিনাজপুর একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শিলং এর উচ্চতা বেশী হওয়ায় তা দিনাজপুরের চেয়ে অনেক বেশী বৃষ্টিবহুল ও ঠান্ডা।

*চিত্রটি সূর্যালোকের আপতন সম্পর্কে কি ধারণা দিচ্ছে ?*

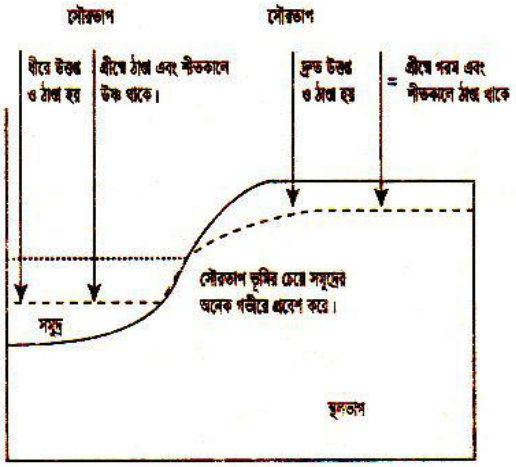


*চিত্র ৩.১৩.৩ : বায়ুর উষ্ণতার ক্ষেত্রে সমুদ্র থেকে দূরত্বের প্রভাব*

**সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from the Sea)**

জলভাগের অবস্থান কোন এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকুলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর বা জামালপুরের তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম এবং দিন রাত্রির তাপমাত্রার তেমন কোন পার্থক্য হয় না।

*শীত-গ্রীষ্ম এবং দিন-রাত্রির তাপমাত্রায় তেমন উল্লেখযোগ্য তারতম্য বিহীন অবস্থাকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।*

এ ধরনের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। সমুদ্র উপকুল থেকে দূরে অবস্থিত রাজশাহী কিংবা বগুড়ায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ অনেক ধীরে উত্তপ্ত হয়। কারণ, প্রথমত, পানির আপেক্ষিক তাপ ধারন ক্ষমতা বেশী। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তার সমপরিমাণ মাটি উত্তপ্ত হতে এর চেয়ে কম তাপের প্রয়োজন হয় (চিত্র ৩.১৩.৩)।

দ্বিতীয়তঃ সৌরতাপ ভূমির চেয়ে অনেক গভীরে প্রবেশ করায় তাপ বিস্তৃত জায়গায় ছড়ায়। ফলে, সমুদ্র উত্তপ্ত হতে অনেক সময় লাগে। আবার, সমুদ্র ভূমির তুলনায় আস্তে আস্তে পুন:বিকিরনের মাধ্যমে তাপমাত্রা হারায়, তাই ঠান্ডা হতেও অনেক সময় নেয়। মোটকথা, ভূমির ন্যায় সমুদ্রের তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন হয় না। তাই, গ্রীষ্মকালে উপকূলীয় এলাকা ভূ-ভাগের অভ্যন্তর এলাকার তুলনায় শীতল এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে।

*জলবায়ুর উপর সমুদ্র দুরত্বের ভূমিকা কি?*

## বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement)

বায়ুপ্রবাহ কোন জায়গায় জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, ভূ-ভাগ থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ুপ্রবাহের কারনে উচ্চ-অক্ষাংশে শীতকালীন তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সমুদ্র থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ু শীতকালীন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায়। তাছাড়া, জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু কোন এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন, বাংলাদেশে বর্ষাকালে সামুদ্রিক মৌসুমি বায়ুর কারনে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে, শীতকালে মহাদেশীয় বায়ুর কারনে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

উচ্চ অক্ষাংশে শীতকালীন তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

## সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রস্রোত জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। কারণ, এটি বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে, শীতল ও উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু শীতল বা উষ্ণ হয়।

সমুদ্রস্রোত বায়ুর তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শীতকালে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে। শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার পূর্ব-উপকূল ও পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলের তাপমাত্রায় ব্যাপক তারতম্য বিদ্যমান। একই অক্ষাংশে অবস্থিত কানাডার নাইনে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২১° সেলসিয়াসের নিচে অথচ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৩.৯° সেলসিয়াসের ওপরে থাকে (চিত্র ৩.১৩.৪)।

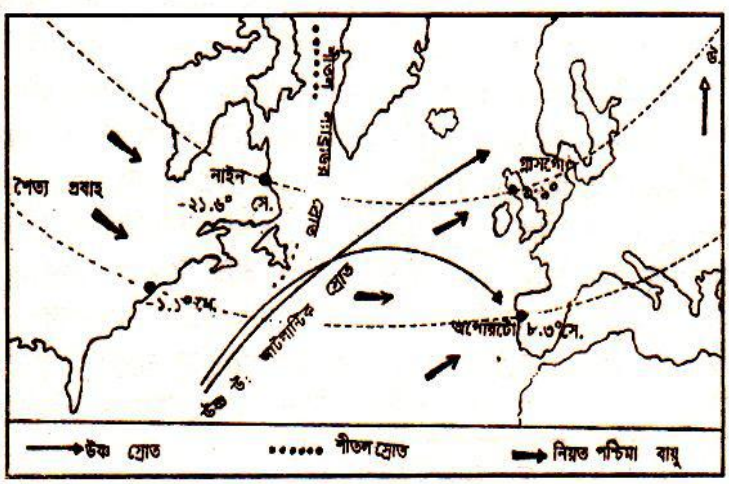


চিত্র : ৩.১৩.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সমুদ্র স্রোতের প্রভাব

## ভূমি ঢালের অবস্থান (Aspects of Land Slope)

*কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি।*

কোনো এলাকার ভূমি ঢালের অবস্থান সূর্যালোক প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন, উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির উত্তরে দক্ষিনমূখী ঢাল সব সময় দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক পায়। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির দক্ষিনে উত্তরমূখী ঢাল সব সময় দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক পায়। নিরক্ষরেখা এবং কর্কটক্রান্তির মাঝে দক্ষিনমূখী ঢাল বিশিষ্ট এলাকাসমূহ উত্তরমূখী এলাকার চেয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী দ্বিপ্রহরের আলো পায়। একই ভাবে নিরক্ষরেখা এবং মকরক্রান্তির মাঝে উত্তরমূখী ঢাল বেশি সময়ব্যাপী সূর্যালোক পায়।

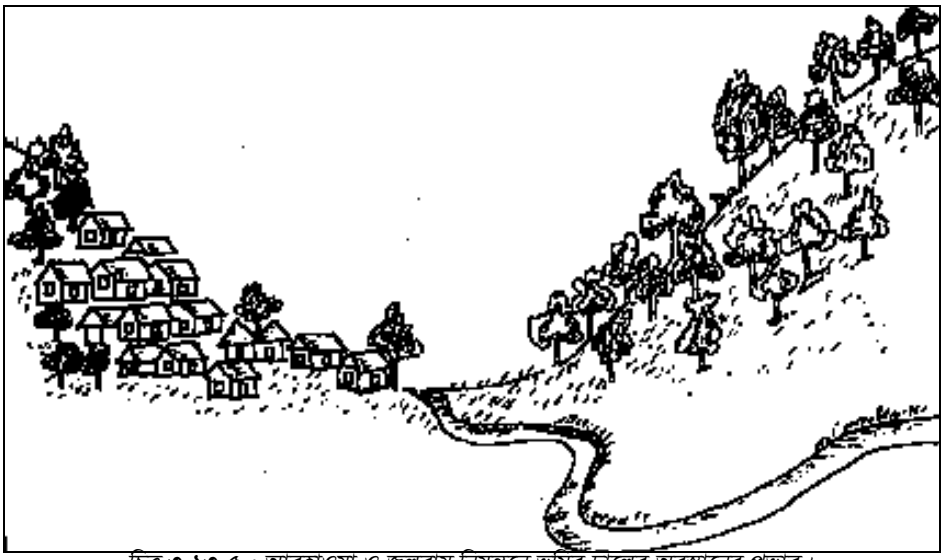

*চিত্র ৩.১৩.৫ : আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রনে ভূমির ঢালের অবস্থানের প্রভাব।*

সূর্যালোক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমির ঢালের অবস্থানের বিষয়টি চিত্র ৩.১৩.৫ এ দেখানো হয়েছে। উত্তর গোলার্ধের একটি পাহাড়ী এলাকার সূর্যালোক প্রাপ্তির সুবিধার জন্য সমস্ত ঘরবাড়ী দক্ষিণমূখী ঢালের পাদদেশে গড়ে উঠেছে।

*পর্বতে বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়।*

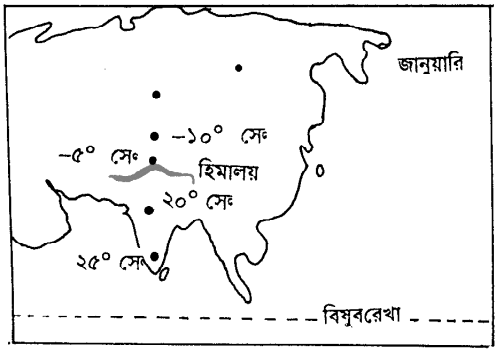


চিত্র ৯.৬ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব।

## ভূ-প্রকৃতি (Distance from the Sea)

উচ্চ পার্বত্যময় এলাকায় বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে তার প্রভাব জলবায়ুর ওপর পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হিমালয় পর্বতের অবস্থানের কারনে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু এ বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে

না পারায় উত্তর ঢালে এই সময় বৃষ্টিপাত তেমন হয় না বললেই চলে। আবার শীতকালে শীতল সাইবেরীয় বায়ু উচ্চ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে না পারায় হিমালয়ের দক্ষিণে ইউরোপের চেয়ে শীতের তীব্রতা অনেক কম (চিত্র- ৩.১৩.৬)।

*সাইবেরীয় বায়ু হিমালয় পর্বত।*

শীতল সাইবেরীয় বায়ুর প্রভাবে হিমালয়ের উত্তরাংশের চীন ভূখন্ডে উষ্ণতা -১০° সেলসিয়াস থেকে -৫° সেলসিয়াস এবং এর দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশে ২০° সেলসিয়াস থেকে ২৫° সেলসিয়াস। হিমালয় পর্বতের অবস্থানই এ তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য দায়ী।

*হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রন করে?*

### বনভূমির অবস্থান

গাছপালা বাস্পীভবন প্রস্বেদনের (Evapo-transpiration) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাস্পপূর্ণ হয় এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং স্থানীয় আবহাওয়া শীতল রাখে। তাছাড়া, বনভূমি, ঝড়-তুফান, সাইক্লোন এর গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। ভূ-আচ্ছাদন বিহীন এলাকা দিনের সূর্যতাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং তাপ বিকিরণের কারণে আবার দ্রুত শীতল হয়ে যায়। মরুময় এলাকায় এই ধরনের অবস্থা হয়।

*বাস্পীভবন, প্রস্বেদন।*

### স্থলভাগ ও জলভাগের বন্টন (Distribution of Land and Watermass)

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশ জলভাগ এবং বাকী ২৯ শতাংশ স্থলভাগে গঠিত। জল ও স্থলভাগের এ অসম বন্টন ও এদের ভৌত গুনাবলীর বিভিন্নতা আবহাওয়ার উপাদানগত তারতম্যে প্রভাব বিস্তার করে।

*'৭১ শতাংশ জলভাগ এবং ২৯ শতাংশ স্থলভাগ।*

ক. জলের চেয়ে স্থলের আপেক্ষিক তাপ (Specific heat) কম হওয়ায় স্থলভাগ, জলভাগের তুলনায় দ্রুত উত্তপ্ত ও শীতল হয়।

খ. জলভাগের প্রধান অংশ সমুদ্র গঠিত। সমুদ্রের পানি স্রোতে জোয়ার-ভাটা এবং ঢেউ এর মাধ্যমে অনবরত স্থানান্তরিত হয়। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্তাপ ও পুনঃবন্টিত হয়।

গ. জলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৭০-৯০ শতাংশই বাস্পীভবন (Evaporation) এর কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই তুলনায় স্থলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৫.৫ শতাংশ মাত্র বাস্পীভবনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশ ভূমি ও এর উপরস্থ বায়ুমন্ডলের উত্তাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারনে স্থলভাগ তুলনামূলকভাবে জলভাগের চেয়ে দ্রুত উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া জলভাগের তুলনায় স্থলভাগে অধিকহারে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনের (Retlectivity) কারণেও এর উপরস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত দ্রুত উত্তপ্ত হয়। জল ও স্থলভাগের এই সমস্ত ভৌত গুনাবলীর তারতম্যের কারণে জলভাগের আবহাওয়া স্থলভাগের তুলনায় মৃদুভাবাপন্ন। শীতকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল থাকে এবং গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ বেশি গরম থাকে।

*সূর্যরাশ্মির প্রাতফলন, ভৌত গুণাবলী।*

*স্থল ও জলভাগের বন্টন আবহাওয়ার উপাদানগত তারতম্য কি প্রভাব রাখে ?*

### নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়সমূহ (Low and High Pressure Belts)

নিম্নচাপ বলয়ের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় উচ্চচাপ বিশিষ্ট শীতল অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল অঞ্চলের ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহের কারণে নিম্নচাপ বিশিষ্ট উষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এভাবে তাপমাত্রা বন্টন ও জলবায়ুর ক্রমাবর্তন হয়।

*তাপমাত্রার বন্টন ও জলবায়ুর ক্রমবর্তন।*

## পাঠ সংক্ষেপ

আবহাওয়া উপাদান সমূহ অনেকগুলো ভূ-প্রাকৃতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. অক্ষাংশ ভিত্তিক সূর্যালোকের আপতন মাত্রা ও দিবা ভাগের স্থায়িত্ব
২. স্থল ভাগ ও জলভাগের বন্টন
৩. বায়ুপ্রবাহ
৪. উচ্চতা
৫. ভূ-প্রকৃতি
৬. ভূমির ঢাল
৭. আধা স্থায়ী নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়সমূহ
৮. সমুদ্রস্রোত
৯. বনভূমির অবস্থান
১০. সমুদ্র থেকে দূরত্ব।

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশ জলভাগ এবং বাকী ২৯ শতাংশ স্থলভাগে গঠিত। জল ও স্থলভাগের এ অসম বন্টন ও এদের ভৌত গুনাবলীর বিভিন্নতা আবহাওয়ার উপাদানগত তারতম্যে প্রভাব বিস্তার করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৩

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **'হ্যাঁ' অথবা 'না' উত্তর দিন–** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ সূর্যের কিরণমাত্রা অক্ষাংশ ভেদে একই হয়।

১.২ ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্র সমতল থেকে কত উঁচু তা ঐ এলাকায় তাপ, চাপ ও আর্দ্রতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১.৩ জলভাগের অবস্থান কোন এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে।

১.৪. বায়ুপ্রবাহ কোন জায়গায় জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না।

১.৫ স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত ২৯ঃ৭১।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২X ৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক সমূহ কি কি?

২. জলবায়ুর উপর সমুদ্র দূরত্বের ভূমিকা কি?

৩. হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রন করে?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক ও তাদের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

# পাঠ ৩.১৪ : সৌরশক্তি (Insolation)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন -

- ◈ সৌরশক্তি কি এবং তা কিরূপে পৃথিবীতে এসে পৌছায়;
- ◈ বায়ুমন্ডলে কিভাবে সৌরশক্তি গৃহীত হয়;
- ◈ পৃথিবীর বিকিরণ তাপের হিসাব সম্পর্কে।

## সৌরশক্তি (Insolation)

*বায়ু, বারি ও জৈবমন্ডলের যাবতয়ি চক্র সৌরশক্তির উপর নির্ভরশীল।*

বিকিরিত সূর্যশক্তি যা কোন উন্মুক্ত তলে গৃহীত হয় তাকে সৌরশক্তি (Insolation) বলে। সূর্য থেকে তরঙ্গাকারে বিপুল শক্তি পৃথিবীতে আসে। সূর্যের দুই বিলিয়ন ভাগের একভাগ শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে আসতে পারে। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস। সৌরশক্তি প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে আসে। সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতন স্থানের পরিমাপকে বলা হয় সৌর ধ্রুব (Solar Constant)।

বায়ুমন্ডলের ওপরে এর মান ১৪০০ ওয়াট/বর্গমিটার, কিন্তু বায়ুমন্ডল ভেদ করে আসার ফলে এর তীব্রতা হ্রাস পেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে দাঁড়ায় ৪০০ থেকে ৮০০ ওয়াট/বর্গমিটার। আপতিত রশ্মির এই বিপুল হ্রাসকৃত শক্তির কিছু অংশ মহাবিশ্বে পরিত্যক্ত হয়, কিছু বায়ুস্তরগুলো শোষণ করে। শোষণ/গ্রহণের ফলে বায়ুস্তরে শক্তি সঞ্চিত হয়। বায়ুস্থ জলকণা ও অন্যান্য দ্রব্য শোষিত শক্তির ফলে তাপশক্তি বা গতিশক্তি লাভ করে। বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও জৈব অস্তিত্ব রক্ষায় সৌরশক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য।

*সৌরশক্তি কি?*

সূর্যশক্তি তরঙ্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্র ৩.১৪.১-এ বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণ শক্তি দেখানো হলো।

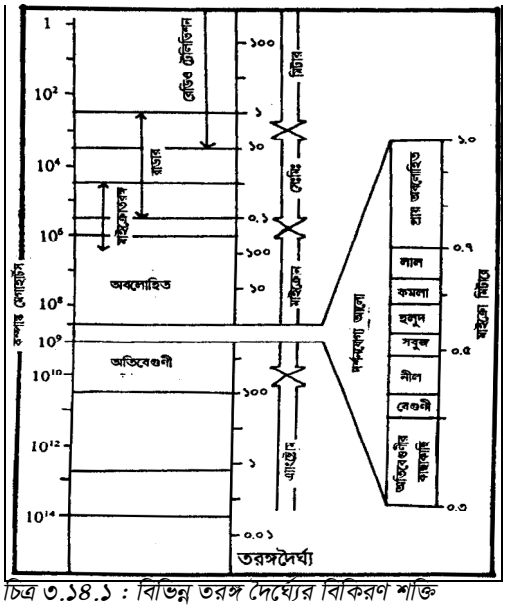


*চিত্র ৩.১৪.১ : বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শক্তি*

সৌরশক্তির গ্রহনমাত্রা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভও করে:

১. সূর্যরশ্মি যে কৌনিক অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হয় এবং
২. উন্মুক্ত তলে কত সময় ব্যাপী সূর্যরশ্মি পতিত হয় তার ওপর।

## সৌরশক্তি ও বায়ুমন্ডল (Insolation and Atmosphere)

সৌরশক্তি ও বায়ুমন্ডল সম্পর্কে আলোচনা করার তিনটি পর্যায় অনুসরণ করা যেতে পারে:

ক. বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তি ক্ষয়
খ. তাপের হিসাব
গ. বিকিরণ সমতা।

### ক. বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তি ক্ষয় (Insolation loss in the Atmosphere)

বায়ুমন্ডলে আগত সৌরশক্তি বিবিধ ভাবে শোষিত হয়।

- ১৫০ কি.মি. উচ্চতায় সৌরশক্তি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।
- ৮৮ কি. মি. উচ্চতায় রঞ্জনরশ্মি (X-Ray) প্রায় সবটাই শোষিত হয় এবং সেই সাথে কিছু অতি বেগুনী রশ্মিও শোষিত হয়।
- আরো নিচে প্রবেশ করলে স্ট্রাটোমন্ডলের ওজোনস্তর অতিবেগুনী রশ্মির পুরোটাই শোষন করে।
- বিকিরণ রশ্মি আরো নিচে ঘণবায়ুতে প্রবেশ করলে গ্যাসের অণু দর্শনযোগ্য আলোকরশ্মিকে সম্ভব সকল কৌণিক দিকে বিচ্ছুরণ ঘটায় এ পদ্ধতির নাম হচ্ছে বিচ্ছুরণ (Scattering)।
- ধূলিকণাগুলি ট্রপোমন্ডলে আরেকবার বিচ্ছুরণ ঘটায়; এ ধরনের বিচ্ছুরণকে বলে ডিফিউজ প্রতিফলন (Diffuse reflection)।
- বিচ্ছুরন ও ডিফিউজ প্রতিফলনের ফলে কিছু শক্তি মহাবিশ্বে পরিত্যাক্ত ও কিছু ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হয়।

*১৫০ কিলোমিটার উচ্চতা,৮৮ কিলোমিটার উচ্চতা, অতি বেগুনী রশ্মি, কৌণিক দিকে বিচ্ছুরণ, ডিফিউজ প্রতিফলন, শক্তি, শোষণ প্রক্রিয়া।*

- শোষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাস্প সরাসরি সূর্যের অবহেলিত রশ্মি সমূহ শোষণ করতে পারে। শোষনের ফলে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কার্বন ডাই অক্সাউডের পরিমাণ বাতাসে মোটামুটি সব স্থানে সমবিন্যাস হলেও জলীয়বাস্পের ঘনত্বও বিন্যাস সমবিন্যস্ত নয় বলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শোষিত তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। মেঘের উপরিতল পতিত কিছু ক্ষুদ্র তরঙ্গ রশ্মিকে প্রতিফিলিত করে মহাশূন্যে ফেরত পাঠায়। কোনো তলে বিকিরিত রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাওয়াকে আলবেডো (Albedo) বলে।

*কিভাবে বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তি শোষিত হয়? (Albedo) কাকে বলে?*

## খ. তাপের হিসাব (Heat Budget)

*জলীয় বাস্প, ধূলিকণা ও মেঘের পরিমাণ দ্বারা বায়ুমন্ডলের তাপ শোষণ মাত্রা নির্ভর করে।*

বায়ুমন্ডলে শোষিত তাপের পরিমাণ নির্ভর করে জলীয়বাস্প, ধূলিকণা ও মেঘের উপস্থিতি মাত্রার উপর।

- পরিষ্কার শুষ্ক ও আর্দ্রতাহীন বায়ু মাত্র ১০ শতাংশ বিকিরিণ শক্তি শোষণ করে।
- মেঘাচ্ছন্ন বাতাসে শোষণের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ;
- মেঘমুক্ত আকাশে, বায়ুর শোষণ ও গ্যাসীয় কণার প্রতিফলনে শোষিত শক্তির পরিমাণ ২০ শতাংশ, বাকী ৮০ ভাগ শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হয়।
- মেঘ স্তর আগত রশ্মির ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ মহাশূণ্যে ফেরত পাঠায় যা (Cloud reflection) নামে অভিহিত। মেঘ নিজেও শক্তি শোষণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মেঘের কার্যক্রম প্রায় ৩৫ থেকে ৮০ শতাংশ সৌর শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে এবং এর মাত্র ০-৪৫ ভাগ পৃথিবীতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।

*২১ ভাগ সৌরশক্তি মহাবিশ্বে ফিরে যায় ও ৩ শতাংশের মত শোষিত হয়।*

বিশ্বব্যাপী মেঘের প্রতিফলনে ২১ ভাগ সৌরশক্তি মহাবিশ্বে ফিরে যায়, আর ৩ শতাংশের মত শোষিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের স্থল ও জলভাগ কিছু শক্তিকে প্রতিফলিত করে শূন্যে পাঠায়, পৃথিবীর গড় হিসাবে যা মাত্র ৪ শতাংশ, এটি মেঘ প্রতিফলনের সাথে যুক্ত হয়ে মহাবিশ্বে ফিরে যায়। সমস্ত সৌরশক্তির পরিমাপে প্রতিফলন ও শোষণের ফলে আটকা পড়ে যায় ৩১ শতাংশ শক্তি। সারণি ৩.১৪.১-এ সৌরশক্তির মোট হিসাব উল্লেখ করা হলো। কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ননের সাথে এ মানগুলো পরিমাপ করা হয় বলে ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষনে পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তবে এ ব্যবধান কম।

*তাপশক্তি বিকিরণের শতকরা হার কত ?*

*সারণি ৩.১৪.১ : পৃথিবীর বিকিরণ হিসাব।*

| আগত সৌরশক্তি | শতকরা হার |
|---|---|
| বায়ুমন্ডলের উপর তলে | ১০০ |
| বিচ্ছুরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে প্রতিফলন | ৬ |
| মেঘের সাহায্যে মহাবিশ্বে প্রতিফলন | ২১ |

| | |
|---|---|
| ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সরাসরি প্রতিফলন | ৪ |
| Albedo র মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে মহাবিশ্বে ফেরত যায় | ৩১ |
| মৌলকণা (অণু), ধুলি, জলীয়বাস্প, কার্বন ডাই অক্সাইড ও মেঘে শোষিত হয় | ২১ |
| ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত হয় | ৪৮ |
| বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠে মোট শোষিত শক্তি | ৬৯ |
| শোষণ ও বিকিরণের ফলে মোট শক্তি | ১০০ |

পৃথিবীর গড় আলবেডো হচ্ছে ২৯ থেকে ৩৪ শতাংশ।

### গ. বিকিরণ সমতা (Radiation Balance)

বিকিরণ হচ্ছে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির চলন। অধিক তাপমাত্রায় বিকিরিত রশ্মির তড়ঙ্গ দৈর্ঘ্য হয় ক্ষুদ্র, অল্প তাপমাত্রায় বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয় দীর্ঘ। এভাবে সূর্যের তাপমাত্রা (৬০০০° সেঃ) বেশী হওয়ায় সূর্যের বিকিরণে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (Short Wave Radiation) শক্তি বিকিরণ, অন্যদিকে পৃথিবীর (১৫° সেঃ) বিকিরণের শক্তি সমূহ দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (Long wave radiation) বিকিরণ। সূর্য থেকে আগত মোট শক্তি ও পৃথিবীর মোট বিকিরণের মধ্যে সমতা আছে বলেই বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার বড় ধরনের পরিবর্তন হয় না, নতুবা অতি উষ্ণতা বা অতি শীতলতার ফলে জীবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।

*সূর্য থেকে আগত মোট শক্তি ও পৃথিবীর মোট বিকিরণের মধ্যে সমতা বিরাজ করে।*

দীর্ঘ তরঙ্গের যে বিকিরণ পৃথিবী থেকে নির্গত হয় তার ৯৮ শতাংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এর মধ্যে ৭ ভাগ সরাসরি বায়ুমন্ডলীয় অথবা বিকিরণ বাতায়ন (Radiation Window) দিয়ে মহাবিশ্বে চলে যায়। কারন, এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৮.৫ থেকে ১১ মাইক্রোন হওয়ায় বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় অণু এসব বিকিরণ শোষণে অক্ষম। বাকী ৯১ শতাংশ মেঘ ও বায়ু মন্ডলের অন্যান্য দ্রব্য শোষণ করে। পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চলে বাস্পীয়প্রস্বেদনে প্রায় ২২ শতাংশ তাপশক্তি পুনঃচক্রায়িত (Recycled) হয়। শতকরা ৫ ভাগ চক্রায়িত হয় পরিবহন (Conduction) ও পরিচলন (Covection) প্রক্রিয়ায়। বায়ুমন্ডলে আরো ১৫ শতাংশ শক্তি সরাসরি সূর্যালোকের ক্ষুদ্র তরঙ্গ রশ্মি দ্বারা শোষিত হয় এবং ২ শতাংশ হয় ওজোন স্তর দ্বারা। এদের মোট পরিমাণ বায়ুমন্ডলে ১৩৫ শতাংশ। মোট এ পরিমাণ থেকে ৫৭ শতাংশ মহাবিশ্বে বিকিরণ হয় বাকী ৭৮ শতাংশ আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে ও পুনঃচক্রায়িত হয়। পুনঃচক্রের তারতম্য হলে পৃথিবী উষ্ণতার তারতম্য হয়। সারণি ৩.১৪.২-এ বহিঃগমনে দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ সমতা দেখানো হলো -

*পরিবহন ও পরিচলন প্রক্রিয়া।*

*বিকিরণ সমতা বলতে কি বুঝায়?*

*সারণি ৩.১৪.২ : পৃথিবীর বিকিরণ সমতা*

| বহি:গমন, দীর্ঘতরঙ্গ বিকিরণ | শতকরা হার |
|---|---|
| ভূ-পৃষ্ঠে বিকিরণ সমতা<br>সরাসরি মহাবিশ্বে পরিত্যক্ত | ৬ |

| | |
|---|---|
| বায়ুমন্ডলে ক্ষয়<br>ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মোট বিকিরণ<br>বায়ুমন্ডল থেকে প্রাপ্ত বিকিরণ শক্তি<br>ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডলে মোট বিকিরণ | ১০৬<br>১১৩<br>৯৭<br>১৬ |
| বায়ুমন্ডলের বিকিরণ শক্তি সমতা<br>ভূ-পৃষ্ঠের বিকিরণে প্রাপ্ত<br>ভূ-পৃষ্ঠে প্রদত্ত বিকিরণ<br>ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সার্বিক প্রাপ্তি | <br>১০৭<br>৯৭<br>১০ |
| সরাসরি ক্ষুদ্রতরঙ্গ বিকিরণ থেকে গৃহীত<br>তাপের প্রচ্ছন্ন পরিবর্তনে প্রাপ্তি<br>তাপের যান্ত্রিক পরিবর্তনে (Latent heat Transfer) প্রাপ্তি | ২১<br>২২<br>১০ |
| সার্বিক প্রাপ্তি<br>বায়ুমন্ডল থেকে মহাবিশ্বে পরিত্যক্ত<br>ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মহাবিশ্বে সরাসরি গমন<br>পৃথিবী থেকে মহাবিশ্বে বিকিরণ | ৬৩<br>৬৩<br>৬<br>৬৯ |

*উৎস: রফিক মো:*

সৌরশক্তি বন্টন পৃথিবীতে সমানভাবে হয় না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপ বর্জনের চেয়ে গ্রহণ মাত্রা বেশী, অন্যদিকে মেরু এলাকায় তাপ শোষণের চেয়ে হারানোর মাত্রা বেশী। পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত সৌরশক্তির এই অসমবন্টনে সমতা আনার চেষ্টা করে।

## পাঠ সংক্ষেপ

সূর্যশক্তি তরঙ্গাকারে পৃথিবীতে আসে। সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতন স্থানের পরিমাপকে সৌর ধ্রুব বলে। সৌর ধ্রুবের মান সমুদ্র পৃষ্টে ৪০০-৮০০ ওয়াট/বর্গ মিটার। তবে বায়ুমন্ডলের উপরিভাগ এই মান ১৪০০ ওয়াট/বর্গমিটার। বায়ুমন্ডলে আগত রশ্মি বিভিন্নভাবে শোষিত হয়। বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাস্প সূর্যের অবলোহিত রশ্মি শোষণ করায় বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সৌরশক্তির বন্টন পৃথিবীতে সমানভাবে হয় না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপ বর্জনের চেয়ে গ্রহন মাত্রা বেশী, অন্যদিকে মেরু এলাকায় তাপ শোষনের চেয়ে হারানোর মাত্রা বেশী। বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোত তাপের অসমবন্টনে সমতা আনতে সহায়তা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৪

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ১০ মিনিট) ঃ

১.১ সূর্য পৃষ্টের তাপমাত্রা প্রায় -
ক. ৬০০০° সেঃ
খ. ৭০০০° সেঃ
গ. ৫০০০° সেঃ
ঘ. ৬৫০০° সেঃ

১.২ গামারশ্মি তরঙ্গদৈর্ঘ্য দর্শনযোগ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় -
ক. অনেক বড়
খ. অনেক ছোট
গ. সমান
ঘ. অতুলনীয়

১.৩ পৃথিবীর গড় আলবেডো মাত্রা শতকরা -
ক. ১৫-২৭
খ. ২০-৩০
গ. ২৯-৩৪
ঘ. ৩৩-৩৮

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ৬ মিনিট) ঃ

১. সৌরশক্তি কি?
২. কিভাবে বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তি শোষিত হয়? আলবেডো কাকে বলে?
৩. বিকিরণ সমতা বলতে কি বুঝায়?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. সৌরশক্তি কাকে বলে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির বিভিন্ন রূপ কি কি?
২. কিভাবে বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তি শোষিত হয়? বায়ুমন্ডলে শোষিত তাপের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে? পৃথিবীর বিকিরণ হিসাব ও তাপশক্তির শতকরা হার কত?
৩. বিকিরণ সমতা বলতে কি বুঝায়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.১৫ : সৌরশক্তি ঃ বায়ুমন্ডলের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া সমূহ
## (Atmospheric Heating Processes)

এ পাঠ শেষে যা জানতে পারবেন -

- ◈ বায়ুমন্ডলের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া;
- ◈ বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ;
- ◈ আগত তাপ ও তার পরিমাণ;
- ◈ পৃথিবীর বিকিরন সমতা কেমন।

অনেকগুলি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে বায়ুমন্ডলকে শীতল বা উষ্ণ করে থাকে। এসব প্রক্রিয়া গুলো নিম্নরূপ:

১. বিকিরণ (Radiation)
২. পরিবহন (Conduction)
৩. বাস্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration)
৪. পরিচলন (Convection)
৫. অনুভূমিক পরিচলন (Advection)
৬. রূদ্ধতাপীয় শীতলক্রিয়া (Adiabatic Cooling)
৭. সংকোচন (Compression)

### বিকিরণ (Radiation)

*শক্তি স্থানান্তরিত হয়।*

তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া একবস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ স্থানান্তরে শক্তি ও স্থানান্তরিত হয় (তাপ ও আলো হিসাবে)। সৌরশক্তি বিকিরণ পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডলে আসে। বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গের কিছু রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে। ভূ-পৃষ্ঠ এসব তরঙ্গকে শোষণ করে দীর্ঘ তরঙ্গ শক্তিতে পরিণত করে, যা সহজেই বায়ুমন্ডলের জলীয় বাস্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা শোষিত হয়। বায়ুর এ শোষিত তাপের উপর কিছু অংশ পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে আর কিছু মহাকাশে ফিরে যায়। বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের এ তাপ বিনিময় প্রক্রিয়া বিরামহীন ভাবে চলতে থাকে। বায়ুস্থ জলীয়বাস্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড তাপ আচ্ছাদন হিসাবে কাজ করে। জলীয়বাস্পের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মহাকাশে তাপের গমন হ্রাস পায়। এজন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও মেঘমুক্ত হলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। বায়ুমন্ডলের তাপ আচ্ছাদন কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয়বাস্পের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রীনহাউস প্রভাব (Green House Effect) তৈরী করে। শীতপ্রধান দেশ ও মেরুঅঞ্চলে তুষারপাত থেকে রক্ষা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাঁচের বড় বড় ঘর তৈরী করে চাষাবাদ করা হয়। এ সমস্ত ঘরের কাঁচ ভেদ করে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গের রশ্মি বের হতে পারে না। ফলে ঘরের ভেতরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর জলবায়ুগত পরিবর্তনে সমগ্র পৃথিবী একটা গ্রীনহাউস হয়ে গেলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

*পুন: বিকিরণ, তাপ বিনিময়, ক্ষুদ্রতরঙ্গের আলোকরশ্মি, দীর্ঘ তরঙ্গের আলোকরশ্মি।*

### পরিবহন (Conduction)

দুটি অসম উষ্ণতার বস্তু যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে যখন আণবিক ক্রিয়ায় পদার্থের মাধ্যমে তাপ পরিবাহিত হয়। অণুসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে অণু-শক্তি বেশী উষ্ণতা থেকে কম

উষ্ণতার দিকে সমতা না আসা পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। বিকিরণ তাপে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলে সন্নিকটবর্তী বায়ুস্তর ও পরিচলন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয়। বায়ুর তাপ পরিবাহিতা কম বলে নিচের স্তরই শুধু পরিবহন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয়।

*আনবিক ক্রিয়া, তাপ পরিবাহিতা।*

**বাস্পীয়-প্রস্বেদন** (Eva potranspiration)

বাস্পীভবনের জন্য পানি কিছু সুপ্ত বা লীনতাপ গ্রহন করে। এই প্রচ্ছন্ন তাপে (Latent Heat) বায়ুমন্ডলেও প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ থেকে বাস্পীয়-প্রস্বেদনের ফলে বায়ুমন্ডলে তাপের এ স্থানান্তর হয়। সাধারনত: একগ্রাম পানিকে বাস্পে পরিণত করতে ৫৯০ ক্যালরী তাপের প্রয়োজন হয়। অবস্থার পরিবর্তন হলে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন তাপ পরিত্যাগের মাধ্যমে বাস্প ঘনীভূত (Condensation) হয়ে বারিপাত হয়, এ সুপ্ততাপ তখন বায়ুমন্ডলে অবমুক্ত হয়।

*সুপ্ত বা লীন তাপ, প্রচ্ছন্ন তাপ।*

**পরিচলন** (Convection)

পদার্থের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কণাগুলো শীতল অংশে স্থানান্তরিত হয়ে তাপের যে সঞ্চালন করে তাকে পরিচলন প্রক্রিয়া বলে; তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। কোনো স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অথবা তাপ শোষণের ফলে বায়ু উত্তপ্ত হলে তা সম্প্রসারিত ও কম ঘনত্বের হয়। এ অবস্থায় হালকা বায়ু উপরে উঠে যায় এবং পার্শ্ববর্তী ভারী ও শীতল বায়ু এ খালি জায়গা দখল করে। এভাবে তাপ বায়ু মন্ডলের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে সঞ্চালিত হয়।

*তাপ সঞ্চালন, তাপ শোষণে বায়ু সম্প্রসারিত হয়।*

**অনুভূমিক পরিচলন** (Advection)

পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপের অনুভূমিক স্থানান্তরকে অনুভূমিক পরিচলন বা Advection বলে। বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তাপ মেরু এলাকা থেকে নিরক্ষীয় এলাকায় পুনঃবন্টিত হয়। অনুভূমিক পরিচলন স্থানীয় বা অনেক বিস্তৃত অঞ্চলেও সংঘটিত হয়।

*স্থানীয় এবং বিস্তৃত অঞ্চলে সংঘটিত হয়।*

*কিভাবে বায়ুমন্ডল উষ্ণ হয়?*

**রূদ্ধতাপীয় শীতলক্রিয়া** (Adiabatic Cooling)

পরিচলন পক্রিয়ায় তাপীয় সঞ্চালনে বায়ুর উচ্চমূখী গমনের ফলে রূদ্ধতাপীয় শীতলক্রিয়া সাধিত হয়। সরাসরি সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত সূর্যশক্তি গ্রহণ করে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে। সম ঘনত্বের ও অবস্থার বায়ুস্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই উর্ধ্ব গমন অব্যাহত থাকে। উর্ধ্বমুখী গতিতে এর তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে থাকে, তাপমাত্রা হ্রাসের হার ৩০০ মিটারে ২.৬° সেঃ, এই মানকে বলা হয় শুষ্ক রূদ্ধতাপীয় অবনতি হার (Dry Adiabatic Lapse-rate)। ক্রান্তিয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে এই পদ্ধতিতে বেশী তাপ সঞ্চালিত হয়। শিশিরাংক (Dew point) এর নীচে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাসে রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তনই একমাত্র পদ্ধতি। বজ্রপাতের ধরন এই রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তন পক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। মেঘ ঘনীভূত হয়ে বারিপাত হতে রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অবদানই মুখ্য।

*উর্ধ্ব গমন, তাপমাত্রা হ্রাসের হার ৩০০ মিটারে ২.৬° সেঃ।*

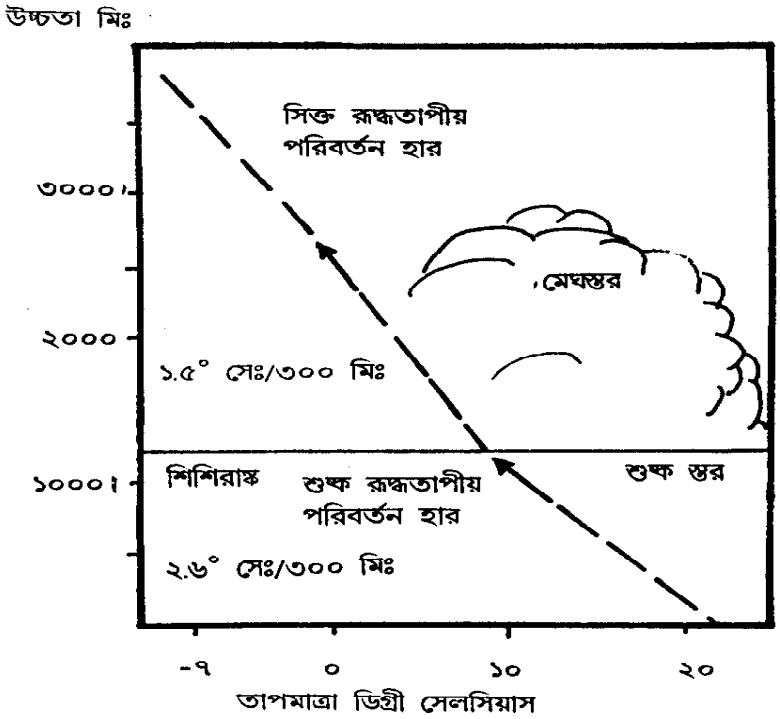


চিত্র ৩.১৫.১ : *রূদ্ধতাপীয় অবনতী হার। উর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহে শুষ্ক বায়ুর তাপমাত্রা প্রতি ৩০০ মিটারে ২.৬° সেলসিয়াস হ্রাস পায়, কিন্তু আর্দ্রবায়ুর তাপ হ্রাসের হার প্রতি ৩০০ মিটারে ১.৫° সেলসিয়াস।*

**সংকোচন (Compression)**

নিম্নগামী বায়ু উপরের বায়ুস্তরের চাপে সংকুচিত হয় ফলে বায়ুর কণা (অণু) গুলো উচ্চচাপে পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হয়, যার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটে।

## পাঠ সংক্ষেপ

অনেকগুলি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে বায়ুমন্ডলকে শীতল বা উষ্ণ করে থাকে। এসব প্রক্রিয়া গুলো নিম্নরূপ:

১. বিকিরণ (Radiation)
২. পরিবহন (Conduction)
৩. বাস্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration)
৪. পরিচলন (Convection)
৫. অনুভূমিক পরিচলন (Advection)
৬. রূদ্ধতাপীয় শীতলক্রিয়া (Adiabatic Cooling)
৭. সংকোচন (Compression)।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৫

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন–** (সময় ২ মিনিট) ঃ

১.১ বাস্পীভবনের লীনতাপ --------- ক্যালরি।

১.২ শুষ্ক রূদ্ধতাপীয় শীতলতার হার প্রতি ৩০০ মিটারে ------ সে.।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১. কিভাবে বায়ুমন্ডল উষ্ণ বা শীতল হবার প্রক্রিয়াগুলো কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বায়ুমন্ডলের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.১৬ : তাপমাত্রা ঃ তাপ ও তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রক

(Temperature : Heat and factors effecting Temperature)

এই পাঠে জানা যাবে -

- ◈ তাপশক্তি ও তাপের প্রবাহ;
- ◈ তাপমাত্রা কিভাবে পরিমাপ করা যায়;
- ◈ বিভিন্ন পরিমাপক স্কেল ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক;
- ◈ বায়ুর তাপমাত্রা ও তাপমাত্রা উপাত্তের ব্যবহার;
- ◈ তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রক এবং তাদের কার্যপ্রণালী ও প্রভাব;
- ◈ তাপমাত্রা বিলোমতা কিভাবে বায়ু দূষণে ভূমিকা রাখে।

## তাপ ও তাপমাত্রা (Heat and Temperature)

*তাপ এক প্রকার শক্তি। তাপমাত্রা হচ্ছে কোন বস্তুর তাপের উষ্ণমাত্রা। শক্তি অবিনাশি। তাপ উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে প্রবাহমান।*

তাপ (Heat) হচ্ছে শক্তির একটি রূপ, আর তাপমাত্রা (Temperature) হচ্ছে কোন বস্তুর তাপের তিব্রতা (Intensity) অথবা উষ্ণমাত্রা (Degree of hotness); এক কথায় বলা যায় তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থার নির্দেশক।

পদার্থের আণবিক মতবাদ (Molecular theory of matter) অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুতেই কিছু স্থিতি শক্তি বর্তমান, এ শক্তিকে বলা হয় অভ্যন্তরীন শক্তি (Internal Energy)। তাপমাত্রা তাপের তিব্রতার নির্দেশক এবং অণূস্থ শক্তির বিনিময় মাত্রা নির্ধারন করে। শক্তির প্রবাহ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাদের একক ভরের তাপের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। শক্তি বিনিময় হয় উচ্চ শক্তি থেকে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন বস্তুর দিকে। তাপ-গতিবিদ্যা (Thermo dynamics) তাপের এ বিনিময় নিয়ে বিশদ আলোচনা করে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে যা বায়ুস্থ পদ্ধতি অনুধাবনেও সহায়তা করে। তাপ-গতিবিদ্যার সূত্রানুযায়ী -

১. শক্তির অবিনাশিতা (Conservation of Energy) সূত্র : দুটি বস্তুর মধ্যে তাপ বিনিময়ের ফলে তাদের পারস্পরিক তাপের আদান প্রদান হলেও মোট তাপের কোন পরিবর্তন হয় না।

২. তাপ উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে প্রবাহিত হয়।

আণবিক মতবাদ অনুযায়ী পদার্থের পরমাণুতে কণাসমূহ একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান। কঠিন বস্তুর কেন্দ্র নিজেই স্থিতিশীল, কিন্তু তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় পরমাণু সমূহের কেন্দ্র অস্থির বা চলনক্ষম। গ্যাসীয় পদার্থের প্রতিটি কণা ক্রমাগত ছুটাছুটি করে, গ্যাসীয় পদার্থের এ শক্তিমত্তা হচ্ছে গতিশক্তি (Kinetic Energy)। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে গ্যাসীয় পদার্থের গতিশক্তিরও পরিবর্তন হয়; অন্য কথায় বলা যায় গ্যাসীয় অণুর গতির পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। জলবায়ু নিয়ন্ত্রনে বাতাসের গতিবেগ, তাপ বিনিময় এবং প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

*তাপ ও তাপমাত্রা কি?*

## তাপমাত্রার পরিমাপ (Temperature Measurement)

*থার্মোমিটার।*

তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার (Termometer)। অধিকাংশ বস্তু তাপ বৃদ্ধিতে আয়তনে বেড়ে যায়, আবার শীতল করলে বা তাপ হারালে আয়তন হ্রাস পায়, পদার্থের এ ধর্মের

উপর ভিত্তি করেই থার্মোমিটার প্রস্তুত করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনে যে সমস্ত পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি/হ্রাসের সূস্পষ্ট ব্যবধান হয় থার্মোমিটার প্রস্তুতিতে সেগুলোর সহায়তা গ্রহণ করা হয়। ১৭শ শতকের শেষ ভাগে থার্মোমিটার উদ্ভাবনের পর এর মূল কাঠামোগত তেমন পরিবর্তন হয়নি। থার্মোমিটারের মূল কাঠামো হচ্ছে কাঁচের নলে আবদ্ধ তরল (Liquid in Glass) পারদ বা অ্যালকোহল।

*তরল পারদ বা অ্যালকোহল।*

*থার্মোমিটার কি?*

## পরিমাপের স্কেল (Scale of Measurement)

তাপমাত্রার গুণগত মানকে সংখ্যাতাত্ত্বিক মানে রূপান্তর হচ্ছে তাপমাত্রার স্কেলের উৎকৃষ্ট ব্যবহার। নীচে বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রার স্কেল, প্রস্তাবক, পানির স্ফুটনাঙ্ক ও বরফের গলনাঙ্ক দেখানো হলো। স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্কের মধ্যস্থান সব স্কেলেই তার ব্যবধান অনুযায়ী সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রতি একক বৃদ্ধি হিসাব করা হয়।

*স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্ক।*

*সারণি ৩.১৬.১ : তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক।*

| তাপমাত্রার স্কেল | প্রস্তাবক/উদ্ভাবক | বরফ গলনাঙ্ক | পানির স্ফুটনাঙ্ক | মধ্যবর্তী ভাগ |
|---|---|---|---|---|
| ফারেনহাইট (F) | গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট ১৭১৪, জার্মান | ৩২° | ২১২° | ১৮০° |
| সেলসিয়াস (C) | এনড্রেস সেলসিয়াস ১৭৪২, সুইডেন | ০° | ১০০° | ১০০° |
| কেলভিন (K) / | --- --- --- | ২৭৩° | ৩৭৩° | ১০০° |
| পরম (A) | | | | |

স্কেলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে -

$^{\circ}C/৫ = (^{\circ}F-৩২)/৯ = (^{\circ}K-২৭৩) / ৫$

*তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেলের সম্পর্ক কি?*

## বায়ুর তাপমাত্রা ও তাপমাত্রা উত্তাপের ব্যবহার

(Air Temperature and Application of Temperature Data)

বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। এ পরিমাপ প্রতি ঘন্টায় কিংবা অবিরামভাবে করা হয়। তবে সাধারনত প্রতিদিনের তাপমাত্রার হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিদিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থেকে গড় তাপমাত্রা বের করা হয়। তাপমাত্রার প্রতিদিনের ব্যবধান ও অনেক সময় লিপিবদ্ধ করা হয়।

*মানচিত্রে সমতাপমাত্রার স্থানগুলো যুক্ত করে কোন অংকিত রেখাকে সমোষ্ণ রেখা বলে।*

প্রতিদিনের গড় থেকে মাসিক গড় হিসেব করা হয়, মাসিক গড় থেকে বাৎসরিক গড় পাওয়া যায়। বাৎসরিক চরম ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড় মাসিক তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান থেকে নির্ণয় করা হয়। মানচিত্রে একই মান সম্পন্ন তাপমাত্রা স্থানগুলো দিয়ে অংকিত রেখাকে সমোষ্ণ রেখা (Isotherm) বলে। বৃহৎ এলাকার তাপমাত্রা বিশ্লেষণেও জলবায়ু পর্যবেক্ষণে সমোষ্ণরেখা গুরুত্বপূর্ণ।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ও হ্রাসের দিন, ঋতু পরিবর্তনের সাথে ও দিনের দৈর্ঘ্যের (Daylength) উপর নির্ভর করে। রৌদ্রজ্জল দিনের উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা বেশী বা কম হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফল উৎপাদন ইত্যাদি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া/জলবায়ু উদ্ভিদের ধরণের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে তাপমাত্রা উপাত্ত ব্যবহার করে জলবায়ু অনুধাবন ও উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদন তরান্বিত করা যায়।

*বায়ুর তাপমাত্রা উপাত্তের ব্যবহার কি?*

**তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রক (**Controls of Temperature**)**

তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সেই সব নিয়ামক যাদের উপর ভিত্তি করে এক অবস্থান থেকে অন্য স্থানের তাপমাত্রা ভিন্ন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন মাত্রায় সূর্যালোক পেয়ে থাকে, অক্ষাংশভেদে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। কোন স্থানের তাপমাত্রা যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা নিম্নরূপ:

*স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা দ্রুত শীতল বা উষ্ণ হয়।*

১. স্থল এবং জলভাগের ভিন্ন ধর্মী তাপ গ্রহণ (Differential heating of land and water);

২. সমুদ্র স্রোত (Ocean Currents);

৩. উচ্চতা (Altitude);

৪. ভৌগোলিক অবস্থান (Geographic Location)।

**স্থল বা জলভাগের ভিন্নধর্মী তাপ গ্রহণ (**Differential heating of land and water**)**

স্থল ও জলভাগের তাপ গ্রহণের তারতম্যের জন্য যে সব কারণ দায়ী তা নিম্নরূপ:

- জলভাগ স্বচ্ছ, ফলে বিকিরণ রশ্মি অনেক গভীরে প্রবেশ করে; স্থলভাগ অস্বচ্ছ বলে বিকিরণ রশ্মি এর গভীরে প্রবেশ করে না। ফলে জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ সহজেই উত্তপ্ত হয়ে যায়।

*গভীরে প্রবেশ, আপেক্ষিক তাপ, বাষ্পীভবন।*

- প্রতি গ্রাম ভরের বস্তুর তাপমাত্রা ১° সেঃ পরিবর্তনের জন্য যে তাপের প্রয়োজন তাকে বলা হয় আপেক্ষিক তাপ। পানির আপেক্ষিক তাপ স্থলের চেয়ে প্রায় তিনগুন বেশী। সুতরাং জল ভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য স্থলভাগের চেয়ে অবশ্যই বেশী তাপ প্রয়োজন হয়।
- বাস্পীভবন স্থলের চেয়ে জল ভাগেই বেশী হয় এজন্য সুপ্ততাপ হিসাবে কিছু তাপ ব্যয়ীত হয় যা জল ভাগকে শীতল করে।

স্থলভাগ জলভাগ বা সমুদ্র থেকে দ্রুত শীতল বা উষ্ণ হয়। ফলে কোন স্থানের অবস্থান সমুদ্র বা স্থলের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তার জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সমুদ্রতলের বাৎসরিক তাপমাত্রা সীমা স্থলভাগের তুলনায় কম। সমুদ্রের তাপমাত্রাসীমা হচ্ছে -২° সেঃ থেকে ৩২° সেঃ অন্যদিকে উন্মুক্ত স্থলভাগে এ সীমা -৮৮° সেঃ থেকে ৫৮° সেঃ। সমুদ্রের তাপমাত্রার প্রাত্যহিক পরিবর্তন ১° সেঃ এর কম।

*সমুদ্রের তাপমাত্রার প্রাত্যাহিক পরিবর্তন ১° সে. এর কম।*

স্থলভাগের চেয়ে সমুদ্রের/জলভাগের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে শীতল বা শীতকালে অধিকতর উষ্ণ থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ মাত্র ২০% অন্যদিকে উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ ৪০%।

তাপমাত্রার বার্ষিক পরিবর্তনের উপর স্থল ও সমুদ্র ভাগের সরাসরি প্রভাব এ দুই গোলার্ধের তাপমাত্রা তুলনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

*কোন কোন বিষয় তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে?*

*সারণি ৩.১৬.২ : বাৎসরিক গড় তাপমাত্রার অক্ষাংশ ব্যাপী ব্যবধান, °সেঃ।*

| অক্ষাংশ | উত্তর গোলার্ধে সেঃ | দক্ষিণ গোলার্ধ সেঃ |
|---|---|---|
| ০ | ০ | ০ |
| ১৫ | ৩ | ৪ |
| ৩০ | ১৩ | ৭ |
| ৪৫ | ২৩ | ৬ |
| ৬০ | ৩০ | ১১ |
| ৭৫ | ৩২ | ২৬ |
| ৯০ | ৪০ | ৩১ |

## সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রস্রোত ও সন্নিকটবর্তী স্থলভাগের উপর এর প্রভাব অনিয়ত (Variable)। উষ্ণ স্রোতের মেরুমুখী প্রবাহ ও তার প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। উত্তর আটলান্টিক স্রোত, উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের বর্ধিতাংশ ইংল্যান্ড ও তার পার্শ্ববর্তি পশ্চিম ইউরোপকে উষ্ণ রাখে, যা এ অক্ষাংশের স্থলবেষ্টিত অঞ্চল থেকে অনেক বেশী তাপমাত্রা। পশ্চিমা বায়ু প্রবাহের কারণে এ উষ্ণতা আরো খানিকটা স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

*অনিয়ত, মেরুমুখী প্রবাহ, পশ্চিমা বায়ু।*

শীতল সমুদ্র স্রোতের প্রভাব নিরক্ষীয় অঞ্চলে অথবা গ্রীষ্মকালে মধ্য (Middle Latitude) অক্ষাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বেঙ্গুলা শহর দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলের বেঙ্গুলা স্রোতের (Benguela Current) প্রভাবে শীতল থাকে।

*সমুদ্রস্রোত কিভাবে তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে?*

## উচ্চতা (Altitude)

উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাত্যাহিক তাপমাত্রার সীমাও পরিবর্তিত হয়। কয়েকটি বিষয়ের উপর এ তাপমাত্রা পরিবর্তন নির্ভরশীল।

১. উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে সৌরশক্তির অল্প পরিমাণই বায়ুতে শোষিত অথবা প্রতিফলিত হয়।

২. উচ্চতার সাথে সৌর বিকিরণের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় ফলে দিবা ভাগের তাপগ্রহণ বৃদ্ধি ও রাত্রে শীতলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাপমাত্রা উচ্চ ও নিম্ন সীমা অনেক বেড়ে যায়।

*বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ, সৌর বিকিরণের তীব্রতা।*

সাধারণ বায়ুর তাপের পরিবর্তনের হার (Lapes rate), উচ্চতার সাথে যে পরিমাণ হ্রাস হওয়ার কথা, পৃষ্ট দেশে তাপ গ্রহণ করে ভূ-ত্বক উত্তপ্ত হয় বলে তাপমাত্রা সে তুলনায় বেশী থাকে।

*উচ্চতা পরিবর্তনের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক কি?*

## ভৌগোলিক অবস্থান (Geographic Position)

*ভৌগোলিক অবস্থান।*

কোন স্থানে বায়ুর তাপমাত্রা তার ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। সমুদ্রপকুলে যেখানে সমুদ্র দিক হতে বায়ু সরাসরি প্রবাহিত হয় আর যে স্থানে মহাদেশের দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয় এ দুই স্থানের তাপমাত্রা ভিন্ন হয়। সমুদ্র হতে যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানকার জলবায়ু হবে মৃদু। কেননা গ্রীষ্মকাল তুলনামূলক শীতল ও মৃদু শীতকাল অবস্থা বিরাজ করে। অন্যদিকে সমুদ্র বায়ু থেকে রক্ষিত (Leeward coastal situation) উপকুলে অবস্থিত স্থানে স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত বায়ুর প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্কের তাপমাত্রার তুলনা করা যেতে পারে।

সারণি ৩.১৬.৩ : সমুদ্র দিক হতে বায়ু প্রবাহস্থান ও সমুদ্রবায়ু হতে আড়াল (Leeward) স্থানের মাসিক গড় তাপমাত্রা ও বাঃসরিক তাপমাত্রার তুলনা (°সেঃ)।

| মাস | জাঃ | ফেঃ | মাঃ | এঃ | মে | জুন | জুঃ | আঃ | সেঃ | অঃ | নঃ | ডিঃ | বাৎসরিক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইউরেকা, ক্যালিফোর্নিয়া (সমুদ্র হতে প্রবাহ) | ৯ | ৯ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১২ | ১১ | ৯ | ১১ |
| নিউইয়র্ক সমুদ্র হতে বায়ু প্রবাহের আড়াল দিকে | -১ | -১ | ৩ | ৯ | ১৬ | ২১ | ২৩ | ২৩ | ২১ | ১৫ | ৭ | ২ | ১১ |

*বায়ু প্রবাহের ভিন্নতার জন্য ও তাপমাত্রা ভিন্ন হয়।*

যে সমস্ত স্থান পাহাড় দ্বারা বিভক্ত, তাদের বায়ু প্রবাহের ভিন্নতার জন্য ও তাপমাত্রা ভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ ওয়াশিংটন এর দুটি শহর যা ক্যাসকেড পর্বতমালা (Cascade Range) দ্বারা বিভক্ত তাদের মধ্যে সিয়াটলের (Seattle) তাপমাত্রায় সমুদ্রের প্রভাব বেশী। অন্যদিকে স্পোকেন (Spokane) এর তাপমাত্রায় মহাদেশীয় প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। স্পোকেন এর তাপমাত্রা শীতকালে সিয়াটল অপেক্ষা ৭° সেঃ কম অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে ৪° সেঃ বেশী থাকে।

*সারণি ৩.১৬.৪ : পর্বতের বাধার ফলে তাপমাত্রা (°সে.) পার্থক্য:*

| | জাঃ | ফেঃ | মাঃ | এঃ | মে | জুন | জুঃ | আঃ | সেঃ | অঃ | নঃ | ডিঃ | বাৎসরিক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিয়াটল | ৪ | ৫ | ৭ | ৯ | ১২ | ১৫ | ১৭ | ১৭ | ১৪ | ১১ | ৮ | ৬ | ১১ |
| স্পোকেন | -৩ | -১ | ৩ | ৯ | ১৩ | ১৬ | ২১ | ২০ | ১৬ | ৯ | ২ | -১ | ৯ |

## তাপমাত্রা বিলোমতা ও বায়ুদূষণ (Temperature Inversion and Air pollution)

*সাধারণ উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায়।*

সাধারণত: উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় ; একে তাপ হ্রাস হার (Lapse Rate) বলে। কিন্তু যদি এমন হয় যে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের ভিন্নতার কারণে তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার ঋণাত্মক না হয়ে উচ্চতার সাথে ধনাত্মক হয় বা বৃদ্ধি ঘটে বিপরীত পরিবর্তন হার দেখা দেয় যা তাপের উৎক্রম (Inverse lapse rate) বলে। এ পরিবর্তন খুব বেশী হলে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণ উর্ধ্বাংশে না গিয়ে নিম্নমুখী হয়; ফলে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। এ ধরনের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে তাপমাত্রা বিলোমতা (Temperature Inversion) বলে। যদি তীব্র বায়ু প্রবাহ এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন নগর অঞ্চলে ধূলা গম্বুজ (Dust dome) গঠিত হয়।

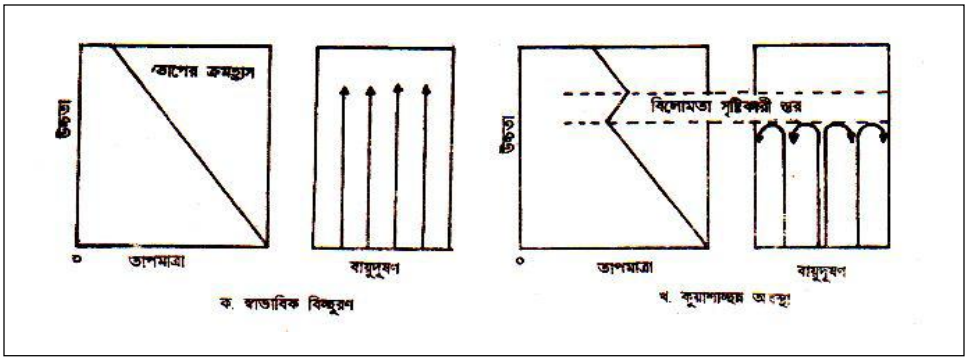

*চিত্র: ৩.১৬.১ তাপের ক্রমহ্রাস হয় ও উর্ধ্বাকাশে বিচ্ছুরণ।*
*(ক) বায়ু দূষণে পরিচ্ছন্ন আকাশে স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। (খ) কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে বিলোমতা*

*তাপমাত্রা বিলোমিতা কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

তাপ হচ্ছে শক্তির একটি রূপ। তাপমাত্রা হচ্ছে তাপের তীব্রতার মাত্রা। তাপের মাত্রার নানা ভেদে এর বিভিন্ন তাপীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার। সাধারণভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বস্তুর আয়তন বাড়ে, আবার তাপমাত্রা কমলে আয়তন কমে। তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল আছে। তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কিছু নিয়ামক হচ্ছে স্থল ও জলভাগের ভিন্নধর্মী তাপ গ্রহণ, সমুদ্রস্রোত, উচ্চতা, ভৌগোলিক অবস্থান। এগুলোর প্রতিটির ভিন্নতায় তাপমাত্রায়ও ভিন্নতা দেখা দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৬

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ তাপ ও তাপমাত্রা হল -
ক. একই খ. শক্তি ও শক্তির নির্দেশক
গ. বল ও শক্তি ঘ. বেগ ও গতি

১.২ তাপমাত্রা নির্ভরশীল নয় -
ক. সমুদ্র স্রোত খ. উচ্চতা
গ. ভৌগোলিক অবস্থান ঘ. দ্রাঘিমার উপর

১.৩ থার্মোমিটার উদ্ভাবিত হয় -
ক. ১৬ শতকে খ. ১৭ শতকে
গ. ১৮ শতকে ঘ. ১৯ শতকে

১.৪ সেলসিয়াস একক আবিষ্কার হয় -
ক. ইন্ডিয়ায় খ. জাপানে
গ. সুইডেনে ঘ. কোথাও না

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১. তাপ ও তাপমাত্রা কি?
২. থার্মোমিটার কি?
৩. তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন পরিমাপের স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক কি?
৪. তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহ কি কি?
৫. তাপমাত্রা বিলোমতা কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. তাপ ও তাপমাত্রা কি?

২. তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেল ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? বায়ুর তাপমাত্রা উপাত্তের ব্যবহার কি কি?
৩. তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রকসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

## পাঠ ৩.১৭ : পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টন (World distribution of Temperature)

এই পাঠে জানা যাবে -
◈ পৃথিবীতে তাপমাত্রার বন্টন ও মানচিত্রে উপস্থাপন;
◈ তাপবলয় কিভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে এবং তা পৃথিবীর জলবায়ু কিভাবে নিয়ন্ত্রন করে।

### পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টন (World distribution of Temperature)

*সমোষ্ণ রেখা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।*

জানুয়ারী ও জুলাই মাসে কোনো স্থানের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। ফলে এ দুই মাসের তাপমাত্রা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জন্য চরম সীমা। এ দুই মাসের সমোষ্ণ রেখা বিশ্লেষন করলে তাপমাত্রার বন্টন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে (চিত্র ৩.১৭.১)। কোন স্থানের তাপমাত্রাকে বিশ্ব মানচিত্রের সমোষ্ণ রেখায় সমতা বিধানের পূর্বে তাপের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতা থেকে সমুদ্রপৃষ্টের সমতুল্যে নিয়ে আসা হয়।

১. উভয় সময়ে সমোষ্ণ রেখা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রেখাগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সূর্যালোকে প্রাপ্তির ভিন্নতার জন্য অক্ষাংশ পরিবর্তনের সাথে তাপমাত্রা ও পরিবর্তিত হয়। আবার ঋতুকালীন সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রা ও সমোষ্ণ রেখারও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

২. স্থলভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। ঋতুপরিবর্তনের সাথে সমোষ্ণ রেখার উত্তরে বা দক্ষিণে সরে যাওয়া স্থলভাগ জলভাগ বা সমুদ্রভাগের তুলনায় বেশী হয়। দক্ষিণ মেরুতে স্থলভাগ কম ও উত্তর মেরুতে স্থলভাগ বেশী বলে তাপমাত্রার পরিবর্তন উত্তর মেরুতে বেশী এবং সমোষ্ণ রেখার স্থান পরিবর্তন এরকম হয় গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে আর শীতকালে দক্ষিণ দিকে সরে আসে।

৩. তাপের বন্টনে সমুদ্র স্রোতের প্রভাব ও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের ফলে সমোষ্ণ রেখা মেরুর দিকে, আর শীতল স্রোতের জন্য বিষুবরেখার দিকে বেঁকে যায়।

৪. মেরু অঞ্চলে সূর্য সব সময়ই তীর্যকভাবে কিরণ দেয় বলে তাপমাত্রার পরিবর্তন সীমা বাৎসরিক হিসাবে খুব কম কিন্তু মধ্যবর্তী অক্ষাংশে পার্থক্যটা বেশী হয়, কেননা দিন রাত্রির ব্যবধান বেশ উল্লেখযোগ্য।

৫. স্থল মহাদেশীয় (Continental) ভাগের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণ ও শীতকাল অধিক শীতল হয়; বাৎসরিক সীমা (Annual range) অনেক বেশী ও তিব্রতা স্থানের মহাদেশীয় অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

*পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টন কিরূপ?*

## পৃথিবীর তাপ বলয়সমূহ

*সৌরভাগের তারতম্যের ভিত্তিতে উভয় গোলর্ধকে ৭টি করে মোট ১৪টি তাপ বলয়ে ভাগ করা যায়।*

সৌরভাগের তারতম্যের ভিত্তিতে উভয় গোলার্ধকে ৭টি করে মোট ১৪টি তাপ বলয়ে ভাগ করা যায়।

ভূ-পৃষ্টের কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা কতখানি সূর্যালোক পাবে তা সূর্যরশ্মি কতখানি খাড়া/লম্বভাবে বা তির্যকভাবে কিরণ দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। পৃথিবীব্যাপী সূর্যরশ্মির এ আপতনে তারতম্য আছে, ফলে সৌরভাগের বন্টনেও তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ ধারণার ভিত্তিতে পৃথিবীকে কতগুলো তাপ বলয়ে ভাগ করা যায় (চিত্র ৩.১৭.২)। নিরক্ষরেখা থেকে উভয় গোলার্ধে ৭টি করে মোট ১৪টি ভৌগোলিক বলয় ধরা হয়েছে।

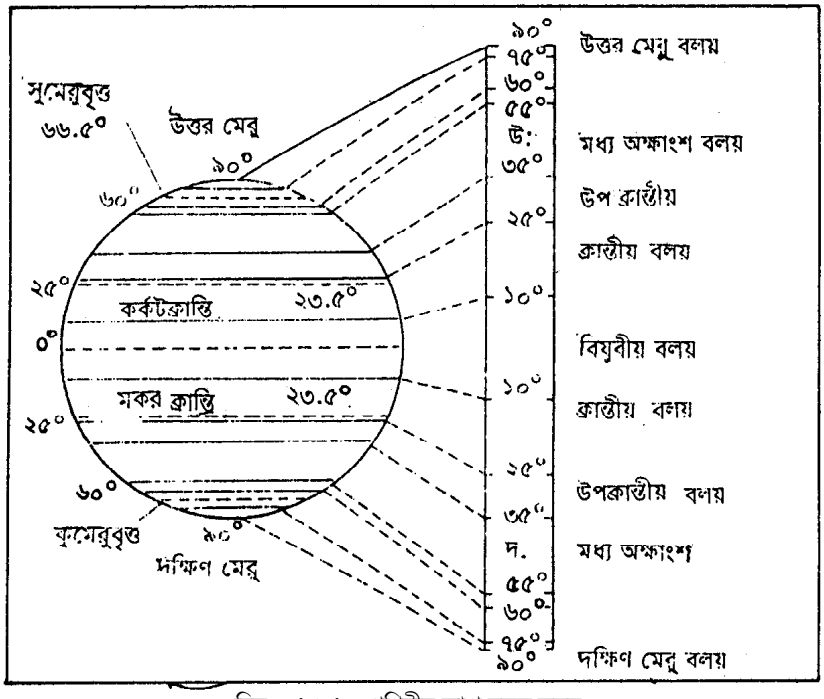


চিত্র ৩.১৭.১ : পৃথিবীর তাপ বলয় সমূহ।

*নিরক্ষীয় বলয়, বিষুবকাল।*

নিরক্ষরেখার উভয় পাশের প্রথম বলয়টির নাম নিরক্ষীয় বলয় যা নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বলয়ে সূর্য সারা বছর সমানভাবে কিরণ দেয় এবং রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান থাকে। এ বলয়ের পরেই উভয় গোলার্ধের ১০° থেকে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তিয় বলয় অবস্থিত। এ অংশে এক বিষুবকালে সূর্য মধ্য গগনে উপস্থিত হয়, আবার বিপরীত বিষুবকালে সূর্য হেলে কিরণ দেয়। ফলে, ঋতু পরিবর্তন খুব স্পষ্ট ।

*ক্রান্তীয় এলাকা, উপক্রান্তীয় বলয় উপমেরু বলয়।*

ক্রান্তীয় এলাকা থেকে মেরুর দিকে (২৫° থেকে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ) উপক্রান্তীয় বলয় অবস্থিত। এর পরপরই মধ্য অক্ষাংশ বলয় (৩৫° থেকে ৫৫° উত্তর ও দক্ষিণ) অবস্থিত। এ বলয়ে সূর্যালোকের আপতনে অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। ফলে, এ অংশে সৌরতাপ প্রাপ্তির ঋতুভিত্তিক পরিমাণগত তারতম্য খুবই উল্লেখযোগ্য। ক্রান্তীয় বলয়ের তুলনায়, এ এলাকার বিভিন্ন ঋতুতে রাত ও দিনের দৈর্ঘ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মধ্য অক্ষাংশ বলয়ের পরই উভয় গোলার্ধে ৫০° থেকে ৬০° অক্ষাংশে উপমেরু বলয় অবস্থিত। এটি উত্তর গোলার্ধে উপসুমেরু ও দক্ষিণ গোলার্ধে উপকুমেরু বলয় নামে পরিচিত। সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের উভয় পাশেই সুমেরু ও কুমেরু বলয় অবস্থিত। এ বলয়ে সবচেয়ে বেশী দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের বার্ষিক পরিবর্তন হয়। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় উত্তর গোলার্ধের সর্বক্ষণ দিন এবং দক্ষিণ গোলার্ধের রাত থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়ণের সময় এর বিপরীত অবস্থা হয়। মেরু বলয় উভয় গোলার্ধের ৭৫° অক্ষাংশ থেকে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এ গোলাকৃতির এলাকায় বছরের ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন থাকে।

*উপকুমেরু বলয়। ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন।*

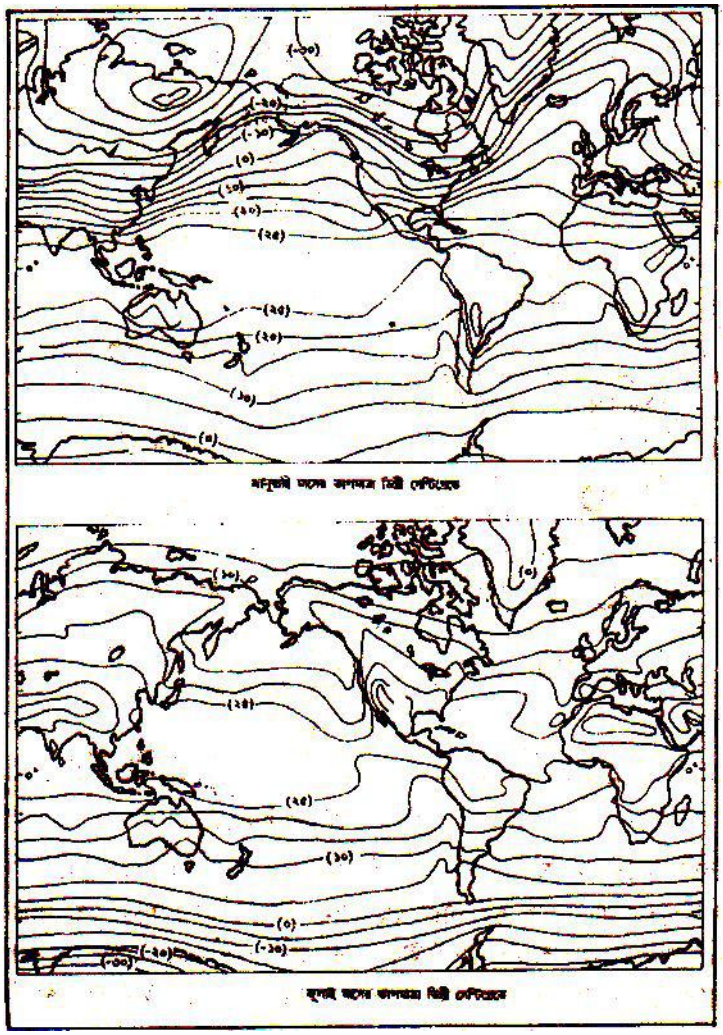

চিত্র ৩.১৭.২ : পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টন।

## তাপমাত্রা চক্র (Cycles of Temperature)

কোন স্থানের অবিরত তাপমাত্রার পরিমাপ থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রাত্যহিক তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। সূর্যোদয়ের পর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং দুপরের পর বিকালে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, তারপর আবার কমতে থাকে এবং তা সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ চক্রকে বলে

*সূর্যোদয়ের পর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং দুপুরের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। তারপর আবার কমতে থাকে।*

তাপমাত্রার প্রত্যাহিক ক্রম (Daily March of Temperature)। বাৎসরিক তাপমাত্রায় ও এ ধরনের ক্রম-চক্র পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিকিরণ মাত্রার সাথে এর সম্পর্ক কম, কেননা, তাপমাত্রা পরিবর্তনের নিয়ামক (বায়ু প্রবাহ, উচ্চতা, সমুদ্র স্রোত ইত্যাদি) সমূহ ক্রিয়াশীল থাকে বলে বাৎসরিক চরম ও পরম তাপমাত্রা সব সময় একই দিনে হয় না। তবে মোট চক্রের অনুপাতটা মোটামুটি একই থাকে। এ পরিক্রমার নাম হচ্ছে তাপমাত্রার বাৎসরিক চক্র বা ক্রম (Annual March of Temperature) জলবায়ু বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণে এদের গুরুত্ব রয়েছে।

*তাপমাত্রা চক্র এবং এর ব্যবহার কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

তাপ শক্তির একটি রূপ এবং তাপমাত্রা বস্তুর তাপীয় অবস্থার নির্দেশক। তাপ পরিমাপক যন্ত্র থার্মোমিটার। পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টনের একটি গড় চিত্র পাওয়া যায়। জানুয়ারী ও জুলাই মাসের সমোষ্ণ রেখা বিশ্লেষণে দেখা গেছে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। স্থল ভাগে সমুদ্রভাগের তুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৭

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ কোন স্থানের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে -

ক. জুলাই খ. জানুয়ারি
গ. জুন ঘ. এপ্রিল মাসে

১.২ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় -

ক. জলে খ. বায়ুতে
গ. স্থলভাগে ঘ. প্লেনে

১.৩ ভৌগোলিক বলয় কয়টি-

ক. ১৩টি খ. ১৪টি
গ. ১৫টি ঘ. ১৬টি

১.৪ তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়-

ক. সকালে খ. দুপুরে
গ. বিকেলে ঘ. রাতে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ৬ মিনিট) ঃ

১. মেরু অঞ্চলে দিন-রাত্রীর পার্থক্য বেশি কেন?
২. তাপমাত্রার প্রাত্যহিক ক্রম কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা বন্টন ও তাপ বলয় চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.১৮ : বায়ুচাপ (Air pressure)

এই পাঠ শেষে জানবেন-

◈ বায়ু চাপের সাথে গ্যাসের ধর্মের সম্পর্ক, হিপসোমেট্রিক ও উচ্চতার সম্পর্ক;
◈ কিভাবে বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়;
◈ ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুচাপ-এর বিন্যাস।

## গ্যাসের ধর্ম ও বায়ুচাপ (Properties of gases and Air pressure)

*চাপ ও ঘনত্ব সমানুপাতিক।*

গ্যাসীয় অণু, কঠিন বা তরল পদার্থের অণূর মত সঙ্গবদ্ধ বা অবিচল নয়। গ্যাসীয় অনুসমূহ সতত ইতস্ত ছোটাছুটি করে এবং মুক্ত চলাচল করতে পারে। আবদ্ধ পাত্রে ছোটাছুটির ফলে প্রতি একক পৃষ্ঠে গ্যাস চাপের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃষ্ঠস্থ বায়ু ভূ-ত্বকের সাথে লেপটে থাকে। এ আকর্ষণের ফলে গ্যাস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে না। অর্থাৎ বায়ু নিম্নে সমুদ্র বা স্থলভাগ এবং উর্দ্ধে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা পৃথিবীর উপরে আবদ্ধ অবস্থায় আছে। বায়ুর চাপ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতি একক জায়গায় গ্যাসের (বায়ুর) অণুগুলোর সংঘর্ষের ফলে প্রদত্ত বল।

*গ্যাসীয় অণুর গতি বৃদ্ধি পায়।*

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসীয় অণুর গতি বৃদ্ধি পায়, ফলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ চাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক; আবার চাপ বৃদ্ধি পেলে আয়তন হ্রাস পায় অথবা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় (ঘনত্ব = ১/আয়তন); অর্থাৎ চাপ ও ঘনত্ব সমানুপাতিক। সুতরাং সাধারণ আদর্শ গ্যাসের সূত্রানুযায়ী বলা যায়-

চাপ = তাপমাত্রা * ঘনত্ব * ধ্রুব

*পরম একক।*

গ্যাসের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাপা হয় পরম (Absolute or Kelvin) এককে। বায়ুর চাপের তাপমাত্রার পরিবর্তন ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে পরিবর্তীত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আয়তন বৃদ্ধি পায় বলে চাপ কমে যেতে পারে। ফলে বায়ুর চাপ পরিমাপের জন্য ঘনত্বের মান বেশী মাত্রায় প্রভাব ফেলে; তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে চাপের কি পরিবর্তন হবে তাও ঘনত্বের মান থেকেই জানা যায়।

*বায়ুচাপ কি?*

## হিপসোমেট্রিক সম্পর্ক (The Hypsometric Relation)

*কার্য তাপমাত্রা।*

বায়ুতে জলীয় বাস্পের উপস্থিতিতে তার ঘনত্ব হ্রাস পায়। জলীয় বাস্পের আণবিক আয়তন বায়ুস্থ মৌলের আয়তন থেকে বেশী হয়, ফলে ঘনত্ব কম থাকে। তাপমাত্রার সাথে ঘনত্বের মাত্রা ও পরিবর্তিত হয়। যদি বায়ুতে জ্ঞাত পরিমাণ জলীয়বাস্প থাকে, তবে পদার্থের অবস্থার সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে কল্পিত পূরণ তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। একে কার্য (Virtual Temperature) তাপমাত্রা বলা হয়। এ অবস্থা এ মর্মে গৃহীত হয় যে কার্য তাপমাত্রা কখনোই মূল বা প্রকৃত তাপমাত্রার (Real Temperature) ২° বা ৩° সে. এর অধিক হয় না। পদার্থের অবস্থার সূত্র

(Equation of State) ব্যবহার করে কার্য তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলে হিপসোমেট্রিক সম্পর্ক (Hypsometric Relation)।

বাতাসের প্রতিটি স্তরের পুরুত্ব হিপসোমেট্রিক সম্পর্ক থেকে নির্ণয় করা যায়, কেননা প্রতিটি স্তরের তাপমাত্রা, চাপ এবং জলীয় বাষ্পের প্রভাব পরিমাপ সম্ভব। কাঙ্ক্ষিত স্তর সংখ্যা ও তাদের পুরুত্বের পরিমাণ হতে কোন আদর্শ অভিসম্বন্ধ (Reference) সমতলের (যেমন সমুদ্র সমতলের) উচ্চতা যে কোন সমতল থেকে পরিমাপ করা যায়।

*বায়ুচাপে হিপসোমেট্রিক সম্পর্ক কি?*

## বায়ুচাপের সাথে উচ্চতার (Altitude) সম্পর্ক

বায়ু প্রবাহ অণূর উপর বলের অসমতার সাথে সম্পর্কিত। উচ্চচাপ স্থান হতে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুচাপ অনুভূমিক (Horizontal) দিক অপেক্ষা লম্বভাবে (Vertical) বেশি পরিবর্তীত হয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ ১০১৩ মিলিবার (১৪.৭ পাউন্ড/বর্গইঞ্চ), হিমালয় পর্বতের শিখরে (৮৮৪৮ মি. উচ্চতার) ৩২০ মিলিবার।

১ মিলিবার = ১০০ নিউটন/বর্গমিটার

১ নিউটন = ১ কিলোগ্রাম - মিটার/বর্গ সেকেন্ড

বায়ুর চাপ যেহেতু অণু সমূহের গতির উপর নির্ভর করে তাই ধরা যায় যে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছিই অণুর বিচরণ সর্বপেক্ষা বেশী। চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়-

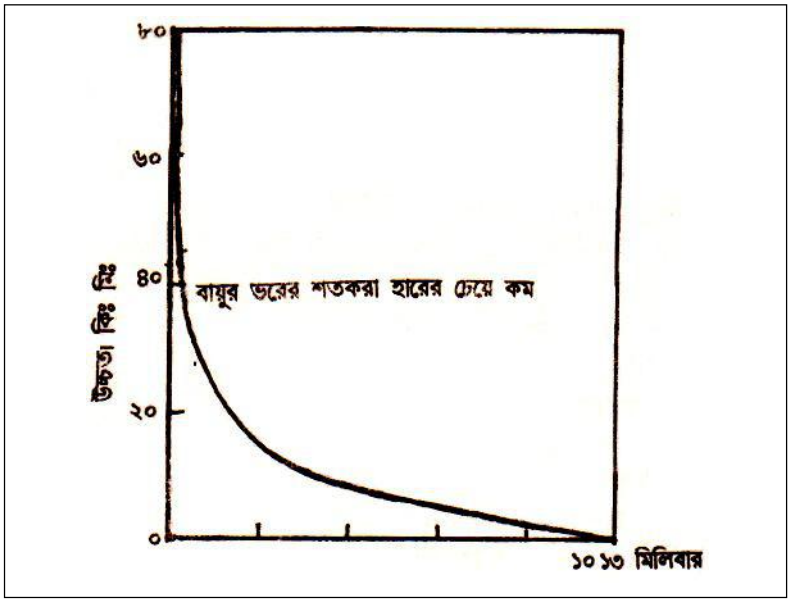


চিত্র ৩.১৮.১ : উচ্চতার সাথে বায়ুচাপের সম্পর্ক। বায়ুর চাপ ভরের উপর নির্ভরশীল, যা উচ্চতার সাথে হ্রাস পায়।

*বায়ুচাপের সাথে উচ্চতার সম্পর্ক কি?*

## বায়ুচাপ পরিমাপ (Measuring Air Pressure)

বায়ু চাপ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ব্যারোমিটার (Barometer)। দুই ধরনের ব্যারোমিটার ব্যবহৃত হয়, যদিও দ্বিতীয় ধরনের ব্যারোমিটার প্রথম ধরনের ব্যারোমিটারেরই সংস্করণ।

১. পারদ ব্যারোমিটার (Mercurial Barometer)
২. তরলহীন ব্যারোমিটার (Aneroid Barometer)

*বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার।*

**১. পারদ ব্যারোমিটার (**Mercurial Barometer**):** ১৬৪৩ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলীও-এর ছাত্র টরিসেলী (Torricelli) পারদ ব্যারোমিটার তৈরি করেন। পারদ ব্যারোমিটারের সরল প্রস্তুত প্রণালী হচ্ছে- একটি পারদপূর্ণ কাঁচের একমুখ খোলা নলকে (Test Tube) আরেকটি পারদপূর্ণ পাত্রে উপুড় করে ডুবিয়ে রাখলে পারদ নলের মাঝে কিছুটা নীচে নেমে আসে। নলের মধ্যে পারদেরস্তম্ভ খোলা পাত্রে প্রদত্ত বায়ু চাপের সমানুপাতিক। বায়ুচাপ বাড়লে পারদস্তম্ভের উচ্চতাও বাড়ে। স্বাভাবিক বায়ুচাপে সমুদ্র সমতলে এ স্তম্ভের উচ্চতা হয় ৭৬০ মিলিমিটার বা ৭৬ সেন্টিমিটার। পারদের ঘনত্ব ও অভিকর্ষের মানের সাথে এ উচ্চতা গুণ করলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা যায়।

**২. তরলহীন ব্যারোমিটার (**Aneroid Barometer**):** সহজে বহনযোগ্য ও ছোট আকারের গঠনের জন্য এ ধরনের ব্যারোমিটারের গঠন হয় একটি স্পর্শকাতর ধাতব পাত্র, যা আংশিকভাবে বায়ু শুন্য করা হয়। এর মাঝখানে একটি স্প্রীং (Spring) থাকে যা একে বিকৃতি থেকে রক্ষা করে। স্পর্শকাতর ধাতব পাত্রটির আয়তন বায়ুচাপ কমলে বৃদ্ধি পায় এবং চাপ বাড়লে হ্রাস পায়। অবিরাম চাপ মানের জন্য তরলহীন ব্যারোমিটার ব্যবহার করে চাপ পাত্র (Barograph) তৈরি করা যায়। তরলহীন ব্যারোমিটার সাধারণত উচ্চতা মাপক যন্ত্র হিসাবে এবং বিমান চলাচলের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ব্যারোমিটারে বায়ুচাপের পরিমাণ স্বাভাবিক চাপের চেয়ে ৩০ মিলিবার পর্যন্ত বেশি বা ৬০ মিলিবার পর্যন্ত হতে পারে। এর অন্যথা হলে ঘুর্ণিঝড় বা দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

*কিভাবে বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়?*
*বিভিন্ন ধরনের ব্যারোমিটার কি কি?*

## পৃথিবীর বায়ু চাপ বন্টন (Global distribution of wind pressure)

সমচাপীয় (Isobaric) রেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ স্বাভাবিক বায়ুচাপের চেয়ে কম। স্বাভাবিক বায়ুচাপ ভূ-পৃষ্ঠে ১০১৩ মিলিবার ধরা হয়। সেক্ষেত্রে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে চাপের মান মাত্র ১০১১ থেকে ১০০৮ মিলিবার। এ নিম্নচাপ অঞ্চলকে (চিত্র ৩.১৮.২) নিরক্ষীয় ফাঁদ (Equatorial Trough) বলে।

*ভূ-পৃষ্ঠে স্বাভাবিক বায়ুচাপ ১,০১৩ মিলিয়ন।*

৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে বায়ুচাপ উচ্চ মাত্রার, ১০২০ মিলিবার। এ উচ্চ চাপীয় অঞ্চলকে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ অঞ্চল (Sub tropical high pressure) বলে। দক্ষিণ গোলার্ধে এ উচ্চচাপের কেন্দ্র রয়েছে যাকে উচ্চচাপ সেল (High pressure cell) বলে।

দক্ষিণ গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের দক্ষিণে আর্কটিক (Arctic) বলয় পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে যাকে উপমেরুদেশীয় নিম্নচাপ বলয় (Sub-arctic/Sub-polar low/low pressure belt) বলে। এটি ৬৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর অবস্থিত। এখানকার চাপ প্রায় ৯৮৪

মিলিবার। মেরু অঞ্চলে সব সময়ই বায়ু উচ্চচাপে থাকে, এ অবস্থাকে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ অঞ্চল বলে।

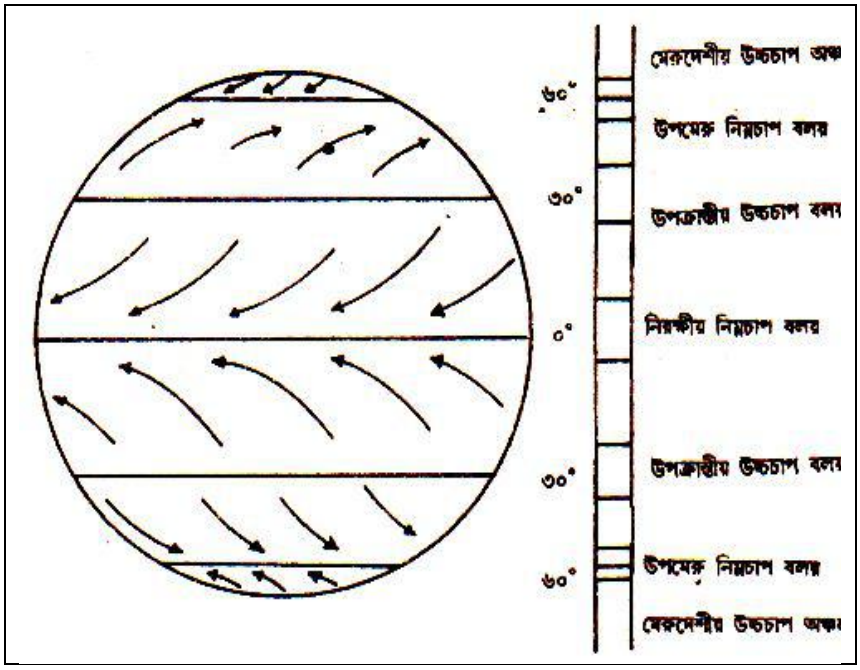


চিত্র ৩.১৮.২ : পৃথিবীর বায়ুচাপ বন্টন।

*উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় সমচাপ বলয়।*

**উত্তর গোলার্ধের চাপ কেন্দ্র (**Northern hemisphere pressure center)

উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মত বিশাল ভূ-ভাগ, উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিশাল জলরাশি উত্তর গোলার্ধের বায়ু চাপের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এ জন্য দক্ষিণ গোলার্ধের সমচাপ বলয়ের চেয়ে উত্তর গোলার্ধে ভিন্ন ধরনের চাপীয় অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

*কানাডিয়ান উচ্চচাপ, অ্যালেউশিয়ান নিম্নচাপ ও আইসল্যান্ড নিম্নচাপ।*

শীতকালে বিশাল ভূখন্ডে উচ্চচাপের কেন্দ্র গঠিত হয়, অন্যদিকে উষ্ণ সমুদ্র বক্ষে নিম্নচাপ কেন্দ্র গঠিত হয়। উত্তর মধ্য এশিয়ায় সাইবেরিয়াতে উচ্চচাপ (Siberian high) ১০৩০ মিলিবার পর্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চচাপ সমৃদ্ধ কানাডিয়ান উচ্চচাপ (Canadian high) সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে অ্যালেউশিয়ান নিম্নচাপ (Aleutian low) এবং আইসল্যান্ড নিম্নচাপ (Icelandic low) দেখা যায়। এ নিম্নচাপ অঞ্চল সমূহে শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করে।

*এ্যাজোর্স বারমুডা/হাওয়াইন উচ্চচাপ।*

গ্রীষ্মকালে ঠিক বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়, সমুদ্র ভাগে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। এশিয়াতে নিম্নচাপ অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়, আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে নিম্নচাপ আবর্তিত হয়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে দুটি ভিন্ন উচ্চচাপ কেন্দ্র তৈরি হয়। এগুলো তাদের শীতকালের অবস্থান থেকে উত্তরে সরে যায় এবং প্রসারিত হয় যা এ্যাজোর'স উচ্চচাপ (Azore's high) অথবা বারমুডা উচ্চচাপ (Bermuda high) এবং হাওয়াইয়ান উচ্চচাপ (Hawaian high) নামে পরিচিত।

*উত্তর গোলার্ধের বায়ুচাপ কেন্দ্র কেমন?*

## পাঠ সংক্ষেপ

বায়ুর চাপ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতি একক জায়গায় গ্যাসের (বায়ুর) অণুর সংঘর্ষের ফলে প্রদত্ত বল। বায়ুর চাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়। বায়ুর সমতলীয় চাপের পার্থক্য থেকে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু প্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে শোষিত সৌরশক্তি। পৃথিবীব্যাপী বায়ুর চাপের বন্টনে স্থানভেদে পার্থক্য দেখা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৮

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে গ্যাসের অণুর -
ক. শীতল খ. গতিবৃদ্ধি
গ. গরম ঘ. উষ্ণ হয়

১.২ স্বাভাবিক বায়ুচাপে পারদ স্তম্ভ-এর উচ্চতা -
ক. ১৮ সে.মি. খ. ৭০ সে.মি;
গ. ৭৬ সে.মি ঘ. ১০৪ সে.মি

১.৩ বিমানে ব্যবহৃত হয়-
ক. স্পিডোমিটার খ. ফ্যাদোমিটার
গ. টনোমিটার ঘ. তরলহীন ব্যারোমিটার

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ১০ মিনিট) ঃ

১ বায়ুচাপ কি?
২ আদর্শ গ্যাসের সূত্রটি কি?
৩ কার্য তাপমাত্রা বলতে কি বুঝ?
৪ বায়ুচাপে হিপসোমেট্রিক সম্পর্ক কি?
৫ কিভাবে বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয়?

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১. বায়ুচাপ কি?উষ্ণতার সাথেবায়ুচাপের সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. বায়ুচাপের সাথে উচ্চতার সম্পর্ক এবং বায়ুচাপ পরিমাপ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. পৃথিবীর বায়ুচাপ বন্টন কিরূপ? চিত্রসহ বিশদ আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.১৯ : বায়ুপ্রবাহ ঃ সাধারণ আলোচনা
## (Wind : General Discussion)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-
◈ বায়ু প্রবাহের নিয়ামক সমূহ, বায়ুচাপের শক্তি মাত্রা ও কোরওলিস প্রভাব;
◈ বায়ু প্রবাহের ধরন, ঘূর্ণন বায়ু, ঘর্ষণ স্তরের বায়ু ও স্থানীয় বায়ু প্রবাহ;
◈ বায়ুর উলম্ব প্রবাহের প্রকৃতি।

*সমতলীয় চাপের পার্থক্যের ফল।*

**বায়ু প্রবাহের নিয়ামক** (Factors Affecting Wind)ঃ বায়ু প্রবাহ হচ্ছে সমতলীয় চাপের পার্থক্যের ফল। বায়ু উচ্চচাপের স্থান হতে নিম্নচাপ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়; প্রবাহের মাধ্যমে চাপের সমতা বিধানের জন্য বায়ুর প্রবাহ অবিরত থাকে। অসম তাপ বন্টনের ও তাপ গ্রহণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু চাপের পার্থক্য হয়; অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে শোষিত সৌরশক্তি। পৃথিবীর ঘুর্ণনগতি না থাকলে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর এ প্রবাহ সরল ও নিয়ত হত; কিন্তু গতিশীল ধরনীর জন্য বায়ুপ্রবাহ কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্মিলিত কারণ। যথা:
১. চাপের ক্রমাবনতি শক্তি
২. কোরিওলিস প্রভাব
৩. কেন্দ্র বিমূখী বল
৪. ঘর্ষণ
৫. মাধ্যাকর্ষণ

বায়ু মন্ডলের চক্রাবৃত্তের কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
ক. বিভিন্ন অক্ষাংশে ভূ-পৃষ্ঠের ভিন্নমাত্রার তাপশক্তি প্রাপ্তি;
খ. নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন।

*নিরক্ষীয় অঞ্চল মেরু অঞ্চলের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ বেশি তাপ পায়।*

অক্ষাংশ ভিত্তিতে যদি আগত ও বহির্গত তাপশক্তির বিকিরণ পরিমাপ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষীয় ও ৩৫° অক্ষাংশ মধ্যবর্তী অঞ্চলে আগত তাপশক্তি বহির্গত তাপশক্তির চেয়ে বেশী। আবার ৩৫° থেকে মেরু অঞ্চলে বহির্গত বিকিরণ আগত বিকিরণ শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। মেরু অঞ্চলের চেয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চল প্রায় আড়াই গুণ বেশি তাপ পেয়ে থাকে। তাপ, শক্তি আকারে মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। বেশির ভাগ শক্তি বদল হয় মধ্যবর্তী অক্ষাংশে (Middle Lattitudes)। বায়ুর পরিক্রমা জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ু প্রবাহের শক্তি সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### চাপের ক্রমাবনতি শক্তি (The pressure gradient force)
চাপের তারতম্য মাত্রা হচ্ছে বায়ু প্রবাহের প্রকৃত শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ বায়ুকে পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে টেনে নামাতে চায়, যার মানই হচ্ছে বায়ুচাপ। দুটি স্থানে এ চাপের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ভূ-পৃষ্ঠে দুটি স্থানের মাঝে চাপের পার্থক্যই হচ্ছে চাপের ক্রমাবনতি (Pressure Gradient)। কোথাও চাপের পার্থক্য থাকলে তবে তা উচ্চচাপ থেকে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়। সাধারণত বায়ুর তাপমাত্রা পার্থক্যের বৃদ্ধির সাথে চাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, কেননা বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা বা কম ঘনত্বের হয় এবং উপরে উঠে যেতে চায়, ফলে ভূ-পৃষ্ঠে চাপ কমে যায়।

উচ্চ অক্ষাংশের শীতল ও ভারী বায়ু তখন এদিকে প্রবাহিত হয়। শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করে ও উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে শূন্যস্থান দখল করে।

চাপমাত্রার উপর বায়ু প্রবাহের সরল ও সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে স্থল বায়ু ও সমুদ্র বায়ু। দিনের বেলা স্থল ভাগ দ্রুত উষ্ণ হলে সমুদ্র থেকে বায়ু স্থলভাগের কম ঘনত্বের বায়ু সম্পন্ন কম চাপের বায়ুর দিকে প্রবাহিত হয়, যাকে Sea breeze বা সমুদ্র বায়ু বলে। আবার রাত্রি ভাগে স্থলভাগ দ্রুত ঠান্ডা হলে ভারী বায়ু সমুদ্রের হালকা ও উচ্চ বায়ুচাপ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়।

*স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু।*

চাপমাত্রার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে বায়ু প্রবাহ শুরু হলে কোরিওলিস ও ঘর্ষণ বল কার্যকর হয়। এ বল কেবলমাত্র গতির মাত্রা পরিবর্তন (Modify) করে, প্রবাহ তৈরি করতে পারে না।

*বায়ুপ্রবাহের নিয়ামক সমূহ কি কি?*

## কোরিওলিস প্রভাব (Coriolis Effect)

বায়ু প্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়, প্রবাহের এ ধরন পরিবর্তনকে কোরিওলিস শক্তি (Coriolis force) বলে।

*বায়ুপ্রবাহ উত্তর পোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।*

গোলার্ধ ভিত্তিক এ পরিবর্তন কোন প্রবাহিত চলমান (moving) বস্তুর উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন বলের প্রভাব বলে অনুমান করা যায়। এ বাঁকিয়ে দেওয়া বা দিক পরিবর্তনকারী শক্তি-

১. বায়ু প্রবাহের দিকের সাথে সর্বদা লম্বভাবে (৯০°) ক্রিয়া করে;

২. বায়ু প্রবাহে কেবল মাত্র দিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে, গতির উপর কোনো প্রভাব ফেলে না;

৩. বায়ুর গতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত, বেশি গতি হলে প্রভাব বেশি ও কম হলে প্রভাব কম হয় অর্থাৎ বিচ্যুতি মাত্রা নির্ভর করে;

৪. কোরিওলিস বা গোলার্ধ প্রভাব মেরুতে সর্বাধিক, নিরক্ষীয় অঞ্চলে কমতে থাকে, বিষুব রেখায় এর অস্তিত্ব লোপ পায়।

## ঘর্ষণ শক্তি (Frictional force)

বায়ু প্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় অসমতল ভূমিরূপের কারনে কিছু সংঘর্ষ ও ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। ঘর্ষণ বলের মাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর নির্ভর করে। যেমন, তুষারাবৃত্ত ও সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ু প্রবাহ মসৃণ তলের উপর কম ঘর্ষনের সৃষ্টি করে অন্যদিকে আকাশচুম্বি অট্রালিকা সমৃদ্ধ নগরী অথবা পাহাড়ী অসম গঠনে ঘর্ষণ বেশি মাত্রায় হয়।

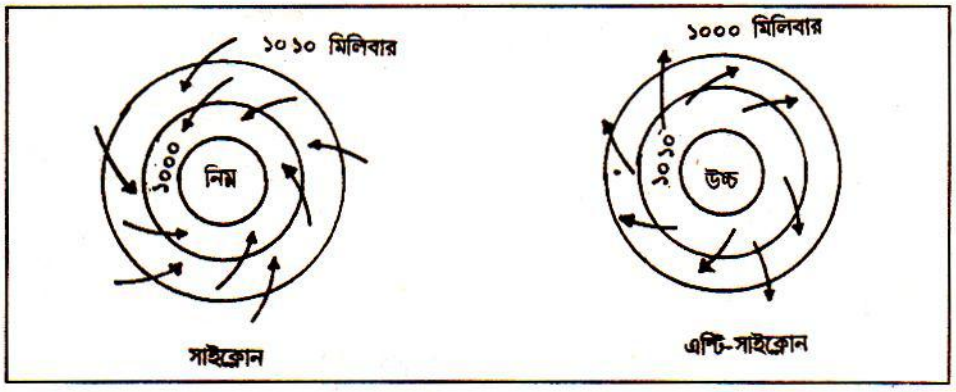


চিত্র ৩.১৯.১ : উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপের প্রভাবে সাইক্লোন ও উচ্চ চাপের প্রভাবে সৃষ্ট এন্টি সাইক্লোনের ঘূর্ণন দেখানো হলো দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন পরিদৃষ্ট হয়।

*কোরিওলিস প্রভাব বর্ণনা দিন?*

**বায়ু প্রবাহের ধরন ঃ**

**জিয়োস্ট্রোফিক প্রবাহ (**Geostrophic wind**)**

বায়ুপ্রবাহ চাপমাত্রা বা কোরিওলিস বলের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে যে লব্ধি সৃষ্টি করে তাকে জিয়োস্ট্রোফিক প্রবাহ বলে। জিয়োস্ট্রোফিক প্রবাহে বিচ্যুতি (Defletion) কমে শূন্য হয়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠে ঘর্ষনের স্তরের উপর মুক্ত এলাকায় এ প্রবাহ হয়। সমচাপীয় প্রবাহের সমান্তরালে এ বায়ুপ্রবাহ এ সীমার মধ্যে যদি চাপমাত্রার পার্থক্য, বাতাসের ঘনত্ব ও অক্ষাংশের অবস্থান জানা থাকে, তবে গতির ধারণাও সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।

**ঘুর্ণন প্রবাহ ও বাতাসের গতিমাত্রা (**Curved flow and the Gradient wind**)**

**১. সাইক্লোন (Cyclone) ঃ** আবহাওয়া বিদ্যায় নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্র বিন্দুকে সাইক্লোন বলে, এর চারিপাশে বৃত্তাকারে বায়ু ঘুরতে থাকে। সাইক্লোনিক প্রবাহ পৃথিবীর ঘুর্ণনের সমমূখী (Same direction), উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে (Counter clock wise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clock wise) হয় (চিত্র ৩.১৯.২)।

*সাইক্লোন, এন্টিসাইক্লোন।*

**২. এন্টি সাইক্লোন (Anti cyclone) ঃ** উচ্চ চাপের বায়ু প্রবাহের কেন্দ্রকে Anti cyclone বলে। এই প্রভাবে বৃত্তাকারে বায়ু ঘূর্ণন হয়, যা পৃথিবী ঘূর্ননের বিপরীতমুখী (চিত্র ৩.১৯.২)।

সমচাপীয় (Isobars) রেখা যখন বক্র হয়ে নিম্ন বা উচ্চ চাপীয় অঞ্চলে শাঙ্ক (Funnel) আকার তৈরি করে তখন ঐ স্থানকে যথাক্রমে ফাঁদ (Trough) ও উর্দ্ধমুখী (Ridge) বলে। ফাঁদ জাতীয় প্রবাহ সাইক্লোন ও উর্ধ্বমূখী প্রবাহ এন্টি সাইক্লোনের ক্ষেত্রে হয়।

**ঘর্ষণ স্তরের বায়ু (**Friction Layer winds**)**

বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ স্তরের বায়ু বায়ুমন্ডলের উপর বিশেষ প্রভাব রাখে। ভূমির বন্ধুরতার উপর নির্ভর করে বায়ু প্রবাহের দিকের পরিবর্তন হয়। ফলে বায়ু উপরের অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলকেও অশান্ত করে তোলে। (চিত্র ৩.১৯.২)

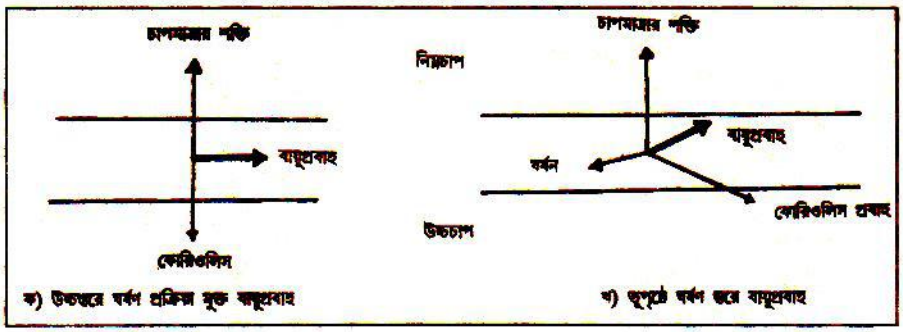


চিত্র ৩.১৯.২ : বায়ু প্রবাহে ঘর্ষনের প্রভাব।

*বায়ু প্রবাহের কয়েকটি ধরন কি কি?*

## স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ (Local wind system)

স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সমুদ্র বায়ুপ্রবাহ (Sea breeze) ও স্থল বায়ুপ্রবাহ (land breeze) অন্যতম। স্থানীয় ভূ-বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে পাহাড়ী এলাকায় বায়ুপ্রবাহ পরিবর্তীত হয়। পাহাড়ের উচ্চতায় দিনে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে উপত্যকা অঞ্চল থেকে নিম্ন চাপের ফলে প্রবাহিত বায়ু উপত্যকা বায়ু (Valley breeze) হিসাবে আবার রাত্রে উল্টো ঘটনা ঘটলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বায়ুপ্রবাহ উপত্যকার দিকে পর্বত বায়ু (Mountain breeze) হিসাবে প্রবাহিত হয়।

*সমুদ্রবায়ু প্রবাহ ও স্থল বায়ুপ্রবাহ।*

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শীতল ভারী বায়ু যখন মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে নামতে থাকে এ অবস্থাকে স্থানীয় ক্যাটাবাটিক বায়ু (Katabatic wind) প্রবাহ বলে।

## বায়ুর উলম্ব প্রবাহ (Vertical motion of wind)

নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ু অন্তমূর্খী প্রবাহ নির্দেশ করে। এখানে অন্তর্মুখী প্রবাহের জন্য বায়ু আয়তনে

*অন্তর্মুখ প্রবাহ।*

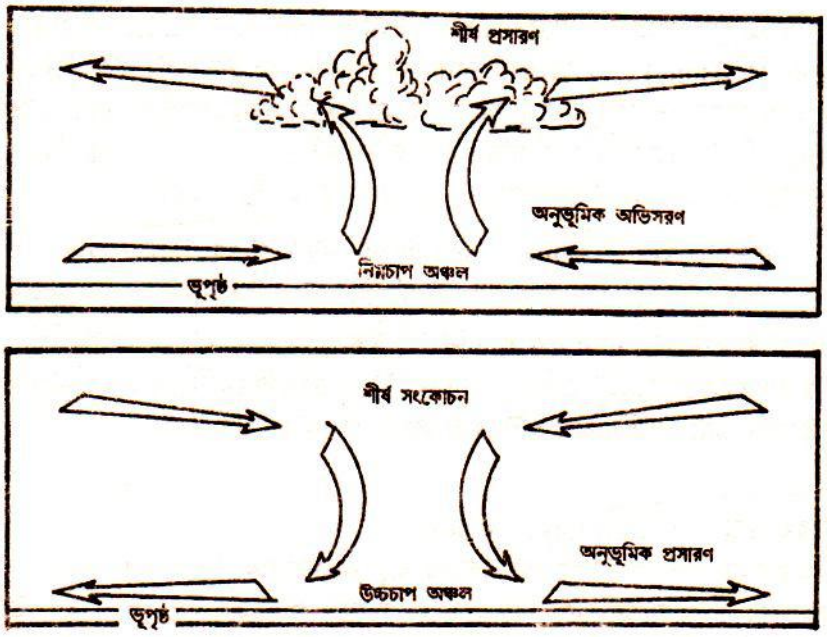


চিত্র ৩.১৯.৩ : বায়ুর উলম্ব চাপ ও প্রবাহ। সমতলীয় অভিসরণ ও উলম্ব প্রবাহ নিম্নচাপ অথবা সাইক্লোনের সাথে সম্পর্কযুক্ত; অন্যদিকে শীর্ষ সংকোচন ও সমতুল্য প্রসারণ বায়ুর এন্টিসাইক্লোন সৃষ্টি করে।

*সমতলীয় অভিসরণ শীর্ষ প্রসারণ।*

হ্রাস পায়; যার ফলে বায়ু সমতলীয় অভিসরণ সৃষ্টি করে (Horizontal convergence)। সমতলীয় অভিসরণের ফলে বায়ু স্তম্ভ উর্ধক্ষেপন হয়। অনেক উঁচুতে এ বায়ুর আবার একটি স্তরে গিয়ে শীর্ষ প্রসারণ (Divergent aloft) হয়। এভাবে বায়ু সাইক্লোন তৈরি করে প্রচুর মেঘ সৃষ্টি ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।

*শীর্ষ সেলে অভিসরণ, এন্টিসাইক্লোন।*

উচ্চচাপের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। বায়ু শীর্ষ সেলে অভিসরণ (Convergence) ঘটে, ফলে ভারী বায়ু নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে আসে। নীচে এসে আবার আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসারণ ঘটে, ফলে বায়ু পার্শ্বদিকে প্রবাহিত হয়। এভাবে এন্টিসাইক্লোনিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

## পাঠ সংক্ষেপ

বায়ু প্রবাহ হচ্ছে সমতলীয় চাপের পার্থক্যের ফল। বায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চ বায়ুচাপ স্থান হতে বায়ুর নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুর প্রবাহে ঘুর্ণন প্রবাহ দেখা যায় যেমন, সাইক্লোন ও এন্টিসাইক্লোন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহের মধ্যে জিয়োস্ট্রাফিক, ঘূর্ণন ও স্থানীয় বায়ু প্রবাহ অন্যতম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১৯

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ কোরিওলিস প্রভাবের ফলে বায়ুপ্রবাহ বেঁকে যায়-
- ক. উত্তর গোলার্ধে বাম ও দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে
- খ. উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে সমান্তরাল দিকে
- গ. উত্তর গোলার্ধে ডান ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে
- ঘ. উত্তর গোলার্ধে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিন দিকে

১.২ সাইক্লোনিক প্রবাহ হয় দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার-
- ক. উল্টো দিকে
- খ. একই দিকে
- গ. দিক মেনে চলে না
- ঘ. কখনো একই দিকে কখনো বিপরীত দিকে

১.৩ এশিয়ায় তীব্র নিম্নচাপ আবর্তিত হয়-
- ক. আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে
- খ. বাংলা ও বিহারকে কেন্দ্র করে
- গ. বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকৃতি কেন্দ্র করে
- ঘ. হিমালয়ের চূঁড়াকে কেন্দ্র করে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২ X ৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. বিভিন্ন ধরনের ব্যারোমিটার কি কি?
২. বায়ুপ্রবাহের নিয়ামক সমূহ কি কি?
৩. বায়ু প্রবাহের কয়েকটি ধরন কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বায়ু প্রবাহের নিয়ামকগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
২. বায়ু প্রবাহের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.২০ : বায়ুপ্রবাহ ঃ নিয়ত (Wind : Planetary)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-
◈ বায়ু কেন প্রবাহিত হয়?
◈ বায়ু প্রবাহের ধরন, নিয়ত বায়ু,
◈ সাময়িক বায়ু সম্পর্কে।

## বায়ুপ্রবাহ (Winds)

স্থানীয় বায়ুচাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহ হয়। ব্যাপ্তি ও স্থানীয় কালের উপর নির্ভর করে বায়ু প্রবাহ কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন,

১. নিয়তবায়ু
২. সাময়িকবায়ু
৩. স্থানীয় বায়ু
৪. স্থানীয় ধ্বংসাত্নক বায়ুপ্রবাহ।

## নিয়তবায়ু (Planetary winds)

নিয়তবায়ু পৃথিবীর চাপবলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারাবছর একই দিকে প্রবাহিত হয়; অয়নবায়ু, পশ্চিমবায়ু ও মেরুবায়ু এর উদাহরন।

## অয়নবায়ু (Trade wind)

বিষুবীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ওপরে চাপ কম থাকে ফলে বায়ু ছড়িয়ে পড়তে পারে। বায়ু তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে শীতল হয়। নিচের ক্রমাগত উচ্চচাপের বায়ু প্রবাহের ফলে এ শীতল বায়ু নীচে নামতে পারে না তাই বায়ুর উপর স্তর দিয়ে এটি মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ৩০° অক্ষাংশ বরাবর উভয় গোলার্ধেই এ ভারী বায়ু নিম্নমুখী প্রবাহ হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে পুনরায় বিষুব রেখা মুখে প্রবাহিত হয়। এভাবে বায়ুর নিম্ন ও উচ্চ স্তর জুড়ে একটি অদৃশ্য বায়ু কোষের সৃষ্টি হয়। এ অদৃশ্য বায়ু কোষ আবিষ্কারকের নামানুযায়ী হ্যাডলী কোষ (Hadley Cell) বলা হয়। উত্তর গোলার্ধে এ প্রবাহ উত্তরায়ন ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণায়ন নামে পরিচিত। কোরিওলিস (Coriolis) প্রভাবের ফলে ফেরেলের সুত্রানুযায়ী অয়নবায়ু দক্ষিণ পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে উত্তর পূর্বায়ন (North-East Trades) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ পূর্বায়ন (South East Trades) বায়ু প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় (চিত্র- ৩.২০.১)। ৩০° অক্ষাংশে সর্বদা উচ্চচাপ সম্পন্ন বায়ু প্রবাহ হয়, যা মেঘমুক্ত উষ্ণ ও শুষ্ক, ফলে মরুময় জলবায়ুর সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ মরুগুলো ৩০° অক্ষাংশের কাছাকাছি অবস্থিত। যেমন, উত্তর গোলার্ধে সাহারা, আরব, লিবিয়া, থর ও দক্ষিণ গোলার্ধে কালাহারি মরুভূমি।

পৃথিবীর চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নিয়তবায়ু সারাবছর একই দিকে প্রবাহিত হয়।

উত্তর পূর্বায়ন বায়ু ও দক্ষিণ পূর্বায়ন বায়ু বিষুবরেখার কাছাকাছি মিলিত হয়ে ট্রপোমন্ডলে যায়। এ মিলিত অঞ্চলকে আই.টি.সি. জেড বলে।

উত্তর পূর্বায়ন বায়ু ও দক্ষিণ পূর্বায়ন বায়ু বিষুব রেখার কাছাকাছি মিলিত হয়ে উর্ধ্বাকাশে ট্রপোমন্ডলে (Troposphere) উঠে যায়। বায়ু প্রবাহদ্বয়ের এ মিলন অঞ্চলকে আন্তক্রান্তীয় মিলন অঞ্চল (Intertropical Convergence Zone) বা সংক্ষেপে আই.টি.সি.জেড (ITCZ) বলে। নিম্নচাপ অঞ্চলে, বিষুবীয় সীমানায় অনেক সময় অয়নবায়ুদ্বয় মিলিত অবস্থায় আসে না। তখন শান্ত ও ইতস্ত বায়ু প্রবাহের একটি অবস্থা তৈরী হয় যাকে বলা হয় শান্তবলয় (Doldrums)। নাবিকেরা

এ অবস্থানকে জাহাজ চলাচলের অসুবিধার জন্য এড়িয়ে চলে। আই টি সি ঋতু পরিবর্তনের সাথে কিছুটা উত্তরে বা দক্ষিণে সমোষ্ণ রেখার পরিবর্তনের সমান্তরালে স্থান পরিবর্তন করে।

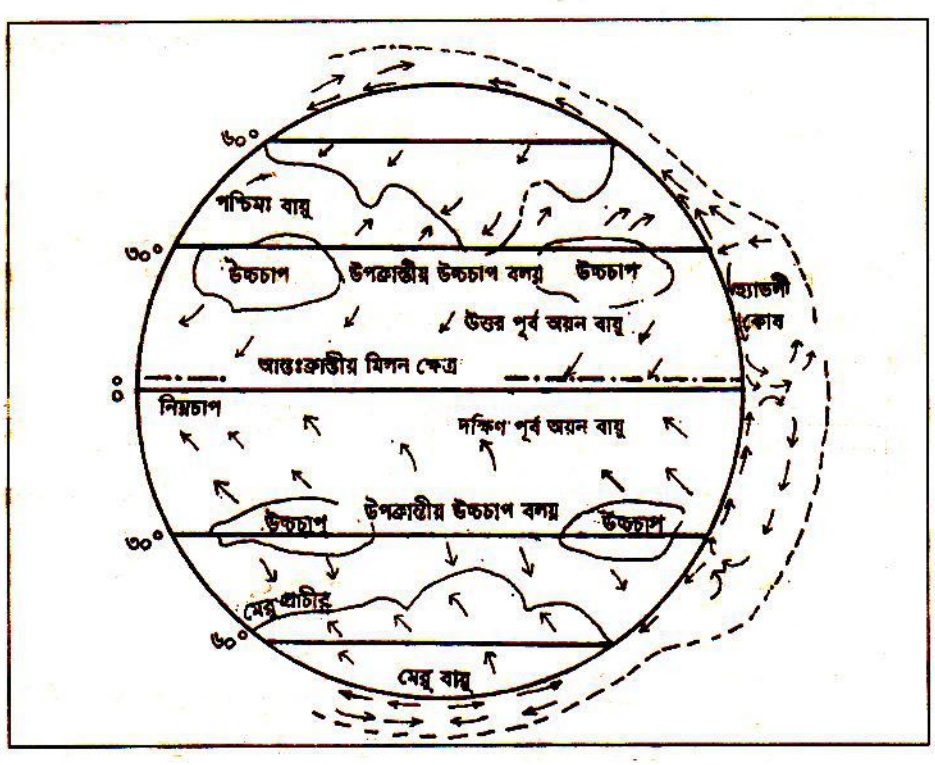


শান্ত বলয়।

চিত্র ৩.২০.১ : অয়নবায়ু, উত্তর পূর্বায়ন ও দক্ষিণ পূর্বায়ন বায়ুপ্রবাহ।

মধ্য-উপক্রান্তীয় অশ্ব অঞ্চল।

২৫° থেকে ৪০° অক্ষাংশে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপের বায়ু যেখান দিয়ে উচ্চচাপে (Antcicyclone) কোষ গঠন করে ফিরে আসে, সে অঞ্চলকে মধ্য-উপক্রান্তীয় অশ্ব অঞ্চল (Horse latitudes) বলে।

*অয়নবায়ু কাকে বলে?*

## পশ্চিমা বায়ু (Westerlies)

৩৫° থেকে ৬০° অক্ষাংশের মাঝে উভয় গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও হালকা বায়ু প্রবাহিত হয়ে মেরু অভিমুখে গমন করে। এ বায়ুকে পশ্চিমা বায়ু বলে (চিত্র ৩.১৭.২)। উত্তর গোলার্ধে এ বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের আধিক্যের জন্য বায়ু প্রবাহ ইতস্ত ও স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন গতির হলেও গড় গতি দক্ষিণ পশ্চিমেই হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবাহ মোটামুটি নিয়ত। দক্ষিণ গোলার্ধে এ প্রবাহ ৪০° থেকে ৬০° অক্ষাংশে সর্বাধিক। এ অঞ্চলকে বলা হয় 'গর্জনশীল চল্লিশা' (Roaring Forties), 'উন্মত্ত পঞ্চাশ' (Furious Fifties) এবং 'শাণিত ষাট' (Screaming Sixties)।

৩৫ক্ষ থেকে ৬০ক্ষ অক্ষাংশের মাঝে উভয় গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও হালকা বায়ু প্রবাহিত হয়ে মেরু অভিমুখে যায় তাকে পশ্চিমা বায়ু বলে।

*পশ্চিমা বায়ু কাকে বলে?*

## মেরু দেশীয় পূবালী বায়ু (Polar Easterlies)

পশ্চিমা বায়ুর প্রবাহ ৬০° অক্ষাংশে উর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত হয়ে মেরুগামী হয়। এ বায়ু আবার শীতল ও ভারী হয়ে নিচে নেমে ভূ-পৃষ্ঠ ঘেষে ৬০° অক্ষাংশের দিকে ধাবিত হয়। উত্তর গোলার্ধে উত্তরপূর্ব দিক হতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়, তাদেরকে যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু বায়ু বলে।

*মেরুদেশীয় পূবালী বায়ু কাকে বলে?*

## সাময়িক বায়ু (Periodical Winds)

**মৌসুমী বায়ুঃ** মৌসুমী বায়ু সাময়িক বায়ুর অন্তর্ভূক্ত। আরবী ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। এ বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর দিক পরিবর্তন হয়। মৌসুমী বায়ু একটি আঞ্চলিক বায়ু। এই বায়ু প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ায় দেখা যায়। তাছাড়া উত্তর অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার কিছু অংশ, চিলি, স্পেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

*ঋতু পরিবর্তনের সাথে মৌসুমী বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয়।*

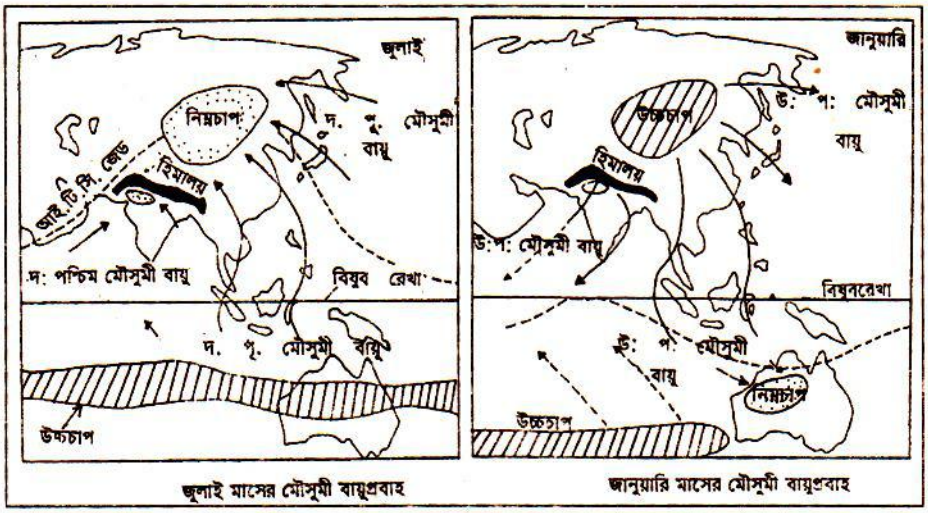


চিত্র ৩.২০.২ : মৌসুমী বায়ু ক. জুলাই মাসের প্রবাহ খ. জানুয়ারী মাসের প্রবাহ।

**এশিয়ার মৌসুমী বায়ুঃ** এশিয়ার জুলাই ও জানুয়ারী মাসের মৌসুমী বায়ুর একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

*মৌসুমী বায়ুর বৈশিষ্ট্য কি?*

জুলাই মাসের বৈশিষ্ট্য (চিত্র ৩.২০.২): জুলাই মাসে মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা পার্শ্ববর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার ও নিকটবর্তী সাগরের চেয়ে অনেক বেশি থাকে।

১. এশিয়ার ওপর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। একই সময়ে ভারত-পাকিস্তানের থর মরুভূমিকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব এলাকায় আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

*ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি।*

২. অস্ট্রেলিয়ায় শীতকাল এবং উত্তরাংশে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।

৩. অস্ট্রেলিয়ার উচ্চচাপ বলয় থেকে এশিয়ার নিম্নচাপ বলয় অভিমুখী বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পর ডান দিকে বেঁকে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়। এটি যতই উত্তরে অগ্রসর হয় ততই এশিয়ার নিম্নচাপের (Anticlockwise circulation)

*এশিয়ার নিম্নচাপের বামাবর্ত সঞ্চালন।*

বামাবর্ত সঞ্চালন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে এ বায়ু জাপান ও ইন্দোচীন বরাবর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবহিত হয়।

৪. উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের বায়ু দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে নিরক্ষীয় বলয় অতিক্রম করে ভারতীয় নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু নিরক্ষীয় বলয় অতিক্রম করার পর কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে ডান দিকে বেকে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ভারত-শ্রীলংকা-মায়ানমারের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গোপসাগরে পৌঁছার পর এ বায়ু ভারতীয় নিম্নচাপের বামাবর্ত বায়ুর আওতায় আসে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তরাংশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে পাঞ্জাব অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

*কোরিওলিস শক্তি।*

জানুয়ারী মাসের বৈশিষ্ট্য (চিত্র ৩.২০.২) : শীতকালের মাঝামাঝি, মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা খুব কমে যায়। ফলে এই অঞ্চলে এ সময় উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় পূর্ব ও দক্ষিণ সাগরের ওপর উষ্ণতা বেশি থাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

*মধ্য এশিয়া ও পাঞ্জাব।*

১. মধ্য এশিয়া ও পাঞ্জাবে প্রবল উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। হিমালয় বায়ু দ্বারা উভয় বায়ু পৃথক থাকে।

২. অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল এবং এর উত্তরাংশে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

*ডান দিকে বেঁকে যায়।*

৩. এশিয়ার উচ্চচাপ অংশ থেকে বায়ু অস্ট্রেলিয়ার প্রবল নিম্নচাপ অভিমুখে প্রবাহিত হয়। জাপান ও উত্তর চীনের ওপর দিয়ে এ বায়ু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বায়ু কোরিওলিস শক্তির প্রভাবের জন্যে ডান দিকে বেঁকে যায়; ফলে বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। এ ভাবে নিরক্ষীয় বলয়ে পৌঁছবার পর তা আবার বামে সরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হতে থাকে।

*উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ।*

৪. পাঞ্জাবে উচ্চচাপ অংশের বায়ু উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকে নিরক্ষীয় বলয়ে এসে পৌঁছে। নিরক্ষীয় বলয়ে এ বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধের উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ অংশ থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়।

## দক্ষিণ এশিয়ার মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব

*দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কৃষিপণ্যের উৎপাদন মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। তাই সার্বিকভাবে কৃষিকাজকে মৌসুমী বায়ুর জুয়াখেলা বলা হয়।*

দক্ষিণ এশিয়ার আওতাভূক্ত বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের কৃষিভিত্তিক দেশের জন্য বর্ষাকালীন (জুলাই-আগস্ট) মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সব দেশের কৃষি পন্য যেমন, ধান, পাট, চা ও ইক্ষুর উৎপাদন বহুলাংশে এ মৌসুমী বায়ুজনিত বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালীন মৌসুমী বায়ুর সময়মত আগমন ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃষ্টিপাত এ সব কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্রগ্রাম উপকুলে পহেলা জুনে মৌসুমী জনিত বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং পরবর্তি ১ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের আওতায় চলে আসে। এ উপমহাদেশের কৃষি ফসল পঞ্জি (Crop Calender) বর্ষাকালীন এ মৌসুমী বৃষ্টির আগমন ও প্রস্থানের সঙ্গে সমন্বিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বর্ষা শুরু হলে অকাল বন্যা দেখা দেয়, তাতে বাংলাদেশের বোরো ও আউস ধান তলিয়ে যায় এবং চৈতালী ফসলের (যেমন মরিচ, তিল, কাউন) ব্যাপক ক্ষতি হয়। আবার বৃষ্টি দেরীতে শুরু হলে খরায় পুড়ে যায় অথবা ফলন খুব কমে যায়, পানির অভাবে রোপা ধান লাগানো যায় না অথবা লাগানো রোপা ধান শুকিয়ে যায়। চা, পাট ও ইক্ষুর ফলন কমে যায়।

*এশিয়ার মৌসুমী বায়ুর প্রভাব কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

স্থানীয় বায়ুচাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহ হয়। ব্যাপ্তি ও স্থানীয় কালের উপর নির্ভর করে বায়ু প্রবাহ কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন, নিয়তবায়ু, সাময়িকবায়ু, স্থানীয় বায়ু, স্থানীয় ধ্বংসাত্নক বায়ুপ্রবাহ। আজকের আলোচনায় নিয়তবায়ু সম্পর্কে আমরা জেনেছি। নিয়তবায়ুর কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে- অয়নবায়ু, পশ্চিমাবায়ু ও মেরুবায়ু। পৃথিবীর চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নিয়তবায়ু সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয়। ৩০° অক্ষাংশে অয়নবায়ু এবং ৩৫° থেকে ৬০° অক্ষাংশে পশ্চিমা বায়ু এবং ৬০° অক্ষাংশের উপরে মেরুবায়ু দেখা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২০

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ নিয়ত বায়ুর উদাহরণ নয়-
ক. অয়ন বায়ু খ. মৌসুমী বায়ু
গ. পশ্চিমা বায়ু ঘ. মেরু বায়ু

১.২ সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয়-
ক. স্থানীয় বায়ু খ. ঘূর্ণী বায়ু
গ. নিয়ত বায়ু ঘ. গরম বায়ু

১.৩ অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়-
ক. ১০° অক্ষাংশ খ. ২০° অক্ষাংশ
গ. ৩০° অক্ষাংশ ঘ. ৬০° অক্ষাংশ

১.৪ গর্জনশীল চল্লিশা অবস্থিত-
ক. অশ্ব অঞ্চলে খ. পশ্চিমা বায়ুতে
গ. সাময়িক বায়ুতে ঘ. অষ্ট্রেলিয়ায়

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (৩X২=৬ মিনিট) ঃ

১. অয়ন বায়ু কাকে বলে?
২. মৌসুমী বায়ুর বৈশিষ্ট্য কি?
৩. Horse Latitute কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বায়ু প্রবাহ কেন হয়? নিয়ত বায়ু প্রবাহ বর্ণনা করুন।
২. বায়ু প্রবাহ ব্যাপ্তি ও স্থানীয় কালের উপর ভিত্তি করে কত প্রকার এবং সাময়িক বায়ু বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.২১ : বায়ুপ্রবাহ ঃ স্থানীয় (Winds : Local)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ সাময়িক বায়ু: ঘুর্ণিঝড় ও মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি, দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু ও আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাব;
- ◈ বায়ুপ্রবাহ কিভাবে পরিমাপ করা হয়;
- ◈ বায়ু শক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে।

## স্থানীয় বায়ু (Local Winds)

*নিয়মিত ও অনিয়মিত ভিত্তিতে।*

নিয়মিত ও অনিয়মিত ভিত্তিতে এ সমস্ত বায়ু পুরোপুরি স্থানীয় ভাবে সৃষ্টি হয়। এ বায়ুর প্রভাবাধীন এলাকা সীমিত এবং ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও এ সব বায়ু প্রবাহের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা স্থানীয় আবহাওয়ার বেশ গুরুত্বপূর্ন। তবে, প্রধান বায়ু প্রবাহের এ সমস্ত বায়ুর তেমন প্রভাব নেই। পৃথিবীতে প্রায় কয়েকশ স্থানীয় বায়ু প্রবাহ আছে, যা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:

ক. সমুদ্র ও স্থল বায়ু;
খ. উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু এবং
গ. শুষ্ক তাপীয় স্তুপমেঘ পরিচলন বায়ু।

## সমুদ্র ও স্থল বায়ু (Land and Sea Breeze)

*সমুদ্র ও স্থলবায়ু স্থানীয় বায়ুর প্রকারভেদ। বিকেলে সমুদ্রবায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়।*

উপকূলে সকালের সূর্যতাপ স্থানীয় ভূমির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় ফলে নিকটস্থ সমুদ্রের ভারি বায়ু ভূমির দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৩.২১.১), একে সমুদ্র বায়ু বলে। বিকালে এ বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়। সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের চেয়ে স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়ে যায়। তখন স্থলভাগের শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, একে স্থলবায়ু বলে।

*স্থানীয় বায়ু কাকে বলে?*

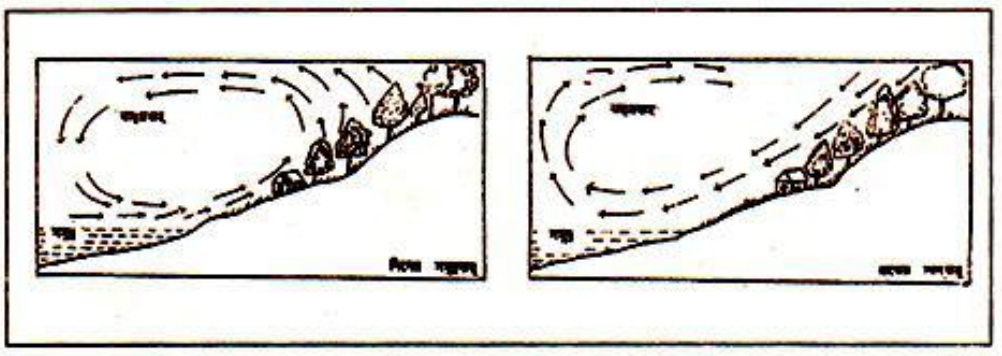

চিত্র ৩.২১.১ : সমুদ্র বায়ু ও স্থলবায়ু

## উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু (Valley and Mountain Breezes)

*স্থল ও সমুদ্র বায়ুর ন্যায়।*

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এ বায়ু স্থল ও সমুদ্র বায়ুর ন্যায়। সাধারনত: উপত্যকায় বায়ু পার্বত্য বায়ুর চেয়ে দুর্বল। দিবাভাগে উপত্যকা বায়ু সৌরতাপে উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু উঁচু পর্বতে/পাহাড়ে বাঁধা পাওয়ায় পাশে যেতে না পেরে ওপরে উঠে যায়। এ সময় পর্বতের উপরের শীতল ও ভারী বায়ু

সরাসরি নীচে উপত্যকার দিকে নেমে আসে। রাত্রে উপত্যকার উভয় ঢাল, সমতলের (Valley floor) চেয়ে বেশি শীতল হয়ে যায়। এ সময় ঢালের শীতল বায়ু সমতলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহা মৃদু বায়ু নামে পরিচিত (চিত্র-৩.২১.২)।

*মৃদু বায়ু।*

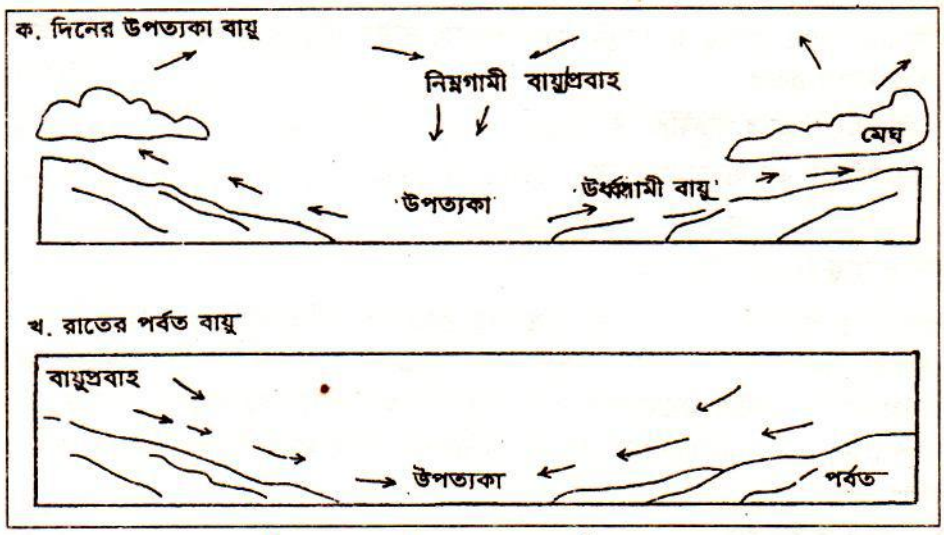


চিত্র ৩.২১.২ : উপত্যকা বায়ু ও পার্বত্য মৃদুবায়ু

*সারণি ৩.২১.১ : পৃথিবীর কিছু স্থানীয় বায়ু ও এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য*

| স্থানীয় বায়ুর নাম | ভৌগোলিক অবস্থান | উৎপত্তি কাল | বায়ুর বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| চিনুক | যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বত এলাকার মাঝামাঝি | শীতকাল | উষ্ণ স্থলভাগে সৃষ্ট |
| সান্তাআনা | ক্যালিফোর্নিয়া | শীতকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) | উষ্ণ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রগামী |
| প্যাম্পোরা | আর্জেন্টিনা | গ্রীষ্মকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) | শীতল, নিম্নচাপ সৃষ্ট |
| জেনেভা | আর্জেন্টিনা | গ্রীষ্মকাল | উষ্ণ, নিম্নচাপ সৃষ্ট |
| লেভিচি | স্পেন | বসন্তকাল | উষ্ণ |
| সিরোক্কা | সাহারা-লিবিয়া | বসন্তকাল | উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র |
| চিলি | তিউনিসিয়া | বসন্তকাল | উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র |
| খামসিন | মিসর | বসন্তকাল | উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র |
| ব্রিকফিল্ডার | অস্ট্রেলিয়া (ভিক্টোরিয়া) | গ্রীষ্মকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) | উষ্ণ, স্থল-স্থল |
| মিস্ট্রাল | দঃ ফ্রান্স (ভূমধ্যসাগরীয় উপকুল) | শীতকাল | শীতল, স্থল-সমুদ্রগামী |
| ফন | সুইজারল্যান্ড | শীতকাল | উষ্ণ, সমুদ্র-স্থলগামী |
| বোরো | আড্রিয়াটিক এলাকা | শীতকাল | শীতল, স্থল-সমুদ্রগামী |

## স্থানীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বায়ু

*ঘূর্ণিঝড় ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড় স্থানীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বায়ু বা পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।*

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) ও প্রতীপ ঘুর্ণিঝড় এ ধরনের বায়ুর উদাহরণ। পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ঘূর্ণিঝড় ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় একটি অতি পরিচিত শব্দ, কারণ প্রতিবছরই সাধারণত মার্চ ও নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

*সমচাপ রেখা, ঘূর্ণিঝড়ের চোখ, জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু।*

১. ঘূর্ণিঝড় প্রবল নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট হয়। এ নিম্নচাপ অবস্থানের সমচাপ রেখাসমূহের অবক্রম অত্যন্ত খাড়া এবং তা বৃত্তাকার রূপ নেয়।
২. উত্তর গোলার্ধে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বামাবর্তে কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং প্রচন্ড শক্তিতে বায়ু আবর্তের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়ু আবর্তের কেন্দ্রকে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলে।
৩. দ্রুত উর্ধ্বগামী বায়ু জলীয় বাস্পপূর্ণ থাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহা প্রচন্ড শক্তিতে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে, ফলে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে এবং সম্পদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

## ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি

*উত্তর ও দক্ষিণ আয়নবায়ুর মিলিত বায়ুপুঞ্জ থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।*

উত্তর ও দক্ষিণ আয়নবায়ুর বয়ে আনা বায়ুপুঞ্জ (Air mass) যেখানে মিলিত হয় সেখানেই এ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এটি সাধারনত আন্তঃক্রান্তীয় এলাকাতেই সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের ওপর সৃষ্টি হয়, কারণ বায়ুপুঞ্জ সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে আসায় এর বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র নিম্নস্তর বিশিষ্ট থাকে। কিন্তু এর ওপরের বায়ুস্তর শীতল ও শুষ্ক। যখন এ ধরনের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের বায়ুস্তর মুখোমুখি হয় তখন একটি স্তর অপর স্তরের ওপরে উঠে যায় (চিত্র ৩.২১.৩)। এ উর্ধ্বগামী বায়ু দ্রুত শীতল হয় এবং এর আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ঘনীভবনের ফলে যে সুপ্ততাপ মুক্ত হয় তা ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণনের শক্তি যোগায়। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সাধারণত পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। ভূমিতে পৌঁছাবার পর উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘূর্ণীঝড় দূর্বল হয়ে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পিছনে তিনটি শর্ত কাজ করে:

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট পর্যাপ্ত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু।
২. বায়ু ভিতরের দিকে প্রবাহিত হবে এবং দ্রুত উর্ধ্বগামী হয়ে খাড়া মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করে যা মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
৩. উর্ধ্বস্তরে বায়ু বর্হিগামী হবে।

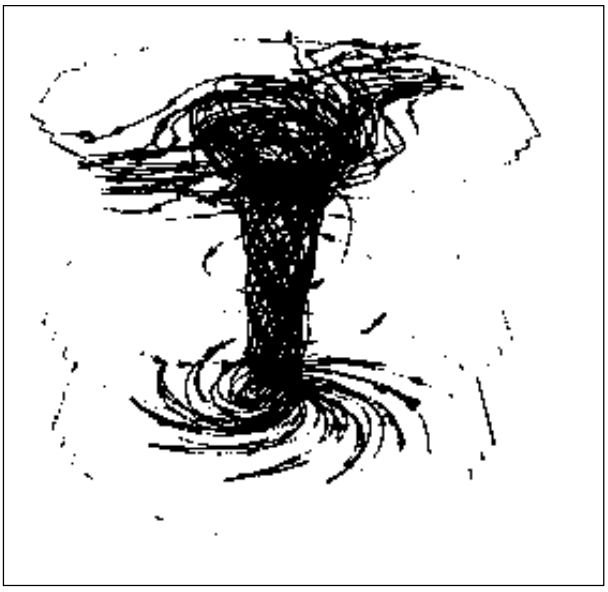

চিত্র ৩.২১.৩ : ঘূর্ণীঝড়ের গঠন কাঠামোতে কেন্দ্রভাগ শান্ত, উভয় পার্শ্বভাগ ঘন উর্ধ্বগামী বায়ু প্রবাহ ফানেল আকৃতি ধারণ করে।

**ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়া**

*শান্তবায়ু, অগ্রবর্তী অংশ, মূল অংশ, ঘূর্ণিঝড়ের চোখ, পশ্চাৎভাগ।*

১. ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আগে বায়ু শান্ত থাকে, বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বেশী হয়।

২. ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রবর্তী অংশ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন মেঘ দেখা দেয়।

৩. অতঃপর ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশ আসার ফলে প্রবল ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে এবং প্রায়শ: তা ঘন্টায় ২৪০ কিলোমিটারের বেশী বেগে প্রবাহিত হতে পারে। এ সময় ঘণ মেঘে আকাশ ছেয়ে থাকে এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতে থাকে।

৪. ঘূর্ণিঝড়ের চোখ আসার পর শান্ত অবস্থা ফিরে আসে।

৫. ঘূর্ণীঝড়ের পশ্চাৎভাগ পৌঁছানোর পর পুনরায় ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে, ঘণ মেঘ ও প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়। এ পর্যায়ে বায়ু অগ্রবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

*টর্ণেডোর সৃষ্টি হয় স্থলভাগে যা ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। তবে এটি মাত্র কয়েকশ মিটার প্রশস্থ হয়।*

**টর্নেডো** (Tornado)**:** ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে টর্নেডোর পার্থক্য হল ইহা স্থলভাগে সৃষ্টি হয়। টর্নেডো ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক, কারণ এটি ঘন্টায় ৩২০ কিলোমিটারের বেশী বেগে প্রবাহিত হতে পারে। তবে, সৌভাগ্যবশত টর্নেডো মাত্র কয়েকশ মিটার প্রশস্ত হয়ে বয়ে যায়। বাংলাদেশের এপ্রিল-মে মাসে প্রায়শই টর্নেডো ঘটে থাকে।

*ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো কিভাবে সৃষ্টি হয়?*

## বায়ু প্রবাহ পরিমাপ (Wind Measurement)

বায়ু প্রবাহ পরিমাপে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

**১.** বায়ুপ্রবাহ দিক (Direction) ও

**২.** প্রবাহ মাত্রা বা গতি (Speed)।

জলবায়ু বা আবহাওয়া বিশ্লেষনে বায়ু প্রবাহের দিক ও গতির ভূমিকা লক্ষ্যনীয়। বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সেই দিকের নামে অভিহিত (Labelled) করা হয়।

## বায়ুপ্রবাহ দিক (Direction)

*বাতপতাকা নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয় করা হয়।*

বায়ু প্রবাহের দিক প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় হয় তাকে বাতপতাকা (Wind Vane) বলে। এ যন্ত্রে একটি মুক্ত ভাবে ঘূর্ণনক্ষম বাহু থাকে যার এক মাথা সূঁচালু ও অন্য মাথা মাছের লেজের মত চ্যাপটা থাকে। যন্ত্রটিকে একটি অনড় চাকতির (Dial) উপর বসানো থাকে, চাকতির উপর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এবং কোণের পরিমাপ ডিগ্রীতে সূচিত থাকে। বায়ু প্রবাহিত হলে বাহু বা শলাকাটির প্রবাহের তাড়নায় ঘুরে গিয়ে এক সময় স্থির হয়। স্থির অবস্থায় বা যে কোন সময় শলাকার তীক্ষ্ণ দিক নির্দেশকারী সূচক থেকে চাকতির পাঠ লিপিবদ্ধ করা হয় যা বায়ু প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।

## প্রবাহমাত্রা/গতি নির্নয় (Determination of Wind Speed)

বায়ুর গতি নির্ণয়ের জন্য সাধারণত কাপ অ্যানিমোমিটার (Cup Anemometer) ব্যবহার হয়। গতি পরিমাপ হয় স্পীডো মিটারের মত একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে। এ কাপ অ্যানিমোমিটারে মুক্তভাবে ঘূর্ণনক্ষম বাহুতে তিন বা ততোধিক (৩/৪টি) বাটি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। বায়ু সঞ্চালনের সাথে বাটি গুলোর প্রভাবে যন্ত্রের বাহু ঘুরতে থাকে। প্রবাহের বেগ বেশী হলে বাটির ঘূর্ণনও দ্রুততর হয়। এ ঘূর্ণনমাত্রা স্পীডো মিটারের মত যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়, বায়ুর গতি সাধারনত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় প্রকাশ করা হয়।

বায়ুর গতি নির্ণয় করা হয় কাপ এনিমোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে।

*বায়ু প্রবাহ কিভাবে পরিমাপ করা হয়?*

## বায়ু শক্তি (Wind Energy)

দূষণমুক্ত শক্তির উৎস মূলতঃ অপ্রতুল বা নেই বললেই চলে। অথচ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হলে জীবজগৎ হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই বায়ু প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময় ব্যাপক ভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। বিশালকৃতির টারবাইন প্রস্তুত করে বায়ু শক্তিকে ব্যবহার উপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া কার্যকর ভাবে গ্রহন করে পৃথিবীর অনেক স্থানেই শক্তির সাশ্রয় করা হচ্ছে।

বর্তমান শক্তির উৎস হিসেবে গৃহীত সকল মাধ্যমেই পরিবেশ দূষণকারী হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রেক্ষিতে বায়ু হতে পারে দূষণমুক্ত শক্তির উৎস।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের বিশাল টারবাইন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বায়ু প্রবাহ সুষম ও অবিরাম হলে বায়ু শক্তির ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ ও নিশ্চিত করা সম্ভব।

*বায়ু শক্তিকে কিভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায়?*

## পাঠ সংক্ষেপ

বায়ুচাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু প্রবাহের ব্যাপ্তি ও স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে ৪ ধরনের প্রবাহ হতে পারে। যথা: নিয়তবায়ু, সাময়িকবায়ু, স্থানীয়বায়ু ও স্থানীয় ধ্বংসাত্বক বায়ু প্রবাহ। আজকের পাঠে সাময়িক বায়ু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মৌসুমী বায়ু, সাময়িক বায়ুর অন্যতম উদাহরণ। পৃথিবীতে প্রায় কয়েকশত স্থানীয় বায়ু প্রবাহ আছে যা প্রধান তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত। যথাঃ সমুদ্র ও স্থল বায়ু, উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু এবং শুষ্ক তাপীয় স্তুপমেঘ পরিচলন বায়ু।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২১

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলে-

ক. যে দিকে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয় তাকে খ. কিছু নেই

গ. বায়ু আবর্তের কেন্দ্রকে ঘ. ঘূর্ণিঝড়ের সময় বৃষ্টির ফোঁটাকে

১.২ প্যাম্পোরো হচ্ছে -

ক. অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ খ. আর্জেন্টিনার সাময়িক বায়ু

গ. অস্ট্রেলিয়ার নিয়ত বায়ুপ্রবাহ ঘ. আর্জেন্টিনার স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ

১.৩ মৃদু বায়ু দেখা যায় -

ক. নদীতে খ. প্লেনে

গ. পর্বতে ঘ. বাজারে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (৬ মিনিট) ঃ

১. স্থানীয় বায়ু কি কি?

২. ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো কিভাবে সৃষ্টি হয়?

৩. পৃথিবীর প্রধান তিন শ্রেণীর বায়ু প্রবাহ কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. স্থানীয়বায়ু কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. স্থানীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বায়ু সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

৩. বায়ু প্রবাহ পরিমাপ পদ্ধতি এবংবায়ুশক্তি সম্পর্কেলিখুন।

## পাঠ ৩.২২ : বায়ুর আর্দ্রতা ঃ সাধারণ আলোচনা (Humidity: General Dicussion)

এ পাঠ শেষে যা জানবেন-

◈ আর্দ্রতা ও বায়ুর জলীয় বাস্প ধারণ ক্ষমতা কিরূপ;

◈ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তুল্য আর্দ্রতা বলতে কি বুঝায়;

◈ তুল্য আর্দ্রতার পরিমাপ কিভাবে কি যন্ত্র দিয়ে করতে হয় এবং কিভাবে পাঠ নিতে হয়।

### আর্দ্রতা (Humidity)

*বায়ুর জলীয় বাস্প ধারণক্ষমতা চাপ ও তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।*

আর্দ্রতা শব্দটি বায়ুতে জলীয় বাস্পের উপস্থিতির পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বায়ুতে অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় জলীয় বাস্পের পরিমাণ অতি নগন্য, আয়তন হিসাবে যা শূন্য থেকে শতকরা চার ভাগের ও কম হয়ে থাকে, কিন্তু আবহাওয়া তথা জলবায়ুতে এ সামান্য পরিমাণ জলীয় কণার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনের বায়ুতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয় বাস্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয় বাস্পের উপস্থিতিকে সম্পৃক্ত (Saturation) অবস্থা বলে। জলীয়বাস্পজনিত বায়ুচাপ জলীয়বাস্পচাপ নামে পরিচিত।

*আর্দ্রতা কাকে বলে?*

বায়ুর জলীয়বাস্প ধারণক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন,

১. চাপবৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়;

২. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়।

স্বাভাবিক চাপে বায়ুর জলীয় বাস্প ধারণ ক্ষমতা নিম্ন সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

*সারণি ৩.২২.১ ঃ তাপমাত্রার সাথে বায়ুর জলীয়বাস্প ধারণ ক্ষমতার তুলনা।*

| তাপমাত্রা (°সে) | জলীয়বাস্প (গ্রাম/কেজিতে) | তাপমাত্রা (°সে) | জলীয়বাস্প (গ্রাম/কেজিতে) |
|---|---|---|---|
| -৪০ | ০.১ | ১৫ | ১০.০ |
| -৩০ | ০.৩ | ২০ | ১৪.০ |
| -২০ | ০.৭৫ | ২৫ | ২০.০ |
| -১০ | ২.০ | ৩০ | ২৬.০ |
| ০ | ৩.৫ | ৩৫ | ৩৫.০ |
| ৫ | ৫.০ | ৪০ | ৪৭ |
| ১০ | ৭.০ | | |

বাতাসের আর্দ্রতার সংখ্যাতাত্ত্বিক (Quantitative) মানে প্রকাশের কয়েকটি পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

১. চরম আর্দ্রতা (Absolute Humidity)

২. তুল্য আর্দ্রতা (Relative Humidity)

## আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Specific Humidity)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে কোনো সময়ে যে পরিমাণ জলীয়বাস্প আছে তার পরিমাণ। এ মান একক আয়তনের বায়ুর মধ্যে উপস্থিত জলীয় বাস্পের পরিমাণকে বুঝায়। যেমন, গ্রাম/কিলোগ্রাম, অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম বায়ুতে এক গ্রাম জলীয় বাস্প আছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ওজনের তুলনা বলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাস্পের উপস্থিতিতে এর মান চাপ বা তাপমাত্রা কোনটির পরিবর্তনেই পরিবর্তিত হয় না। তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর জলীয় বাস্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান জলীয় বাস্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়।

*নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে কোন সময় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাস্প আছে, তার পরিমাণকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।*

*আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে?*

## তুল্য আর্দ্রতা (Relative Humidity)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বায়ুস্থ জলীয় বাস্প এবং ঐ তাপমাত্রায় জলীয় বাস্প সম্পৃক্তির জন্য যে পরিমাণ জলীয় বাস্প থাকতে পারে তার অনুপাতকে তুল্য আর্দ্রতা বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২৫° সে. তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত ১ কিলোগ্রাম বায়ুতে ২০ গ্রাম জলীয় বাস্প থাকে। যদি কোন এক সময়ে বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাস্পের পরিমাণ ১০ গ্রাম হয় তবে সেই সময়ের তুল্য আর্দ্রতা হবে ১০/২০ বা ৫০ শতাংশ। ১০০ ভাগ তুল্য আর্দ্রতার অর্থ হচ্ছে বায়ু জলীয় বাস্পে সম্পৃক্ত হয়েছে। তুল্য আর্দ্রতার পরিবর্তন হয় দুটি কারণে-

*নির্দিষ্ট তাপে বায়ুস্থ জলীয় বাস্প এবং ঐ তাপমাত্রায় জলীয় বাস্প সম্পৃক্তির জন্য যে পরিমাণ জলীয় বাস্প থাকতে পারে তার অনুপাতকে তুল্য আর্দ্রতা বলা হয়।*

১. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুতে জলীয় বাস্প যোগ হলে তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়,

২. যখন জলীয় বাস্পের উপস্থিতি নির্দিষ্ট পরিমাণে হয় তখন তাপমাত্রা কমলে তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। আবার, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তুল্য আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

তুল্য আর্দ্রতার সাথে শিশিরাঙ্ক (Dew point) সম্পর্কযুক্ত। যে তাপমাত্রায় বায়ু জলীয়বাস্পে সম্পৃক্ত হয় তা শিশিরাঙ্ক নামে পরিচিত। অর্থাৎ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাস্প দ্বারা ঐ বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে হলে যে তাপমাত্রা পর্যন্ত শীতল করা প্রয়োজন সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক বলে। শিশিরাংকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বায়ুস্থ জলীয় বাস্প শিশির হিসাবে জমতে শুরু করে।

*তুল্য আর্দ্রতা কি?*

## আর্দ্রতার পরিমাপ (Humidity Measurement)

আর্দ্রতার পরিমাপে সাধারণত তুল্য আর্দ্রতাই পরিমাপ করা হয়। তুল্য আর্দ্রতার পরিমাপ তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপের দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

ক. সাইক্রোমিটার (Psychrometer)

খ. হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)

## সাইক্রোমিটার

সাইক্রোমিটারের সাহায্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য এ যন্ত্রে দুটি স্বাভাবিক থার্মোমিটার কাছাকাছি অবস্থানে সংযুক্ত থাকে। থার্মোমিটার দুটির একটি শুষ্কভাল্ব (Dry bulb) বা মুক্ত বায়ুতে থাকে। অন্যটি পারদাধার বা বাল্বটি একটি সুক্ষ্ম সুতা দ্বারা তৈরী কাপড়ে আবৃত (Muslin wick) থাকে যার অপর প্রান্ত পানি পূর্ণ অবস্থানে থাকে; একে ভেজা বাল্ব (Wet bulb) বলে। বাল্বটিতে ক্রমাগত বায়ু প্রবাহ বা যন্ত্রটি ঘুর্ণনের ফলে পানি বাস্পীভূত হয়। বাস্পীভূত হতে পানি কিছুটা তাপ হারায় যা সিক্তবালু থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভ সংকুচিত করে, এ অবস্থায় থার্মোমিটারদ্বয়ের

*সাইক্রোমিটারের সাহায্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায়।*

*সিক্ত বালু ও শুষ্কবালু থার্মোমিটার।*

তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করা হয়। শুষ্কবালু থার্মোমিটার বায়ুর তাপমাত্রা নির্দেশ করে (চিত্র ৩.২২.১)। পানি বাস্পীভূত হতে কি পরিমাণ তাপ প্রয়োজন তা নির্ভর করে বায়ুতে জলীয় বাস্পের উপস্থিতির পরিমাণের উপর। বেশী জলীয় বাস্প সমৃদ্ধ বায়ুতে বাস্পীভবনের জন্য কম তাপের প্রয়োজন হবে ফলে শীতল ক্রিয়া কম হবে। বায়ু যত শুষ্ক হবে শীতলতা তত প্রকট হবে। অর্থাৎ দুই থার্মোমিটারের তাপমাত্রা পার্থক্য তত বেশী হবে। আর দুই থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশী হবে তুল্য আর্দ্রতা তত কম হবে।

বায়ু যদি জলীয় বাস্পে সম্পৃক্ত হয় তবে মোটেই বাস্পীভবন হবে না, তখন থার্মোমিটার দুটি একই পাঠ প্রদর্শন করবে, যার অর্থ বায়ুর তুল্য আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগ। সঠিক তুল্য আর্দ্রতার জন্য একটি সারণী ব্যবহার করা হয়। শিশিরাংক নির্ণয়ের জন্য একই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা নির্নয় করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে অন্য সারণী (শিশিরাংক সারণী) ব্যবহার করা হয়।

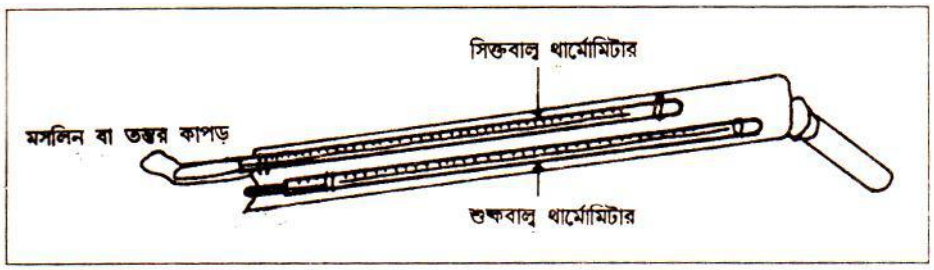


চিত্র ৩.২২.১ : সাইক্রোমিটারের সাহায্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাপ।

## হাইগ্রোমিটার

*হাইগ্রোমটারের সাহায্যে তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায়।*

হাইগ্রোমিটার থেকে সারণী ব্যবহার ছাড়াই সরাসরি বায়ুর তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায়। চুল বা কিছু কৃত্রিম তন্তু আছে যেগুলোর দৈর্ঘ্য, তুল্য আর্দ্রতার সাথে পরিবর্তিত হয়। তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে এগুলোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় আবার তুল্য আর্দ্রতা হ্রাস পেলে এদের দৈর্ঘ্য ও হ্রাস পায়। এক গুচ্ছ তন্তর এ হ্রাস বৃদ্ধি একটি সূচকের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে তুল্য আর্দ্রতার পরিমাপ জানা যায় (চিত্র ৩.২২.২)। এ পদ্ধতিতে তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপ করতে মাঝে মাঝে যন্ত্রটিকে সংশোধন (Calibration) করে নিতে হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় এ হ্রাস-বৃদ্ধি এত ধীরে হয় যে প্রকৃত মান নির্নয় করা সম্ভব হয় না।

*হাইগ্রোমিটারের গঠন প্রণালী ও কাজ কি?*

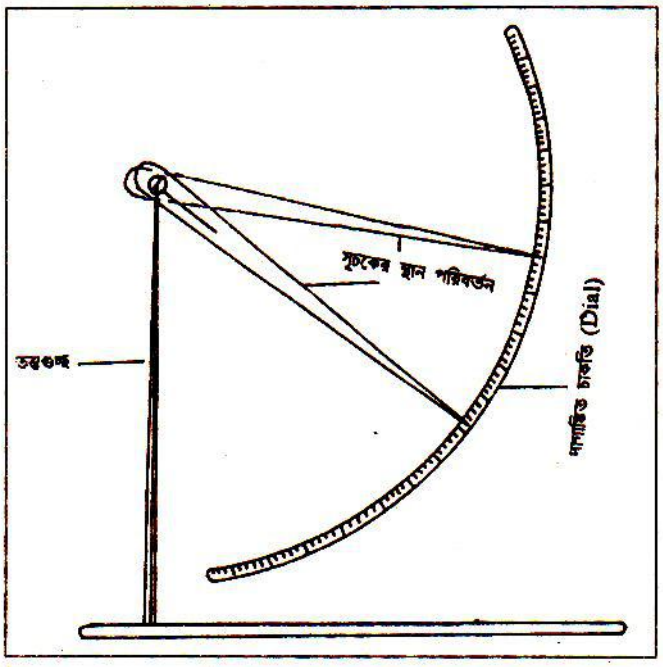


চিত্র ৩.২২.২ : হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাপ।

বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক হাইগ্রোমিটারের গঠন প্রণালী হচ্ছে একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী বা আর্দ্রতাগ্রাহী রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তুল্য আর্দ্রতার পরিবর্তনের সাথে এ পরিবাহী বস্তুর বিদ্যুৎ পরিবাহীতার ও পরিবর্তন হয়, এভাবে তুল্য আর্দ্রতা লিপিবদ্ধ করা হয়।

*বিদ্যুৎ পরিবাহী বা আর্দ্রতা গ্রাহী রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত।*

## পাঠ সংক্ষেপ

আর্দ্রতা বলতে বায়ুতে জলীয় বাস্পের উপস্থিতির পরিমাণ বুঝানো হয়। বায়ুর জলীয় বাস্প ধারণ ক্ষমতা চাপ ও তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। পরম ও তুল্য আর্দ্রতা বাতাসের আর্দ্রতা সংখ্যাতাত্বিক মানে প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২২

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ আর্দ্রতা শব্দটি বায়ুতে কিসের উপস্থিতির পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়-

ক. জলীয় বাস্প খ. জলবায়ুর
গ. কুয়াশার ঘ. ধূলিকণা ও শিশির বিন্দুর

১.২ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর জলীয়বাস্প ধারণ ক্ষমতা-

ক. হ্রাস পায় খ. বৃদ্ধি পায়
গ. কখনো হ্রাস পায় কখনো বৃদ্ধি হয় ঘ. হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না

১.৩ নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাস্পের উপস্থিতিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে-

ক. তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় খ. তুল্য আর্দ্রতা হ্রাস পায়
গ. আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় ঘ. তুল্য আর্দ্রতা অপরিবর্তিত থাকে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২x৬ = ১২ মিনিট) ঃ

১. আর্দ্রতা কাকে বলে?
২. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে?
৩. তুল্য আর্দ্রতা কি?
৪. কিভাবে আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয়?
৫. সাইক্রোমিটার কিভাবে কাজ করে?
৬. হাইগ্রোমিটারের গঠন প্রণালী ও কাজ কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. আর্দ্রতা বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার আর্দ্রতার বর্ণনা দিন।
২. আর্দ্রতার পরিমাপ পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

# পাঠ ৩.২৩ : বায়ুর আর্দ্রতা ঃ ঘনীভবন ও বাষ্পীভবন (Humidity : Condensation and Evaporation)

এ পাঠ শেষে যা জানবেন-

- ◈ কিভাবে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন ও ঘনীভবনের ফলে বাষ্প তরলে পরিণত হয়;
- ◈ ঘনীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ;
- ◈ মেঘ কি, কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর প্রকারভেদ;
- ◈ কুয়াশা কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে।

## ঘনীভবন ও রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন (Condensation and Adiabatic Changes)

যখন বাষ্প তরলে পরিণত হয় তখন ঘনীভবন সংঘটিত হয়। ঘনীভবনের ফলে শিশির, কুয়াশা বা মেঘের সৃষ্টি হয়। এছাড়া আরো অনেক ধরনেরও হতে পারে। বায়ু দুই উপায়ে জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত হতে পারে। প্রথমত: আরো জলীয় বাষ্পের সংযুক্তির মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত: বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকে নেমে এলে এবং ইহাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। ভূপৃষ্টের তাপমাত্রা এর উপরস্থ বায়ুর সাথে বিনিময়ের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সন্ধ্যাকালীন ভূপৃষ্ঠ শীতল হলে এভাবে শিশির বা কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

*বায়ু দুই উপায়ে জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আরো জলীয়বাষ্প সংযুক্তির মাধ্যমে। বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকে নেমে এলে।*

বায়ুর সঙ্কোচনের ফলে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, আবার আয়তন বৃদ্ধি হলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এ অবস্থাকে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন (Adiabatic Change) বলে। বায়ুর চাপ উপর দিকে কমতে থাকে ফলে তাপমাত্রাও হ্রাস পায়, একে তাপের ক্রম হ্রাস (Lapse-rate) বলে। জলীয়বাষ্পে অসম্পৃক্ত বায়ুতে উচ্চতার সাথে তাপমাত্রার হ্রাসের হার ১০০/১০০০ মিটার যাকে শুষ্ক রুদ্ধতাপীয় হার বলে। তাপমাত্রা হ্রাস পেলে ঘনীভবন শুরু হয়, তখন জলীয় বাষ্প সুপ্ত তাপ (Latent heat) বর্জন করে ঘনীভূত হতে চায়। আর এ পরিত্যক্ত সুপ্ত তাপ রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনকে হ্রাস করে বলে জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত বায়ুতে সিক্ত রুদ্ধতাপীয় হার (Wet adiabatic rate) হয় ৫°সে./১০০০ মিটার, যা শুষ্ক রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের হারের চেয়ে কম।

*বাষ্প তরলে পারণত হলে ঘনীভবন সংঘটিত হয়। ঘনীভবনের কারণে মেঘ, কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয়।*

*বায়ুর সংকোচনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার সম্প্রসারিত হলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় একে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন বলে।*

সুস্থিত (Stable) বায়ুতে মেঘ উর্ধ্বমুখে গমন করে আয়তনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাপমাত্রার ক্রম হ্রাস ঘটে। অসম্পৃক্ত জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ বায়ু সুস্থিত আকারে থাকে ফলে মেঘের গমন কেবল উলম্ব বরাবর হয়। এ অবস্থায় তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে মেঘের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মেঘ এর স্বস্থানে নিম্ন প্রবাহ প্রদর্শন করে। এ ধরনের অবস্থাকে সুস্থিত বায়ু (Stable air) বলে। যখন সম্পৃক্ত জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ বায়ুতে সিক্ত রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন (Wet adiabatic change) ঘটে তখন তাপমাত্রা হ্রাসের হার কম থাকে বলে মেঘের উর্ধ্বমূখী গমন সচল থাকে। এর পরিপার্শ্বিক অবস্থার চেয়ে মেঘের ঘনত্ব কম থাকে। ফলে জলীয়বাষ্পকণা ও মেঘপুঞ্জ থামের মত উর্ধ্বগামী হতে থাকে। এ অবস্থাকে সচল বা অশান্ত বায়ু (Unstable air) বলে। এ অবস্থায় উর্ধ্বগামীতার সাথে সাথে মেঘের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং মেঘ ছড়িয়ে পড়ে।

*সুস্থিত বায়ু, সিক্ত রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তন, সচল বা অশান্ত বায়ু।*

**দৈনন্দিন আবহাওয়া ও বাতাসের স্থায়ীত্ব:** বায়ু সুস্থির অবস্থায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। অশান্ত (Unstable air) বায়ুতে বারিপাত তুলনামূলক কম ও হাল্কা হয়।

*ঘনীভবন বলতে কি বুঝায়? রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন কি?*

## ঘনীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা (Necessary conditions for condensation)

ঘনীভবনের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-

*শিশিরাংক।*

১. বায়ু জলীয় বাস্পে সম্পৃক্ত হতে হবে : জলীয় বাস্পে সম্পৃক্ত হতে হলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুকে আরো জলীয় বাস্পের সংমিশ্রন বা তরলজল বাস্পীভবনের ফলে যোগ হতে হবে, নতুবা বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকে নেমে আসতে পারে।

*তল, ঘনীভবন, কেন্দ্র, পানি গ্রাহী কণিকা।*

২. জলীয়বাস্প ঘনীভূত হওয়ার জন্য একটি তল (Surface) থাকতে হবে : ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ধূয়া বা ধূলিকণা (Dust) এ ধরনের ঘনীভবণ কেন্দ্র (Condensation nuclei) হিসাবে কাজ করে; ফলে কুয়াশা বা শিশির জমতে পারে। অনেক সময় তলের/অবলম্বনের অভাবে তুল্য আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগের অধিক হলেও ঘনীভবন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। লক্ষ লক্ষ ঘনীভবনের কেন্দ্র জড়ো হয়ে একেকটি বৃষ্টির ফোটা নেমে আসে। স্বল্প আয়তনের কণাগুলি বাতাসে ভাসতে থাকে। লবণ কণার ঘনীভবন কেন্দ্রকে পানি গ্রাহী কনিকা (Hygroscopic nuclei) বলে।

*ঘনীভবনের জন্য কেমন অবস্থা প্রয়োজন?*

## মেঘ (Clouds)

*জলীয় বাস্পের ঘনীভূত রূপই মেঘ।*

জলীয়বাস্পের ঘনীভূত রূপই মেঘ। প্রকৃত পক্ষে, মেঘ হচ্ছে সুক্ষ্মজলকণা (Minutedroplets) বা ক্ষুদ্রাকার দৃশ্যমান বরফ টুকরো। আবহাওয়ার সরাসরি নির্দেশক হিসাবে মেঘ অনন্য। সুষ্ঠু আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে মেঘের শ্রেণীবিভাগ জানা প্রয়োজন। ৩.২৩.১ সারণিতে মেঘের প্রকার ভেদ আলোচনা করা হলো। চিত্র ৩.২৩.১-এ উচ্চতা ও গঠন আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম মেঘ দেখানো হয়েছে।

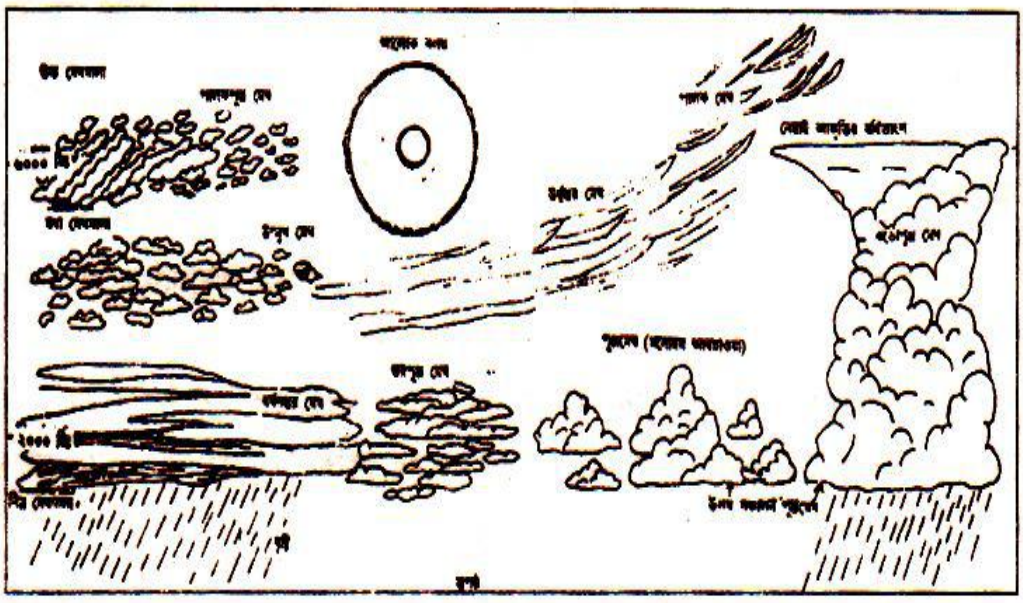

চিত্র ৩.২৩.১ : উচ্চতা ও গঠন আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম মেঘ।

*মেঘ কাকে বলে?*

*সারণি ৩.২৩.১ : বিভিন্ন রকমের মেঘ ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী।*

| মেঘের শ্রেণী ও উচ্চতা মিটারে | মেঘপুঞ্জ | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| উচ্চমেঘমালা (High Clouds) ৬০০০ মিটারের অধিক | পালক মেঘ (Cirrus) | পাতলা, রেশম সদৃশ, কোমল, বরফ কণার মেঘ। কখনো কখনো চিকন আকশির (Hooked filament) মত মনে হয় যাকে ঘোটকির লেজ (Mares Tails) বলে। |
| | পালক পুঞ্জ মেঘ | পাতলা, শুভ্র, বরফ কণার মেঘ, সারি বদ্ধ ক্ষুদ্র ঢেউ ঢেউ বা |
| | উর্ধ্বস্তর মেঘ (Cirrostratus) | পাতলা, শুভ্র, বরফ কণার মেঘ, যার ফলে আকাশটাকে দুধের মত মনে হয় (Milky look)। মাঝে মাঝে সূর্য বা চাঁদের চারিপাশে বৃত্তাকার আলোকবলয় (Halos) তৈরী করে। |
| মধ্য মেঘমালা (Middle Clouds) ২০০০-৬০০০ মিটার | উন্নেখপুঞ্জ (Altocumulus) | শুভ্র বা ধুসর মেঘ বিচ্ছিন্ন বুদবুদের সমষ্টিতে তৈরী মেঘ পশ্চাদ (Sheep-back) মেঘ। উন্নেখ স্তর স্তরীভূত মেঘের অবগঠন সাধারণত পাতলা এবং খুব মিহি বারিপাত ঘটায়। পাতলা অবস্থায় সূর্য বা চন্দ্রকে উজ্জল বিন্দুর (Bright Spot) মত দেখায় কিন্তু কোনো আলোক বলয় তৈরী হয় না। |
| নিম্ন মেঘমালা ২০০০ মিটারের নিচে | স্তর পুঞ্জ মেঘ | মসৃন, ধুসর, বুদবুদ বা জোড়া দেওয়া পাকানো বেলনের মত মেঘ। |
| | স্তর মেঘ | নীচু সুষম মেঘের স্তর, কুয়াশা সদৃশ কিন্তু ভূপৃষ্টে স্থির থকে না, |
| উলম্ব সৃষ্ট মেঘ মালা (Clouds of vertical development) ৫০০-১৮০০ মিটার | বর্ষন স্তর মেঘ (Nimbostratus) | অনিয়তকার স্তর বিশিষ্ট, গাঢ় ধুসর মেঘ। প্রচুর বারিপাত ঘটানো মেঘ। |
| | পুঞ্জ মেঘ (Nimbus) | মেঘের সতন্ত্র গম্বুজাকৃতির ভাসমান পুঞ্জ, উর্ধ্বমূখি সঞ্চালনের ফলে নিম্নে সমতলীয় তল ও উপর দিকে পুস্প কুঁড়ির মত অভিক্ষেপ থাকে। |
| | ঝড়ো পুঞ্জ মেঘ (Cumulonimbus) | স্তম্বাকার মেঘ, মাঝে মাঝে অগ্রভাগ ছড়িয়ে পড়ে কামারের নেহাই (Anvilhead) এর মাথা আকৃতির হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক, শিলাবৃষ্টি এবং ঘুর্ণিঝড় ঘটিয়ে থাকে। |

## কুয়াশা (Fog)

*বায়ুর উর্ধ্ব গমন ও রুদ্ধতাপীয় শীতলতায় মেঘ গঠিত হয়।*

কুয়াশা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বা তার কাছাকাছি জমা হওয়া মেঘ। মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে স্থান ও গঠন প্রক্রিয়া ছাড়া ভৌতিক কোনো পার্থক্য নাই। বায়ুর উর্ধ্ব গমন ও রূদ্ধতাপীয় শীতলতার ফলে মেঘ গঠিত হয়। কিন্তু বিকিরনের মাধ্যমে তাপ বর্জন অথবা একটি শীতল তলের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহের ফলে কুয়াশা তৈরী হয়। আরেক ধরনের কুয়াশা তৈরী হয় যদি বায়ুতে পর্যাপ্ত জলীয় বাস্প যোগ হয় এবং বায়ু জলীয়বাস্প সম্পৃক্ত হয়।

### শীতলতার ফলে সৃষ্ট কুয়াশা (Frogs caused by cooling)

ক. অ্যাডভেকশান কুয়াশা (Advection Fog): আর্দ্র ও উষ্ণবায়ু কোনো শীতল পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কম্বলের মত স্তরের কুয়াশা তৈরী হতে থাকে যাকে অ্যাডভেকশান কুয়াশা বলে।

খ. বিকিরণ কুয়াশা (Radiation Fog): শান্ত, শীতল ও পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সমৃদ্ধ রাতে বিকিরণের ফলে ভূপৃষ্ঠ শীতল হলে শিশিরাংকের চেয়ে কম তাপমাত্রায়, ভূপৃষ্ঠের উপর পাতলা আবরণে কুয়াশা জমে। শীতলতার মাত্রার উপর নির্ভর করে কুয়াশার ঘনত্ব ও বৃদ্ধি পায়।

অধিক ঘনত্বের কুয়াশা নিচে নেমে আসে এভাবে কুয়াশার পকেট তৈরী করে। বড় বড় কুয়াশা পকেট সাধারনত নদী উপত্যকায় দেখা যায়, ঐ সবক্ষেত্রে অনেক পুরুত্বের কুয়াশা স্তর ও সৃষ্টি হয়।

গ. উর্ধ্বঢাল কুয়াশা (Upslope Fog): অপেক্ষাকৃত আর্দ্র বায়ু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে ওঠে যেতে থাকলে রূদ্ধতাপীয় শীতলতার ফলে যদি তাপমাত্রা শিশিরাংকে শীতল হয় তবে কুয়াশা জমা হতে থাকে। ভারী হওয়ায় এটি তখন ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসে।

## বাস্পীভবনের ফলে সৃষ্ট কুয়াশা (Evaporation Fog)

*বাস্পীয় কুয়াশা।*

ক. বাস্পীয় কুয়াশা (Steam fog): যখন শীতল বায়ু কোন উষ্ণ পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ঐ বায়ুকে জলীয় বাস্পে সম্পৃক্ত করতে কিছু পানি বাস্পীভূত হয়। এ বাস্পীভূত বায়ু শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভুত হয় ও বায়ুতে ভাসতে থাকে; এর তাপমাত্রা নিচের পানির চেয়ে বেশী থাকে। এ বাস্পীয় রূপ (Steaming appearance) কুয়াশার বাস্পীয় কুয়াশা (Steam fog) বলে। বাস্পীয় কুয়াশা সাধারনত নীচুস্তরে গঠিত হয় কেন না বাস্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা বায়ুতে বাস্পীভবন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

*সম্মুখ মিলন, সম্মুখবর্তী কুয়াশা বা বারিপাত কুয়াশা।*

খ. সম্মুখবর্তী বা বারিপাত কুয়াশা (Frontal or Precipitation fog): যখন উষ্ণ ও শীতল বায়ু সংমিশ্রন বা সম্মুখ মিলন হয়, তখন উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠে যায় এবং মেঘের সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। নিচের শীতল বায়ু যদি শিশিরাংকের কাছাকাছি তাপমাত্রায় থাকে তবে বেশ কিছু বৃষ্টি কণা বাস্পীভূত হয়ে কুয়াশা তৈরী করে। এ ধরনের কুয়াশাকে সম্মুখবর্তি কুয়াশা বা বারিপাত কুয়াশা বলে। ফলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘনীভূত পানিকণা ভূমিতে পতনের সময় আবার মেঘে পরিণত হয়।

## পাঠ সংক্ষেপ

বাতাসের জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে শিশির, কুয়াশা বা মেঘের সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক মেঘ। কুয়াশা হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বা তার কাছাকাছি জমা হওয়া মেঘ। মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে স্থান ও গঠন প্রক্রিয়া ছাড়া আসলে কোন পার্থক্য নেই।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৩

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ বায়ু সঙ্কুচিত হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং প্রসারিত হলে তাপমাত্রার হ্রাস ঘটে, একে বলে-

ক. অবস্থান্তর খ. রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তন
গ. আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘ. আপেক্ষিক রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তন

১.২ আর্দ্র ও উষ্ণবায়ু কোনো শীতল পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে যে কুয়াশা তৈরী হয় তাকে বলে-

ক. অ্যাডভেকশান কুয়াশা খ. বিকিরণ কুয়াশা
গ. বাস্পীয় কুয়াশা ঘ. উর্ধ্ব ঢাল কুয়াশা

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২X৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. রূদ্ধতাপীয় পরিবর্তন কি?
২. ঘনীভবনের জন্য কেমন অবস্থা প্রয়োজন?
৩. কিভাবে বিভিন্ন ধরনের কুয়াশা সৃষ্টি হয়?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. ঘনীভবন ও রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের পার্থক্য করুন। ঘনীভবনের জন্যপ্রয়োজনীয় অবস্থা সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।
২. মেঘ কাকে বলে? মেঘ কত প্রকার ও কি কি? প্রধান মেঘের প্রকারসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী লিপিবদ্ধ করুন।
৩. কুয়াশা বলতে কি বুঝায়? কুয়াশার প্রধান ধরনসমূহ ও গঠনপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

# পাঠ ৩.২৪ : বারিপাত (Precipitation)

এ পাঠ শেষে যা জানবেন-

- ◈ বারিপাত কাকে বলে এবং কিভাবে সংঘটিত হয়;
- ◈ বার্জেরন ও সংঘর্ষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় কিভাবে বারিপাত হয়;
- ◈ বারিপাতের বিভিন্ন ধরন;
- ◈ বারিপাতের কারণ এবং কিভাবে পরিমাপ করা হয়।

## বারিপাত (Precipitation)

*বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বায়ুকে ভারি করে তোলে, তখন এই ভারি বায়ু বাতাসে ভেসে থাকতে না পেরে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। একে বারিপাত বলে।*

অনূকুল অবস্থায় বায়ুস্থ জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়; ঘনীভূত বাস্প বায়ুকে ভারী করে তোলে, যখন এ ঘনীভূত বাস্প এমন ভারী হয় যে আর বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না তখন তা বিভিন্নরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। এভাবে জলীয়বাস্প মেঘ হয়ে বা অন্য রূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতনকে বারিপাত বলে।

## বারিপাত গঠন (Formation of Precipitation)

ঘনীভবনের ফলে অতি ক্ষুদ্র জলকণা বায়ুতে মেঘের আকারে ভাসতে থাকে। ভাসমান এ অতি ক্ষুদ্র জলকণা জড় হয়ে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরী হয়। এ অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য দুটি পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়:

ক. বার্জেরণ প্রক্রিয়া (Bergeron Process)

খ. সংঘর্ষ সংযুক্তি প্রক্রিয়া (Collision-Coalescence Process)

*কিভাবে বারিপাত সংঘটিত হয়?*

## বারিপাতের ধরন (Forms of Precipitation)

*স্থানভেদে, ঋতুভেদে বারিপাতের ধরণে ভিন্নতা দেখা যায়।*

জলবায়ুর অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় আবার ঋতুভেদে আবহাওয়াগত পরিবর্তনও হয়; ফলে বারিপাতের বিভিন্ন ধরন হতে পারে। বৃষ্টি এবং তুষারপাত বারিপাতের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো অনেক ধরনের বারিপাত হতে পারে। আবহাওয়ার অবস্থা চিত্রনে বারিপাতের ধরন গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

## বিভিন্ন ধরনের বারিপাত

শিশির
হালকা কুয়াশা (Mist)
ইলশেগুড়ি (Drizzle)
বৃষ্টি (Rain)
হালকা বৃষ্টি (Light Rain)
মাঝারি বৃষ্টি (Moderate Rain)
ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain)
তুষার বৃষ্টি (Sleet)
গ্লেইজ (Glaze)
জমাট বদ্ধ কুয়াশা (Rime)
তুষার (Snow)
তুষার ফলক (Snow flake)
শিলাবৃষ্টি (Hail)
কোমল শিলা বৃষ্টি (Graupel)।

বারিপাতের ধরনসমূহ ও তাদের বৈশিষ্ট্য সারণি ৩.২৪.১-এ আলোচনা করা হলো।

সারণি ৩.২৪.১ : বারিপাতের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

| বারিপাতের ধরন | আকৃতি | ভৌত অবস্থা | বৈশিষ্ট্যাবলী |
|---|---|---|---|
| শিশির (Dew) | অতি ক্ষুদ্র | তরল | ভূপৃষ্ঠে মূলত: ঘাসের উপর বা গাছের পাতায় জমা হয়। প্রতিরাতে মাত্র ০.১-১.০ মি.মি. পরিমানে জমতে পারে। নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বেঁধে তুষারে পরিণত হয়। |
| হালকা কুয়াশা (Mist) | ০.০০৫-০.০৫ মি.মি | তরল | স্তর জাতীয় মেঘের ফলে জন্ম হয়। বায়ু প্রবাহ ১ মিটার/সে: হলে মুখের ত্বকে অনুভব করা যায়। |
| ইলশে গুড়ি (Drizzle) | ০.৫ মি.মি. এর চেয়ে ছোট | তরল | সাধারণত স্তর জাতীয় মেঘে হয়। এর তীব্রতা ঘন্টায় ১ মিলিমিটার বা তার কম হয়। |
| বৃষ্টি (Rain) | ০.৫ থেকে ৫ মি.মি | তরল | বর্ষন স্তর অথবা ঝড়ো পুঞ্জ মেঘে হয়। |
| হালকা বৃষ্টি (Light Rain) | | | হালকা বৃষ্টি ঘন্টায় ৩ মিলিমিটার বা তার কম তীব্রতায় ঘটে। বারিপাতের তীব্রতা ঘন্টায় ৩ মি.মি থেকে ৭.৫ মি.মি হয়। |
| মাঝারী বৃষ্টি (Moderate Rain) | | | ঘন্টায় ৭.৫ মি.মি. এর চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাতকে ভারী বৃষ্টি বলে। |
| ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain) | | | |
| তুষার বৃষ্টি (Sleet) | ০.৫-৫ মি.মি | কঠিন | ক্ষুদ্র বৃত্তাকার বা টুকরা বরফ খন্ডের মত; বৃষ্টি কণার অধোগতির সময় প্রাক হিমাঙ্কের বায়ুস্তরে (Sub freezing air) জমাট বেঁধে এগুলো গঠিত হয়। বরফ কণাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুবা টুকরাকারে পতিত হয়। |
| গ্লেইজ (Glaze) | ১ থেকে ২ সে.মি পুরু স্তর | কঠিন | যখন অতিহীম বৃষ্টিকনা কোনো কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন গ্লেইজ সৃষ্টি হয়। গ্লেইজ অনেক সময় বেশী পুরু ও ভারী হয়ে বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বা উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত করে। |
| জমাটবদ্ধ কুয়াশা (Rime) | বিভিন্ন মাত্রায় জমা হয় | কঠিন | বরফের পালকের মত বায়ুপ্রবাহে তীক্ষ্ণভাবে (Point to the wind) জমা হয়। অতিহীম বস্তুর সংস্পর্শে মেঘ বা কুয়াশা জমে এ ধরনের পেলব, তুহিন সদৃশ বস্তুকনার সৃষ্টি হয়। |
| তুষার (Snow) | ১ মি.মি থেকে ২ সে.মি. | কঠিন | ছয়টি তলসমৃদ্ধ বরফের কেলাস (Crystal) গঠন করে, পাত ও সূচাকৃতির (Niddle) ও হয়। অতিহীম মেঘ থেকে বরফকণা তৈরী হয়, জলীয় বাস্প বরফের কেলাস গঠন করে আধো:গতিতে ও তার জমাট অবস্থা অটুট থাকে। |
| তুষার ফলক (Snow flake) | | | কয়েকটি বরফের কেলাস (Crystal) যুক্ত হয়ে তুষার ফলকে পরিণত হয়। |
| শিলা বৃষ্টি (Hail) | ৫ মি.মি. থেকে ১০ সে.মি. বা তারও বড় | কঠিন | শক্ত, গোলাকৃতি বড়ি বা অনিয়ত বরফ টুকরো আকারের বারিপাত। বিশাল পরিচলন প্রক্রিয়ার ঝড়োপুঞ্জ মেঘে সৃষ্টি হয়; জমাটবদ্ধ বরফ টুকরো এবং অতিহীম জলকণা একই সাথে অবস্থান করে। |
| কোমল শিলা বৃষ্টি (Graupel) | ২ থেকে ৫ মি.মি. | কঠিন | কখনো কখনো মৃদু শৈল (Soft Hail) বলে; কোমল শিলা, বরফের কেলাসের উপর কুয়াশা জমাট (Rime) বেঁধে গঠিত হয়, ফলে কোমল বরফের (Soft Ice) আস্তরন পড়ে। এগুলো শিলা বৃষ্টির শিলা পাথর (Hail Stone) অপেক্ষা হালকা হওয়ায় ভাসমান বলে মনে হয়। (Hail Stone) অপেক্ষা হালকা হওয়ায় ভাসমান বলে মনে হয়। |

## বারিপাতের কারণ (Causes of Precipitation)

*রুদ্ধতাপীয় শীতলতাই বারিপাতের মূল কারণ।*

রুদ্ধতাপীয় শীতলতা বারিপাতের মূল কারণ। অসম্পৃক্ত বা সম্পৃক্ত বায়ু যখন উর্ধ্বাকাশে পরিচলন বা অন্য কোনো রূপে গমন করে তখন আয়তন বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। জলীয়বাস্প তাপ হ্রাসে ঘনীভূত হয়, মেঘের এ ঘনীভবনই সব সময় বারিপাতের মূল কারণ। বারিপাত মূলত: চার রকম প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়:

ক. পরিচলন (Convection Pricipitation)
খ. শৈলোৎক্ষেপ (Orographic Pricipitation)
গ. ঘূর্ণি (Cyclonic Pricipitation) ও
ঘ. সংঘর্ষ বারিপাত (Frontal Precipitation)।

### পরিচলন বৃষ্টি (Convection Pricipitation)

*তাপ-হ্রাসের ফলে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত।*

নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে এবং প্রসারিত হয়। ফলে সহজেই শীতল হয়ে পড়ে। এভাবে বায়ুর তাপ হ্রাসের ফলে অতিরিক্ত জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ এলাকায় উর্ধ্বগামী বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাস্প থাকায় সেখানে নিয়মিত পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

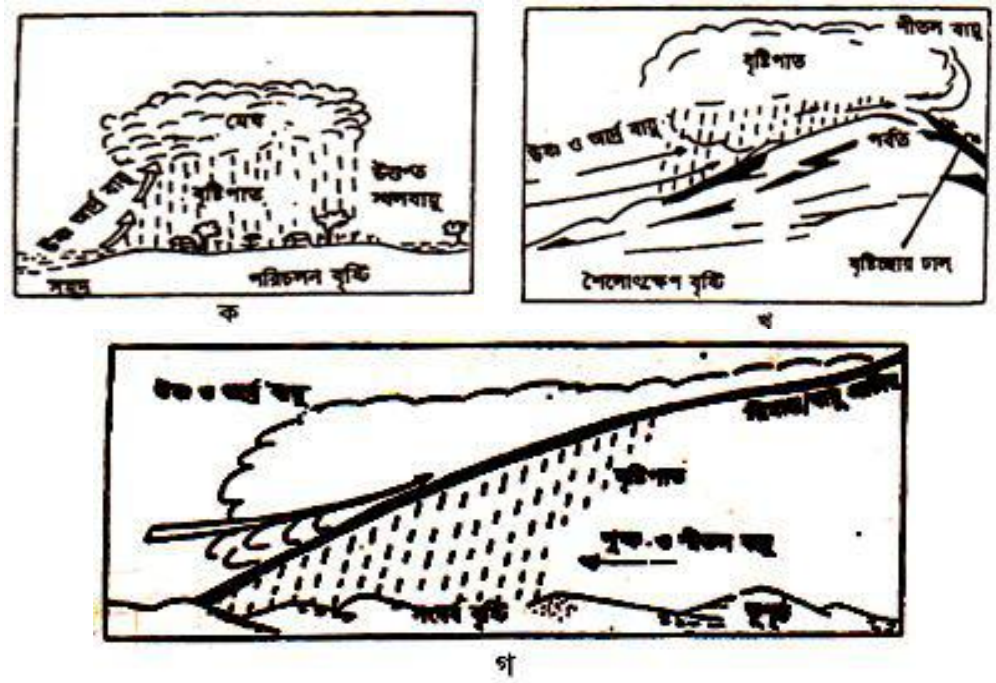


চিত্র ৩.২৪.১ : বিভিন্ন ধরনের বারিপাত ক) পরিচলন বৃষ্টি, খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, গ) সংঘর্ষ বৃষ্টি

### শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic Pricipitation)

*উচ পাহাড বা পর্বতে বাধা।*

জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু উঁচু পাহাড় বা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওপরে উঠে এবং শীতল হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে (চিত্র ৩.২৪.১ খ)। পর্বতের অপর পাশে বায়ু শুষ্ক হওয়ায় বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। একে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বা অনুবাদ ঢাল (Leeward Slope) বলে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু মেঘালয় পাহাড়ে বাঁধা পাওয়ায় সিলেট ও গারো পাহাড়ের পাদদেশে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ঘটায়।

### ঘূর্ণি বৃষ্টি (Cyclonic Pricipitation)

ঘূর্ণিবাতজনিত কারণে এই বৃষ্টিপাত ঘটে তাকে। ঘূর্ণিবাত কেন্দ্রের বায়ু ওপরে উঠে যাওয়ায় এর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শীতল হয়। এ সময় বায়ুর অতিরিক্ত জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় (চিত্র ৩.২৪.২)।

*ঘূর্ণিবাতজনিত কারণ।*

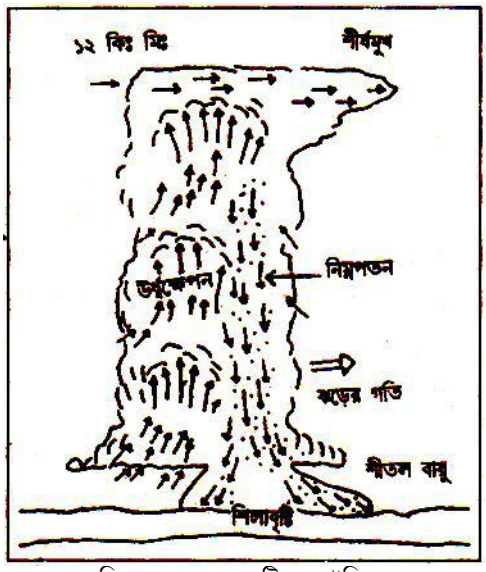


চিত্র ৩.২৪.২ বজ্রবৃষ্টির রেখাচিত্র

**সংঘর্ষ বৃষ্টি** (Frontal Precipitation)

শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ মুখোমুখি হলে।

শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ (Airmass) মুখোমূখী হলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাংকের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে এটি আরও ঘনীভূত হয়ে বায়ুর সংযোগ স্থলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এটি সংঘর্ষ বৃষ্টি নামে পরিচিত (চিত্র৩.২৪.১ গ)। এ ধরনের বৃষ্টিপাত সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশীয় (Temperate) এলাকায় দেখা যায়।

*বারিপাত কি প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়?*

## বারিপাতের পরিমাপ (Measurement of Precipitation)

বৃষ্টি মাপনী যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টিপাত পামাপ করা হয়।

বারিপাতের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সবচেয়ে সহজ। সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ সম্বলিত যে কোনো খোলা পাত্রই বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাস্পীভবনের ফলে অপচয় রোধ ও স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য বৃষ্টি মাপনী (Rain gauge) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি তামার তলাযুক্ত খোলা মুখবিশিষ্ট মাটিতে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে এর ওপর অংশ ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপরে থাকে। বৃষ্টির ফোঁটা কাঁচের পাত্রে জমা হয় এবং সাধারণত বর্ষাকালে প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার তা খালি করা হয়। কাঁচের

পাত্রে দাগ দেওয়া থাকায় সংগৃহীত পানির পরিমাণ সহজেই পরিমাপ করা যায়।

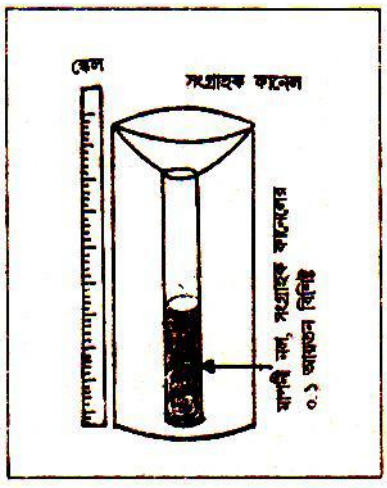


*চিত্র : ৩.২৪.৩ বৃষ্টমাপনী যন্ত্রের সরল গঠন*

আধুনিক আদর্শ বৃষ্টি মাপনী (Airmass) একটি ২০ সে.মি. ব্যাসের খোলামুখ সংগ্রহ পাত্র (চিত্র ৩.২৪.৩)। এই খোলামুখে পতিত বৃষ্টি ফানেলের মাধ্যমে একটি চোঙ্গাকৃতির (Croos-Sectional area) সংগ্রহ পাত্রের প্রস্থচ্ছেদ আয়তন এর এক-দশমাংশ (১/১০) হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দশ গুন বর্ধিত হয়ে পাঠ দেয় ফলে অতি সামান্য (০.০২৫ সে.মি) বৃষ্টিপাতের ও পরিমাপ করা সম্ভব

হয়। চোঙা সরু মুখ বিশিষ্ট হওয়ায় (Narrow Opening) বাস্পীভবনকে হ্রাস করে। ০.০২৫ সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত সামান্য (Trace) বৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়।

*টিপিং বাকেট মাপনীতে দুটি প্রকোষ্ঠ একটি ২৫ সে.মি. ফানেলের নিচে বসানো থাকে।*

*কিভাবে বারিপাত পরিমাপ করা হয়?*

বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র খোলা জায়গায় বসানো হয় যাতে কোন গাছের বা দালানের পানি ফানেলের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ না পায়। তাছাড়া কাঁচের পাত্রটি ফানেল দ্বারা ঢাকা থাকায় সরাসরি সূর্যালোকের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি বাস্পায়নেরও সুযোগ থাকে না এবং চোঙটি ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপর থাকায় ভূমির ছিটানো পানিও ফানেলে পৌঁছে না।

সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক মাপনী ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. টিপিং বাকেট মাপনী (Tipping-bucket gauge)
২. ওজন মাপনী (Weighing gauge)

## টিপিং বাকেট মাপনী (Tipping-bucket gauge)

টিপিং বাকেট মাপনীতে দুটি প্রকোষ্ঠ (Compartment) থাকে। এদের প্রতিটি ০.০২৫ সে.মি বৃষ্টি ধারণ করতে সক্ষম; এগুলো একটি২৫ সে.মি. ফানেলের (ব্যাস ২৫ সে.মি) নিচে বসানো থাকে। যখন পাত্র প্রকোষ্ঠ পানিতে পরিপূর্ণ হয় তখন এটি ঝুঁকে বা কাত হয়ে পানিশূন্য হয়, তাৎক্ষণিকভাবে পাত্রটির অন্য প্রকোষ্ঠ ফানেলের নীচে অবস্থান নেয় ও পানি সঞ্চিত হতে থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ কাত হওয়ার সময় একটি বৈদ্যুতিক বর্তনী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় (an electrical circuit is closed); ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি গ্রাফে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিপিবদ্ধ হয়।

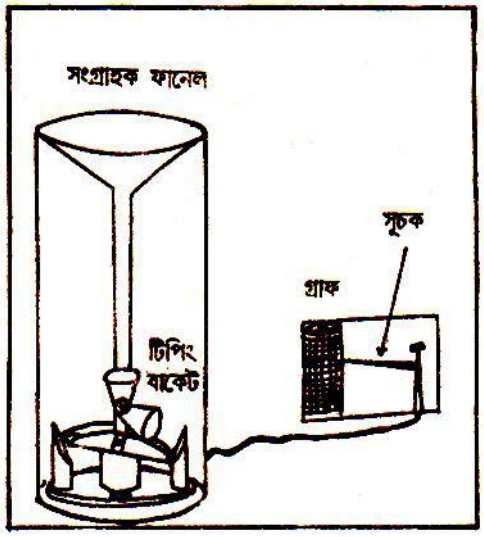


*চিত্র ৩.২৪.৪ : টিপিং বাকেট বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র।*

*টিপিং বাকেট বৃষ্টিমাপনী যন্ত্রের বর্ণনা দিন।*

## ওজন মাপনী (Weighing gauge)

বৃষ্টিপাত একটি সিলিন্ডারে সংগ্রহ করা হয়, যা একটি স্প্রীং (Spring) এর উপর বসানো থাকে। পানিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এর অবস্থান পরিবর্তন (Movement) একটি লেখনী (Pen) তে সঞ্চালিত (Transfer) করে লিপিবদ্ধ করা হয়।

বারিপাত পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার:

১. বৃষ্টি মাপনীকে ঘর বাড়ী, দালান বা কোন বাঁধার (Obstructions) আড়ালে রাখা যাবে না; উন্মুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

২. বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য অসুবিধা তৈরী করে। এজন্য মাপনীর কাছে একটি বায়ু আড়াল (Wind Screen) বসাতে হবে।

*বৃষ্টি মাপনীকে আবদ্ধ স্থানে না রেখে উন্মুক্ত স্থানে রাখতে হবে, বায়ু আড়াল বসাতে হবে, পুরুত্ব ও পানিসম।*

৩. তুষারপাতের পরিমাপের সময় দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় : পুরুত্ব ও পানিসম (Water Equivalent)। সাধারণত পুরুত্ব কোনো কাঠির সাহায্যে মাপা হয়। সাধারণ বায়ু প্রবাহেও তুষার মুক্তভাবে বিচরণ করে (Freely drifted)। এজন্য বৃক্ষ বা বাড়ী হতে দূরে খোলা স্থানে একাধিক পরিমাপ নিতে হয় ও গড় মান বের করতে হয়। পানিসম পরিমাপের জন্য নমুনা সংগ্রহ করে বিগলিত করে পরিমাপ করা হয়। সাধারণত প্রতি দশগুন পুরুত্বের তুষার থেকে ১ গুন পানি পাওয়া যায়। অনেক সময় সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৩০ সে.মি. পুরু হালকা তুষার কিম্বা ৪ সে.মি. পুরুত্বের ঘন তুষার থেকে ১ সে.মি. পানি হতে পারে।

*বারিপাত পরিমাপে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?*

## পাঠসংক্ষেপ

জলীয় বাস্প মেঘ হয়ে বা অন্য রূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতনকে বারিপাত বলে। বার্জেরন ও সংঘর্ষ সংযুক্তি এ দু'ধরনের প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিকণা গঠিত হয়। বারিপাত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-শিশির, কুয়াশা, ইলশেগুড়ি, বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি। এসব বারিপাত মূলত: চার রকম প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়ে থাকে: ক) পরিচলন, খ) শৈলোৎক্ষেপ গ) ঘূর্নি এবং ঘ) সংঘর্ষ বারিপাত। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত মাপনীহচ্ছে টিপিং বাকেট মাপনী ও ওজন মাপনী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৪

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ অনূকুল অবস্থায় বায়ুস্থ জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়।

১.২ জলবায়ুর অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় আবার ঋতুভেদে আবহাওয়াগত পরিবর্তনও হয়;

১.৩ রুদ্ধতাপীয় উষ্ণতা বারিপাতের মূল কারণ।

১.৪ নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে এবংসংকুচিত হয়।

১.৫ বারিপাতের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সবচেয়ে সহজ।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করুন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

২.১ ঘনীভবনের ফলে অতি ক্ষুদ্র---------- বায়ুতে মেঘের আকারে ভাসতে থাকে।

২.২ বারিপাত মূলত ------ রকম প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

২.৩ জলীয় বাস্পপূর্ণ বায়ু উঁচু পাহাড় বা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে এবং শীতল হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে -------- বৃষ্টি বলে।

২.৪ সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত সাধারণত ------- অক্ষাংশীয় এলাকায় দেখা যায়।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ৩x৫ = ১৫ মিনিট) ঃ

১ বৃষ্টি ও বারিপাতে পার্থক্য কি?

২ পরিচলন ও শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিতে পার্থক্য কি?

৩ বারিপাতের প্রধান ধরনগুলো কি কি?

৪ বারিপাত সংগঠিত হওয়ার প্রধান প্রক্রিয়া সমূহ কি কি?

৫ বারিপাত পরিমাপে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বারিপাত বলতে কি বুঝায়? বারিপাত গঠন, ধরন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

২. বারিপাতের কারণ কি? বারিপাতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩. বারিপাত পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন।

# ৩.২৫ : পৃথিবীর উষ্ণায়ন-গ্রীন হাউস প্রভাব (Global warming-Green house Effect)

এ পাঠ শেষে আপনারা যা জানবেন-

- ◈ পৃথিবীর উষ্ণায়ন বলতে কি বুঝায় এবং তা কিভাবে ঘটে থাকে;
- ◈ উষ্ণায়নে বায়ুমন্ডলের ভূমিকা কি;
- ◈ গ্রীন হাউস গ্যাসসমূহ কি কি;
- ◈ উষ্ণায়ন মাত্রা নিরূপণে ব্যবহৃত মডেল;
- ◈ উষ্ণায়নের পরিবেশগত প্রভাব কেমন ও তার ব্যাপকতা এবং
- ◈ উষ্ণায়ন লাঘবে মানব জাতির গৃহীত পদক্ষেপ ও করণীয় সম্পর্কে।

## পৃথিবীর উষ্ণায়ন - গ্রীন হাউস প্রভাব

*গত একশত বছরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ০.৫° সে. থেকে ০.৬° সে. বেড়েছে।*

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে গত প্রায় এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বিতর্কের শেষ নেই। বিতর্কের কারণ যদি সত্যিই উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য মানুষের ভূমিকা কি? ধনী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ বৃদ্ধির জন্য পরস্পরকে দায়ী করছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে যত বিতর্ক ও অনিশ্চয়তাই থাকুক না কেন, পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিষয়টিকে অবহেলা করা অত্যন্ত বিপদজনক হবে এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিত।

ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে গত একশত বৎসরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা প্রায় ০.৫° থেকে ০.৬° সে. বেড়েছে (চিত্র-৩.২৫.১)।

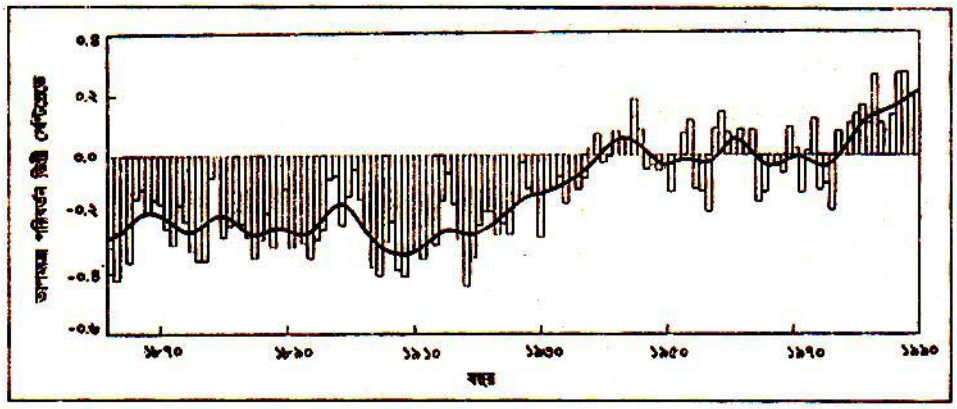


**চিত্র ৩.২৫.১** : গত শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় উষ্ণতার পরিবর্তন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি সমান হারে ঘটেনি, লক্ষ্য করার মত যে তাপমাত্রা ১৯১০ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে এবং ১৯৭০ দশক থেকে অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্রের উষ্ণতার পরিবর্তন ধারা কতখানি গ্রহণযোগ্য? সময়ের মাপে একশত বছর খুব কম সময়; এত অল্প সময়ের গড় উষ্ণতার পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে পরিমাপ অসুবিধাজনক। কারন প্রতি বৎসর অঞ্চল ও ঋতু ভেদে উষ্ণতার যে তারতম্য ঘটে থাকে তার তুলনায় এ মাত্রা (৫°-৬° সে:) খুবই নগন্য। ফলে উষ্ণতার এ হিসাবের নির্ভুলতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা দ্বিধান্বিত। তাদের প্রশ্ন হলো: উষ্ণতা বৃদ্ধির এ প্রবণতা যদি সঠিক হয় তাহলে এই বৃদ্ধি কি চলতেই থাকবে? পৃথিবী কতটুকু উষ্ণ

হবে? পৃথিবীর উষ্ণতার সাথে বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক গঠন উপাদানের কি সম্পর্ক? এ উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে মানুষের কর্মকান্ড কিভাবে জড়িত? উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিণতি কি? উষ্ণতা বৃদ্ধির এ ধারা কি পরিবর্তন সম্ভব? পৃথিবীর উষ্ণায়ন সম্পর্কে জানার জন্য এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরী। তাই এ বিষয়ের প্রথমেই জানা প্রয়োজন বায়ুমন্ডল দ্বারা কি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়।

*পৃথিবী কি উষ্ণ হচ্ছে?*

## পৃথিবী উষ্ণায়নে বায়ুমন্ডলের ভূমিকা (Role of Atmosphere in Global Warming)

পৃথিবীর জলবায়ুর প্রধান চালক বায়ুমন্ডল এবং এর শক্তি যোগায় সূর্য। সূর্যরশ্মি পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছার সময় মেঘমালা ও ধুলিকণা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে এর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। এ রশ্মির বাকি অংশের কিছু ভূমি ও পানিতে শোষিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায়। সূর্য রশ্মির এ আপতিত রশ্মি খাট তরঙ্গ হিসাবে পৃথিবীতে পৌঁছে কিন্তু প্রতিফলিত রশ্মি অবলোহিত (Infra-red) দীর্ঘ তরঙ্গ আকারে বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়।

*গ্রীন হাউজের কাঁচভেদ করে খাটো তরঙ্গের অতিবেগুনী আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করে কিন্তু ভিতরের তাপ বাইরে আসতে পারে না।*

প্রতিফলিত এই দীর্ঘ তরঙ্গ (মূলত: তাপীয় শক্তি) বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে তা নিম্ন আকাশে থেকে যায়। এই অবস্থায় বায়ুমন্ডলের নিম্নাংশে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। কাছাকাছি মেঘ দ্বারাও অবলোহিত রশ্মি প্রতিফলিত করে ভূ-মন্ডল শীতল রাখতে সাহায্য করে এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিফলিত রশ্মি আটকে রেখে নীচের বায়ুমন্ডল গরম রাখে। একটি কাঁচের গ্রীন হাউসের সাথে বিষয়টিকে তুলনা করা যায়। কাঁচ ভেদ করে খাটো তরঙ্গের অতিবেগুনী আলোকরশ্মি গ্রীন হাউসে প্রবেশ করে কিন্তু মেঘ ও গ্যাসের ন্যায় অবলোহিত রশ্মি কাচেঁর মাধ্যমে বাইরে বের হতে পারে না। ফলে গ্রীন হাউসের ভিতরে তাপীয় শক্তি আটকা পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কাঁচের গ্রীন হাউসের বৈশিষ্ট্যই গ্রীন হাউস প্রভাব নামে পরিচিত। মূলত: গ্রীন হাউস প্রভাবের কারণেই পৃথিবী বসবাসযোগ্য আছে। গ্রীন হাউস প্রভাব বিহীন ভূ-পৃষ্ঠ সৌর জগতের অন্য গ্রহের ন্যায় অব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

*কি প্রক্রিয়ায় পৃথিবী উত্তপ্ত হয়?*

## গ্রীন হাউস গ্যাস সমূহ (Green House Gases)

বায়ুমন্ডলীয় গ্যাসের যেগুলি অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে সেগুলোই গ্রীন হাউস নামে পরিচিত। যেমন, জলীয়বাস্প ($H_2O$), কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$), মিথেন ($CH_4$), ওজন ($O_3$), নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFCs) এবং জেনন।

*প্রায় ৮০ ভাগ জলীয় বাষ্পজনিত।*

জলীয়বাস্প প্রাকৃতিক গ্রীন হাউস উষ্ণতার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই জলীয়বাস্প জনিত। তাই, জলীয়বাস্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রীন হাউস গ্যাস। উষ্ণতার অবশিষ্ট ২০ শতাংশের জন্য অন্যান্য অত্যন্ত স্বল্প মাত্রার গ্যাস সমূহ দায়ী। এ সমস্ত গ্যাসের মাত্রা এতই কম যে এদের আয়তন পরিমাণে বায়ুতে প্রতি বিলিয়নে কত মাত্রায় আছে (পি.পি.বি.ভি) তার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সারণি-৩.২৫.১ এ বায়ুমন্ডলীয় স্বল্প মাত্রার (Trace) গ্যাস সমূহের মধ্যে অন্যতম গ্রীন হাউস গ্যাস এবং এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

*সারণি ৩.২৫.১: গ্রীন হাউস প্রভাবে জড়িত বায়ুমন্ডলীয় স্বল্প মাত্রার গ্যাস সমূহ*

| বৈশিষ্ট্যাবলী | কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO2) | মিথেন (CH4) | নাইট্রাস অক্সাইড (N2O) | ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFCs) | টোপোমন্ডলীয় ওজোন (O3) | জলীয়বাস্প (H2O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রীন হাউস ভূমিকা | উষ্ণতা বৃদ্ধি | উষ্ণতা বৃদ্ধি | উষ্ণতা বৃদ্ধি | উষ্ণতা বৃদ্ধি | উষ্ণতা বৃদ্ধি | বায়ু উত্তপ্ত কওে মেঘ, ঠান্ডা রাখে |
| স্ট্রেটোমন্ডলীয় ওজনের প্রভাব | হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটাতে পারে | --- | --- | হ্রাস ঘটায় | নাই | হ্রাস পায় |
| প্রধান মানবীয় উৎস | জীবাশ্ম ভিত্তিক জ্বালানী, বনের ধ্বংস সাধন | ধান চাষ, গবাদি পশু, জীবাশ্ম ভিত্তিক জ্বালানী, জৈব বস্তু দহন | সার ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন | রিফ্রেজারেন্টস এ্যারোসোলস, শিপের কর্মকান্ড | হাইড্রোকার্বনস (NO সহ), জৈব বস্তু পোড়ানো | ভূ-পরিবর্তন, পানি পরিবর্তন |
| প্রধান প্রাকৃতিক উৎস | প্রকৃতিগতভাবে ভারসাম্য বজায় থাকে | জলাভূমি, | মৃত্তিকা ক্রান্তীয় বনাঞ্চল | নাই | হাইড্রোকার্বনস | বাস্পীয় প্রস্বেদন, |
| বায়ুমন্ডলীয় বয়স | ৫০-২০০ বছর | ১০ বছর | ১৫০ বছর | ৬০-১০০ বছর | কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস | কয়েকদিন |
| বর্তমানে বায়ুমন্ডলে পরিমাণ (প্রতি বিলিয়ন আয়তনে) | ৩,৫৩,০০০ | ১৭২০ | ৩১০ | ১১:০.২৮ CFC ১২:০.৪৮ | ২০-৪০ | ৩০০০-৬০০০ (স্ট্রাটোমন্ডলে) |
| শিল্প বিপ্লবের পূর্বে (১৭৫০-১৮০০) বায়ুমন্ডলে এরপরিমাণ (প্রতি বিলিয়ন আয়তনে) | ২,৪০,০০০ | ৭৯০ | ২৮৮ | ০ | ১০ | অজানা |
| বর্তমান বার্ষিক বৃদ্ধি হার | ০.৫% | ১.১% | ০.৩% | ৫% | ০.৫-২.০% | অজানা |
| মানবজনিত গ্রীন হাউসের প্রভাব | ৬০% | ১৫% | ৫% | ১২% | ৮% | অজানা |

সারণিতে লক্ষ্যণীয়, মানব প্রভাবজনিত গ্যাস সমূহের মধ্যে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা সর্বাধিক যার পরিমাণ প্রায় ৩,৫০,০০০ পি.পি.বি.ভি। অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) অন্যতম। বায়ুমন্ডলে এই সমস্ত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত দশক থেকে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

*জলীয় বাস্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এবং জেনন গ্রীন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত।*

*গ্রীন হাউস গ্যাস কি?*

## পৃথিবীর উষ্ণায়নের পরিবেশগত প্রভাব (Environment Effect of Global Warming)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন মানব প্রভাবিত জলবায়ু পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ভৌত ও জৈব বিষয়ক আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, বারিপাতের পরিবর্তন, উদ্ভিজ্জের বন্টন বিন্যাস পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া, হিমবাহ ও সমুদ্র বরফের বন্টন, বরফাচ্ছাদিত ভূমির বরফ গলে যাওয়া, সমুদ্র সমতলে উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া, পানি চক্রের ব্যাপক পরিবর্তন, মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পচন এবং গ্যাসের জলীয় কণার (Hydrates) ভাঙ্গন। এসব সম্ভাব্য পরিবর্তন সমূহের কিছু কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

## বারিপাতের পরিবর্তন

*বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, বাস্ত পদ্ধতির পরিবর্তন।*

বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মহাসাগর, হ্রদ, নদী, খাল, বিলের পানি আরো বেশি পরিমাণে বাস্পায়িত হবে এবং তাতে আরো বৃষ্টিপাত হবে। তবে এ বৃষ্টিপাত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হবে। এ অবস্থায় ক্রান্তীয় অঞ্চল বৃষ্টিবহুল হবে। মহাদেশীয় ভূ-ভাগের অভ্যন্তর ভাগ আরো উত্তপ্ত ও বৃষ্টিহীন হবে। উদ্ভিজ্জের পরিবর্তন বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের সাথে গাছপালার বন্টনেরও ব্যাপক পরিবর্তন হবে। ফলে বাস্ত পদ্ধতির (Ecosystem) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত দ্বারা প্রভাবিত হবে। কিছু কিছু কৃষি অঞ্চলে ঘন ঘন খরা ও মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস পাবে ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে। উচ্চ অক্ষাংশে অবশ্য দীর্ঘ গ্রীষ্ম হওয়ায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

## ক্রমবর্ধমান সাইক্লোন/ঝড় তুফান

*ক্রান্তীয় এলাকায়।*

বায়ুমন্ডলীয় ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার সাথে ক্রান্তীয় এলাকায় ঝড়, তুফান, সাইক্লোনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত অঞ্চলে এগুলো প্রায়শঃ সংঘঠিত হয়, উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রকোপ আরো অনেক বেড়ে যাবে।

## তুষার গলে যাবে (অথবা বরফ জমা হবে)

গ্রীষ্মকালীন অধিক উষ্ণতার কারণে নিম্ন ও মধ্য অক্ষাংশে তুষারের স্তুপের পুরুত্ব হ্রাস পাবে। অপরদিকে উচ্চ অক্ষাংশে উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মহাসাগর অধিক মাত্রা বাস্পায়ন হবে এবং নিকটবর্তী তুষার স্তুপের সাথে যোগ হবে। উচ্চ অক্ষাংশের মহাদেশীয় তুষার স্তুপের উপর অধিক মাত্রায় তুষারপাত হবে, ফলে এর আয়তন সম্প্রসারিত হবে।

## সমুদ্রের ভাসমান বরফ হ্রাস

*পৃথিবীর উষ্ণতার ফলে বারিপাতের পরিবর্তন, তুষার গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি বিপর্যয় ঘটবে।*

বর্ধিত উষ্ণতা উত্তর গোলার্ধের সামুদ্রিক ভাসমান বরফ বহুলাংশে গলিয়ে দেবে। এর ফলে উত্তপ্ত গোলার্ধে ভাসমান বরফ থেকে সূর্যালোকের প্রতিফলন মাত্রা হ্রাস পাবে যার কারণে ঐ অঞ্চলে গ্রীন হাউস প্রভাব বেড়ে যাবে। জি.সি মডেল অনুযায়ী দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশে উষ্ণতা বৃদ্ধি কম হওয়ায় সামুদ্রিক ভাসমান বরফের তেমন পরিবর্তন হবে না।

## চিরতুষার রাজ্যের বরফ গলে যাওয়া

বর্ধিত গ্রীষ্মকালীন বায়ুর উষ্ণতার কারণে উচ্চ অক্ষাংশের চিরতুষার এলাকার বরফ গলতে থাকবে। ফলে এসব এলাকায় গড়ে উঠা শহরও অবকাঠামো এবং বাস্ত সংস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

## সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

মহাসাগরের উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে এর আয়তনও সম্প্রসারিত হবে, ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং সাথে মহাদেশীয় পার্বত্য তুষার গলা পানিও সমুদ্রের সাথে যোগ হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা আরো বাড়িয়ে দেবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের এ বাড়তি উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় সমতল ভূমির দেশসমূহ সামুদ্রিক জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে। বিশেষ করে মালদ্বীপ ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাদেশীয় বেশি কিছু দ্বীপের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

*সামুদ্রিক জোয়ারের পানি।*

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিস্তীর্ন এলাকা সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হবে। এক হিসাবে দেখা গেছে সমুদ্র সমতলের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ উপকূলীয় সমভূমি সামুদ্রিক পানিতে ডুবে যাবে। ব্যাপক এলাকায় ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে, সমুদ্রের লোনা পানির সংস্পর্শে আরো বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হবে; বর্তমান সুন্দরবন পুরোপুরি পানিতে তলিয়ে যাবে।

*পৃথিবীর উষ্ণায়নের পরিবেশগত প্রভাব কি?*

## পৃথিবীর উষ্ণায়ন লাঘবে মানব জাতির সাড়া

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির যাবতীয় গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে অনেকাংশে বিতর্ক থাকলেও সারা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীও সাধারণ জনমত সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন:

*সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।*

ক. এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন;

খ. বায়ুমন্ডলীয় পরিবর্তনে মানবজনিত কর্মকান্ডের অবদান যতখানি সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা;

গ. মানবজনিত অবদানে উন্নয়নশীল ও শিল্প সমৃদ্ধ দেশ সমূহে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায় সঙ্গত পদক্ষেপ নিতে হবে; এবং

ঘ. যে পদক্ষেপই নেওয়া হবে তা আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয় সাধিত হবে।

এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৯৯ সালে প্রথম বিশ্ব জলবায়ু প্রোগ্রাম নামক একটি কর্মসূচি শুরু হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরো দুটি কর্মসূচি আন্তর্জাতিক ভূ-মন্ডল ও জৈবমন্ডল প্রোগ্রাম (International Geosphere & Biosphere) ও বিশ্ব পরিবর্তনে মানবীয় সাড়া (Human Response to Global Change) শুরু হয়। এসব কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO), জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ইউনিয়ন পরিষদ (ICSU) সম্মিলিতভাবে ৩৮টি দেশের বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারণ পরামর্শকদের নিয়ে (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) গঠিত হয়। এ সংস্থা জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা, এর উন্নয়ন এবং ফলাফল সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবে। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের কিয়েটো শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিয়োটো সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী কয়েক দশকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ ১০% গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপাদন হ্রাস করবে। আশা করা যায় এভাবেই মানবজাতিসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে হয়ত পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে।

*পৃথিবীর উষ্ণায়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধিষ্ণুতার কারণে ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম বিশ্ব জলবায়ু প্রোগ্রাম নামক একটি কর্মসূচি শুরু হয়।*

*১৯১৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন।*

*উষ্ণায়ন লাঘবে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?*

## পাঠ সংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা গত একশত বছরে প্রায় ০.৫° থেকে ০.৬° সে. বেড়েছে। পৃথিবীর এ উষ্ণায়নে বায়ুমন্ডলের ভূমিকা জানা প্রয়োজন। বায়ুমন্ডলীয় গ্যাসের যেগুলো অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে সে সব গ্যাসকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলে। যেমন- জলীয়বাস্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, সিএফসি ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৫

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ গত একশত বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে-

ক. ০.৫°-০.৭° সে. খ. ০.৪°-০.৬° সে.
গ. ০°-০.৫° সে. ঘ. ০.৫°-০.৬° সে.

১.২ কোনটি গ্রীনহাউস গ্যাসের সংকেত নয়-

ক. $O_3$ খ. $Fe_3O_4$
গ. $CO_2$ ঘ. $N_2O$

১.৩ উষ্ণায়নে মানব প্রভাবজনিত কারণে সৃষ্ট গ্যাস সমূহের মধ্যে সর্বাধিক-

ক. সীসা খ. সি এফ সি
গ. মিথেন ঘ. কার্বন-ডাই-অক্সাইড

১.৪ ১৯৯৭ সালে বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন হয়-

ক. নিউইউর্কে খ. কিয়েটো
গ. প্যারিসে ঘ. ওয়াশিংটনে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন–** (সময় ২X১০ = ১০ মিনিট) ঃ

১. পৃথিবী কি উষ্ণ হচ্ছে?
২. কি প্রক্রিয়ায় পৃথিবী উত্তপ্ত হয়?
৩. গ্রীণ হাউস গ্যাস কি?
৪. পৃথিবীর উষ্ণায়নের পরিবেশগত প্রভাব কি?
৫. উষ্ণায়ন লাঘবে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পৃথিবীর উষ্ণায়ন কি? উষ্ণায়নে বায়ুমন্ডলের ভূমিকা কি?
২. গ্রীনহাউস গ্যাস সমূহের বর্ণনা দিন।
৩. পৃথিবীর উষ্ণায়নে পরিবেশগত প্রভাব ও উষ্ণায়ন লাঘবে মানব জাতির সচেতনতা সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

# বারিমন্ডল (Hydrospere)

*৩.২৬ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত পাঠে আপনারা বারিমন্ডল সম্পর্কে জানবেন।*

## ৩.২৬ : পানি ও জীবন (Water and Life)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ভূ-বৈচিত্র্য গঠনে পানির ভূমিকা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে পানির সম্পর্ক;
- ভূ-পৃষ্ঠে পানির বিন্যাস;
- পানির বিভিন্ন ব্যবহার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা;
- কিভাবে এবং কেন পানি সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন এবং
- পরিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা ও পানি দূষণ রোধ করার গুরুত্ব সম্পর্কে।

### পানি ও জীবন (Water and Life)

*ভূ-তাত্ত্বিক সময়।*

পৃথিবীর ভূ-পদ্ধতি (Geo-system) স্থল, পানি ও বায়ু এ তিন ভাগ নিয়ে গঠিত। সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করে পানি এবং বায়ু প্রবাহ হিসাবে ভূ-পদ্ধতির গঠন ও পরিবর্তন করে থাকে। ভূতাত্ত্বিক সময় (Geological Time) থেকে ক্রমাগত বিরামহীন এ পদ্ধতি পরিবর্তন ও বৈচিত্র সচল রেখেছে।

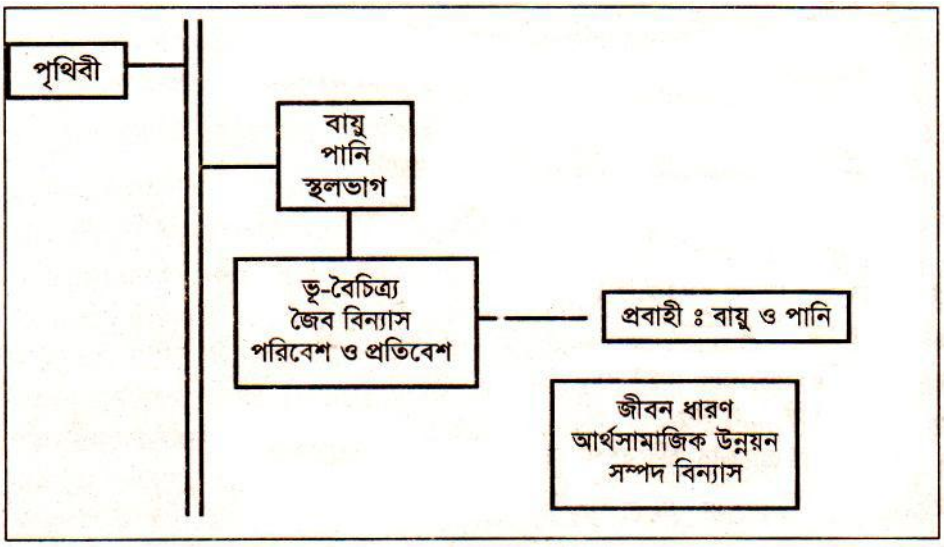


চিত্র ৩.২৬.১ : পৃথিবীর প্রধান বৈচিত্র্য গঠনে পানির ভূমিকা।

*জীবের অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভর করে পানির প্রাপ্যতা ও গুণাগুনের উপর।*

ভূ-বৈচিত্র্য জৈব বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ নির্ভর করে পানির প্রাপ্যতা ও গুণাগুণের উপর। জীবের জীবন-ধারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সম্পদ বিন্যাসে পানির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের সাথে পানির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অভিগমণ, অভিবাসন সবই পানির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পানির সাথে এই সম্পর্ক ৩.২৬.২ চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো।

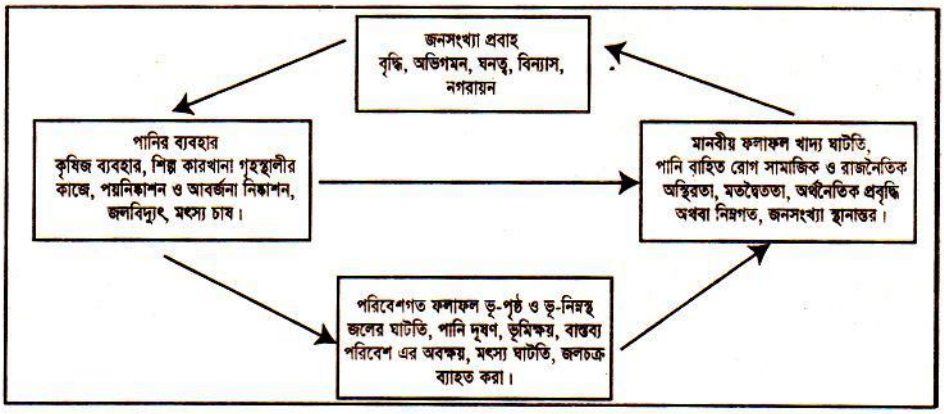


চিত্র ৩.২৬.২ : জনসংখ্যা ও পানির সম্পর্ক (Water-population Links)

*ভূ-বৈচিত্র্য গঠন ও জীবনের সাথে পানির সম্পর্ক কি?*

## পানি বন্টন (Water Distribution)

*পানি-স্থলভাগে, সমুদ্রে ও গ্যাসীয় রূপে আছে।*

ভূ-পদ্ধতি গঠন উপাদান হিসাবে পানি অনন্য। ভূ-পৃষ্ঠে পানিই সর্বাপেক্ষা বেশি জায়গা দখল করে আছে। উপগ্রহ চিত্রে পৃথিবীকে নীল রংয়ের জল পরিবেষ্টিত একটি গ্রহ বলে প্রতীয়মান হয়। পানি স্থলভাগে, সমুদ্রে এবং গ্যাসীয় রূপে আছে। জীবন্ত কোষে, রাসায়নিক বন্ধনে, বিবিধ দ্রবীভূত লবণকণা বা রাসায়নিক দ্রব্যে অথবা খনিজ (mineral) মিশ্রিত হয়ে স্বাদু (Fresh) লবণাক্ত বা মিশ্রিত (Brackish) পানি হিসেবে আছে।

ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। এই পানি বন্টন নিম্নরূপ:

*সারণি ৩.২৬.১ : পানি বন্টন*

| স্থান | পরিমাণ | অবস্থা |
|---|---|---|
| ভূ-পৃষ্ঠে পানি | ১.৩৫ x ১০$^{৯}$ ঘন কিলোমিটার | সমুদ্রে তরল |
| ভূ-ত্বকে পানি | ০.৭৭ x ১০$^{৯}$ ঘন কিলোমিটার | জল বন্ধন (Binding water) |
| হিম শিখরে | ০.২৮ x ১০$^{৯}$ ঘন কিলোমিটার | তুষার ও হিম শৈল |

পৃথিবীকে বেষ্টন করে বারিমন্ডল ও বায়ুমন্ডলে জলরাশির বিন্যাস উপর দিকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার এবং ভূ-ত্বকে ১ কিলোমিটার বিস্তার করে আছে। পানির বিন্যাসের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা ও গুণাগুণ হচ্ছে ঃ

১. সমুদ্র জল (Sea water)
২. তুষার (Glacier)
৩. স্বাদু পানি (Fresh water)
৪. মাটির আর্দ্রতা (Soil moisture)
৫. ভৌমজল (Ground water)
৬. বাস্পীয় জল (Water vapour)

*পৃথিবীর পানি বন্টন কিরূপ?*

## পানি ও জীবন (Water and Life)

*বাস্তববিদ্যা।*

ভূ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম। বাস্তব্যবিদ্যা (Ecology) মূলত: ভূমি, পানি ও বায়ু মন্ডলের সংযোগ স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সূচনা পানিতেই হয়। স্থল ভাগের অনেক জীবই তাদের আবাস স্থল থেকে অনেক দূরের ভিন্ন ভিন্ন

পরিবেশে জন্ম লাভ করেছিল। জীবন ধারণের জন্য পানি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায়:

- মানুষের শরীরে পানির পরিমাণ শতকরা ৬৫ ভাগ;
- প্রতিদিন প্রতিস্থাপিত হয় শতকরা ৫ ভাগ।

খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া বাঁচবে মাত্র দিন দশেক।

প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে নীল, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়। জনবসতি ও ঘনত্ব নির্ভর করে স্বাদু পানির প্রাপ্যতার উপর। সাম্রাজ্য বিস্তারেও প্রাচীনকালে নদী জলের উপর নির্ভর করতে হতো। পানির সাথে জীবনের সম্পর্ক ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে; নিম্ন ছকে সময় ও জীবের ধরন দেখানো হলো-

*নীল, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস।*

*সারণি ৩.২৬.২ : **সময়ের সাথে পানি ও জীবনের সম্পর্ক পরিবর্তন***

| ভূ-তাত্ত্বিক সময় | বছর পূর্ব | জীবের ধরন |
|---|---|---|
| প্লিস্তসিন | ৫ বিলিয়ন | দ্বিপদ প্রাণী ও প্রাথমিক মানুষের বিন্যাস |
| অলিগোসিন | ৩৭ বিলিয়ন | স্থলভাগে ভারবাহী জীব ও স্তন্যপায়ী |
| পারমিয়ান-ট্রায়াসিক | ২৩০ বিলিয়ন | সরীসৃপ |
| কার্বনিফেরাস | ২৭০ বিলিয়ন | স্থলজ বনভূমি, উভচর |
| ডেভোনিয়ান | ২৯০ বিলিয়ন | মেরুদণ্ডী, জলে মাছ |
| সিলুরিয়ান | ৩০০ বিলিয়ন | ডাঙ্গায় সপুস্পক উদ্ভিদ |
| অরডোভিসিয়ান | ৩২০ বিলিয়ন | সমুদ্রে বহুকোষী অমেরুদণ্ডী প্রাণী |
| ক্যাম্ব্রিয়ান | ৩৭০ বিলিয়ন | সমুদ্রে এককোষী অনুজীব |
| প্রিক্যাম্ব্রিয়ান | ৪০০ বিলিয়ন | সমুদ্রবক্ষে অকোষী জীব |

অতীতে অনেক জীব বরফাচ্ছাদনের ফলস্বরূপ (Glaciation) সমুদ্রের লবণাক্ততা ও স্থলভাগের মরুময়তার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

*পানির সাথে জীবনের সম্পর্ক কি?*

## পানির ব্যবহার (Use of water)

জীবন ধারণের জন্যই শুধু নয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও পানির ভূমিকা অতুলনীয়। পানি ব্যবহারের সাধারণ হার ৩.২৬.৩ সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে।

*সারণি ৩.২৬.৩ : পানির প্রধান ব্যবহার*

| ব্যবহার | বিকল্প | গৃহীত পানির শতকরা হার |
|---|---|---|
| পানীয় জল | নাই | ১ - ১৫ |
| গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে | নাই | ১ - ১৫ |
| জনসাধারণ, নগর | নাই | ১ - ১৫ |
| পশু সম্পদ | নাই | ১ - ১৫ |
| সেচ কার্য | নাই | ১০ - ৮০ |
| নৌ-পরিবহন (Navigation) | স্থলযান | ০ - ১০ |
| জলশক্তি (Hydropower) | অন্যশক্তি | ০ |
| খনি (খনন কার্য - Mining) | নাই | ১ - ৫ |
| শিল্পে : শীতল ক্রিয়ায় | বায়ু | ০ - ৩ |
| প্রক্রিয়াজাতকরণ | যান্ত্রিক | ০ - ১০ |
| আবর্জনা নিষ্কাশন | বায়ু/যান্ত্রিক | ০ |
| বিনোদন | নাই | ০ |
| খাদ্য ঘাটতিপুরণ | ভূমি ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা | ০ |

পানির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা হচ্ছে-

- সমানুপাতিক (Reciprocal)
- সুনির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক
- আন্তর্জাতিক বা জাতীয় সীমানা অগ্রাহ্যকারী (Transnational boundaries)
- সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় (Changes over time)

পানির ব্যবহার ৩.২৬.৩ নং চিত্রে দেখানো হলো।

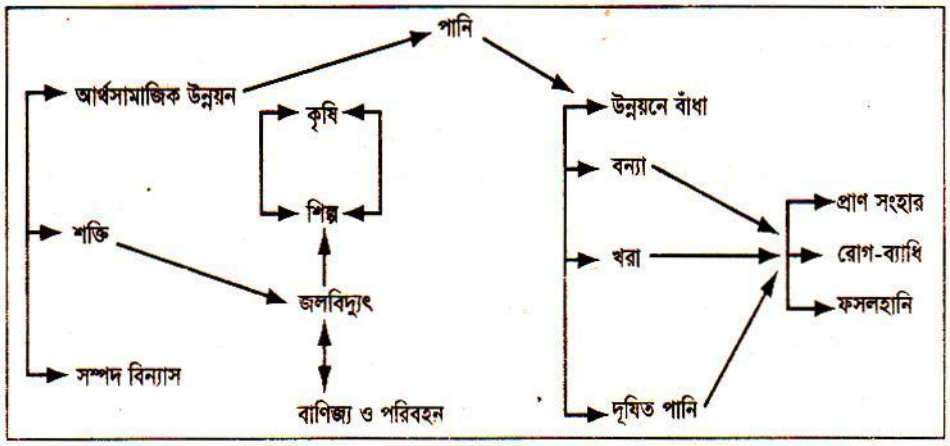


চিত্র ৩.২৬.৩ : পানি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

কয়েকটি বিশেষ ব্যবহার সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো:

*কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জলশক্তি পানিসম্পদ উন্নয়ন।*

## কৃষি

কৃষিক্ষেত্রে পানির সর্বাধিক পরিমাণ ব্যবহার হয়। একটি উদ্ভিদ তার উৎপন্ন শস্যের প্রায় ২০০০ গুণ বেশি পানি শোষণ করে। পরিকল্পিত সেচ প্রথম চালু হয় ৪০০০ বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক)। নীল নদ অববাহিকায় সেচ প্রচলন হয় ৩৪০০ বছর পূর্বে। চীনে ২২০০ বছর পূর্বে। চীনে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন একর জমি সেচের সাহায্যে তখন উর্বর করা হয়।

*মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক), নীলনদ আববাহিকা, চীনে।*

ভারত ও পাকিস্তানের ইন্দাজ অববাহিকায় ৯ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার ইম্পোরিয়াল অববাহিকায় ২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সেচ প্রকল্পের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, চাঁদপুর প্রকল্প এবং বরেন্দ্র প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

## শিল্প

শিল্পে পানির ব্যবহার সরাসরি কিংবা শুধুমাত্র শীতল কারক হিসাবে হয়ে থাকে। সরাসরি পানি ব্যবহৃত হয়- ডাইং শিল্প, পাম্প, অটোমোবাইলে, এ্যালুমিনিয়াম, মৎস্য শিল্প ও চামড়া শিল্প।
শিল্পে পানির ব্যবহার চাহিদা যুগের সাথে পরিবর্তিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।

*সরাসার কিংবা শীতলকারক হিসেবে।*

## বাণিজ্য

যোগাযোগের জন্য পানির উপর বিশাল বাণিজ্য নির্ভরতা রয়েছে। পরিবহনে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ ব্যবহারের ফলে কমে না, তবে কম হলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পানির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলে নৌ যোগাযোগ রক্ষিত হয়। বাণিজ্য ও নদী তীরবর্তী জনবসতির গতিও পানি প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে।

*যোগাযোগ*

## জলশক্তি

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৮ শতাংশ হতো জলবিদ্যুৎ থেকে। পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে এ পরিমাণ কমে দাড়িয়েছে শতকরা ৯ ভাগে। পানির স্থিতিশক্তি থেকে ঢাল বা নিচুস্থানে প্রবাহ হলে গতি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

*১৮ শতাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে।*

## পানি সম্পদ উন্নয়ন (Water resource management)

সমুদ্র, নদী, হ্রদ ও জলধারাগুলো একত্রে এমন একটা পটভূমি তৈরি করেছে যার ফলে জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ ও সংমিশ্রন সম্ভব হয়েছে। পানি জৈব সমতা বিধান করে সবার জীবন ধারণের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করেছে। পানির মান জীবন ধারণের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, দুষিত পানি জীবন সংহারী। প্রযুক্তি ব্যবহার ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রনের উপর নির্ভর করছে মানুষের ভবিষ্যৎ।

*জীবনের উৎপাত্ত, বিকাশ ও সংমিশ্রণ।*

## পানি ও ঝুঁকি

- দূষিত পানি (রাসায়নিক ও ভৌত)
- বন্যা (অতিবৃষ্টি, হিমশৈল গলন)
- সমুদ্র স্ফীতি।

পানির মাধ্যমে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা পেতে অনেক পূর্বেই সচেতনতা গড়ে উঠেছে। নীল নদের তীরে বাঁধ নির্মিত হয়েছে প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। পানির চলন (Hydrodynamic) নিয়ন্ত্রণ করে

প্রকৌশলীগণ এর ব্যবহার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেন। খাল খনন, নালা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করে পানিকে সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষুধা নিবৃতির জন্য সেচ সুবিধা বর্ধিত করা জরুরী। বর্তমান চাষযোগ্য জমির মাত্র ১৩ শতাংশ সেচ সুবিধা পায়। মরুকরণ (Desertification) রোধে ও সেচ প্রচলন প্রয়োজন।

*পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নারী ও শিশুরা ৫০ শতাংশ সময় ব্যয় করে পানি সংগ্রহ করে।*

পানযোগ্য পানির সার্বিক সরবরাহ অপ্রতুল। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ নদীবাহী পানি মানুষের ব্যবহারে ব্যয় হয়, ২০২৫ সালে এ হার দাঁড়াবে ৭০ শতাংশে। প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহের আওতা বহির্ভুত। আগামী ৩০ বছরে ৫.৫ বিলিয়ন লোক পানি সম্পদের অপ্রতুলতার মাঝে বাস করবে।

বিগত দুই শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১ বিলিয়ন থেকে (১৮০০ সাল) থেকে ৬ বিলিয়ন (২০০০ সালে) দাঁড়াবে। ১৯৬৪ সালের হিসাব অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে ১.১ বিলিয়ন লোক গ্রামে বাস করে যাদের মধ্যে ৮০০ মিলিয়ন লোক পানযোগ্য জলের সরবরাহ পায় না। নগর সুবিধার ৪০ শতাংশ (১৪০ মিলিয়ন) পানি সরবরাহের আওতা বহির্ভূত। ৯০ মিলিয়ন লোক গণ সরবরাহ (Public outlet) থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। নগরেও প্রতি নয় জনে ১ জন পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নারী ও শিশুরা তাদের ৫০ শতাংশ সময় ব্যয় করে পানি সংগ্রহে। উন্নয়নশীল বিশ্বে ১.১ বিলিয়নের মধ্যে ১ বিলিয়ন মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে পানি সংগ্রহ করে; ফলে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। প্রতি বছর৫০ মিলিয়ন লোক বিভিন্ন জলবাহী রোগে আক্রান্ত হয়; আক্রান্ত শিশুর ৫০ শতাংশ যার পরিমাণ ১০ মিলিয়ন মৃত্যুবরণ করে থাকে (Water for Peace, 1967)। কেবল মাত্র ডায়রিয়া জাতীয় রোগে মৃত্যুবরণ করে ৩ মিলিয়ন (Water and population dynamics, 1996)।

পরিবেশ দূষণের ফলস্বরূপ গ্রীণহাউস প্রভাবের ফলে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্র স্ফীত হচ্ছে। নিম্নাঞ্চলের ভূ-ভাগ, যেখানে ২৫ শতাংশ লোক বাস করে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। পানি সম্পদ অভিশাপ হয়ে পরিবেশ বিপর্যয় ত্বরান্বিত করবে। এসব থেকে উদ্ধার পেতে পরিবেশে পানির ব্যবহার সুষ্ঠু ও রক্ষণ অতি জরুরী। কয়েকটি বিষয়ের উপর এজন্য গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

১. জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখা অতীব প্রয়োজন;
২. সম্মিলিত প্রচেষ্টা জল ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ;
৩. পানি সহজলভ্যতা (Access to water) মানুষের অধিকার;
৪. পানি সম্পদ ইস্যু একটি যৌথ শৃঙ্খলা বিশিষ্ট উপস্থাপন;
৫. পরিবেশ সচেতনতা মানুষের প্রয়োজনেই জরুরী;
৬. অ-কাঠামোগত সমাধান পানি সম্পদ উন্নয়নে বেশি কার্যকরী;
৭. পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান পানি সম্পদ নিয়ে মত পার্থক্য দূর করতে পারে;
৮. নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পানির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং
৯. গণশিক্ষা অতীব জরুরী।

*পানি সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব কি?*

## পরিবেশ ও জলতত্ত্ব

*বাস্তব্য সমতা ও পরিবেশের স্বাভাবিক মান।*

পানির মান, প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাস্তব্য সমতা (Ecological Balance) এবং পরিবেশের স্বাভাবিক মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বর্ধনশীল জনসংখ্যা, শিল্পকারখানা, নগরায়ন, প্রযুক্তি প্রভৃতি দিনে দিনে পানির উৎসকে দূষিত করে তুলছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণ অসম্ভব হবে যদি পানি দূষণ অব্যহত থাকে। এ সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ১৯৭৫ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৪ বিলিয়ন। প্রতিদিন বাড়ছে ২ মিলিয়ন। ২০০০ সালে জনসংখ্যা হবে ৬ বিলিয়ন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে দাঁড়াবে ১০-১৬ বিলিয়নে। ফলে অবস্থা বিপর্যয়কর হয়ে পড়বে।

পরিশুদ্ধ করে পানি পুন: ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য সরবরাহ, সেচ ও দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের জন্য পানির চাহিদা বাড়বেই। বর্ধিতাকারে খাদ্য উৎপাদন ও কীটনাশক ব্যবহারে পানি দূষণও বাড়বে। পানির এ দূষণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning)
২. সুনির্দিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (Policies)
৩. সম্মিলিত অংশগ্রহণ (Combine Participation)
৪. মতভেদ দূরীকরণ (Conflict resolution)
৫. শিক্ষা ও যোগাযোগ (Education & Communication)
৬. লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate Technology) এবং
৭. ভবিষ্যৎ গবেষণা (Future Research)।

*স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।*

এসব বিষয় অগ্রগতির জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ প্রয়োজন। সংগঠনের পরিধি অনুযায়ী এসব কার্যক্রমে নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

**আন্তর্জাতিক পর্যায়ে**

- পানি, পরিবেশ এবং পৃথিবীর জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান;
- নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ;
- নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (River basin authorities);
- আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO)।

**জাতীয় পর্যায়ে**

- মন্ত্রণালয় ও সরকার: অর্থ, পরিকল্পনা, কৃষি, পরিবেশ এবং সামাজিক দপ্তর সমূহের অংশ (Sectors) গ্রহণ;
- স্থানীয় সরকার (Local Government);
- বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (NGO)।

**স্থানীয় পর্যায়ে**

- পরিবেশ ও উন্নয়নে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ;
- স্থানীয় জনগণ (Community residents);
- জাতীয় পানি কমিশন নামক সংগঠন ও সংগঠক

- স্থানীয় পেশাজীবি ও কলকারখানার মালিকগণ।

*বিশুদ্ধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য কি প্রয়োজন?*

## পাঠসংক্ষেপ

ভূ-পদ্ধতি স্থল, পানি ও বায়ু নিয়ে গঠিত। ভূ-পদ্ধতির এ গঠন উপাদান সমূহ পরস্পর নির্ভরশীল। জীবের উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও বিকাশে পানি অপরিহার্য। পানি তরল, কঠিন বরফ বা বাস্পাকারে গ্যাসীয় রূপে আছে। ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। মানব সভ্যতার দৈনন্দিন প্রয়োজনে পানি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব ব্যবহারে পানির কোন বিকল্প নাই। বিশুদ্ধ পানির জন্য চাই সুনির্দিষ্ট স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত কার্যক্রম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৬

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও–** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ ভূ-পৃষ্ঠে তরল অবস্থায় সমুদ্রে পানির মোট পরিমাণ-

ক) নির্ধারণ করা হয়নি খ) ১.৩৫ * ১০৯ ঘ: কি.মি.

গ) ২.৩৫ * ১০৯ ঘ: কি.মি. ঘ) ০.৭৭ * ১০৯ ঘ: কি.মি.

১.২ মানুষের শরীরের পানি প্রতিদিন প্রতিস্থাপিত হয় শতকরা-

ক) ৬৫ ভাগ খ) ৭ ভাগ

গ) ৫ ভাগ ঘ) ৩৫ ভাগ

১.৩ প্রথম সভ্যতা যেখানে গড়ে ওঠেনি-

ক) নীল নদের অববাহিকায় খ) টাইগ্রীস নদীর অববাহিকায়

গ) মধুমতির নদীর অববাহিকায় ঘ) ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়

১.৪ আর্থসামাজিক উন্নয়নে পানির ভূমিকা-

ক) বিপরীতানুপাতিক খ) সমানুপাতিক

গ) আন্তর্জাতিক সীমানা অনুযায়ী ঘ) সময় অগ্রাহ্যকারী

১.৫ প্রথম সেচ ব্যবস্থা চালু হয়-

ক) ইরাকে ২২০০ বছর পূর্বে খ) নীলনদ অববাহিকায় ৩৪০০ বছর পূর্বে

গ) চীনে ৪০০০ বছর পূর্বে ঘ) মেসোপটেমিয়ায় ৪০০০ বছর পূর্বে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময়: ২X৬ = ১২ মিনিট) ঃ

১. ভূবৈচিত্র্য গঠন ও জীবনের সাথে পানির সম্পর্ক কি?
২. পৃথিবীতে পানির বন্টন কিরূপ?
৩. পানির সাথে জীবনের সম্পর্ক কি?
৪. পানির ব্যবহার কি?
৫. পানি সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব কি?
৬. বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির জন্য কি প্রয়োজন?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পানির সাথে জীবনের সম্পর্ক কি? পানির বন্টন সম্পর্কে লিখুন।
২. পানির বিবিধ ব্যবহার কি কি? পানি ও ঝুঁকি সম্পর্কেলিখুন।
৩. পরিবেশের সাথে সম্পর্ক ও জলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

# পাঠ ৩.২৭ : সমুদ্র ও স্থলভাগের সাধারন বিন্যাস
(General distribution of land and Sea)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ স্থল ও সমুদ্র ভাগের আয়তনগত পরিমাপ, স্থলভাগ ও সমুদ্র ভাগের গড় উচ্চতা বা গভীরতা এবং বন্টনের শতকরা হার;
- ◈ সমুদ্র তলের ভূচিত্র;
- ◈ স্থল ও সমুদ্রভাগে কার্যরত ভূ-গঠন প্রক্রিয়া;
- ◈ ভূ-গঠন ক্রমধারা, সময়ের ব্যাপ্তি ও পরিমাপ গত বিশ্লেষন;
- ◈ একটি নির্দিষ্ট ভূতলের আলোকে কোনো অঞ্চলের উচ্চতা ভিত্তিক ভূ-বন্টন;
- ◈ সাম্প্রতিক কালে কার্যরত ভূ-কাঠামোগত ধীর প্রক্রিয়া।

ভূ-পৃষ্ঠদেশের প্রায় ৭৫ পাললিক শিলায় গঠিত হলেও ভূ-ত্বকে এর আয়তন মাত্র ৫%।

## ভূ-বৈচিত্র্য এবং সমুদ্র (Land forms and Ocean)

পৃথিবীর বাইরের আবরণ নিয়ে ভূ-ত্বক গঠিত। এর পুরুত্ব বহিরাবরনের মাত্র ৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার; যার বেশীর ভাগই আগ্নেয় অথবা রূপান্তরিত শিলায় তৈরী। পাললিক শিলার স্তর কেবলমাত্র ভূ-ত্বকেই এবংপৃষ্ঠদেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ আবৃত করে আছে। ভূ-ত্বকে পাললিক শিলার আয়তন মাত্র ৫ শতাংশ।

ভূ-ত্বক মহাদেশীয় (Continental) অঞ্চলে সমুদ্র তলদেশের ত্বক অপেক্ষা অধিক পুরু (চিত্র ৩.২৭.১)। মহাদেশীয় অঞ্চলে ভূ-ত্বক ৪০ কিলোমিটার সমুদ্রের নীচে পানি ছাড়া ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ৫ কিলোমিটার।

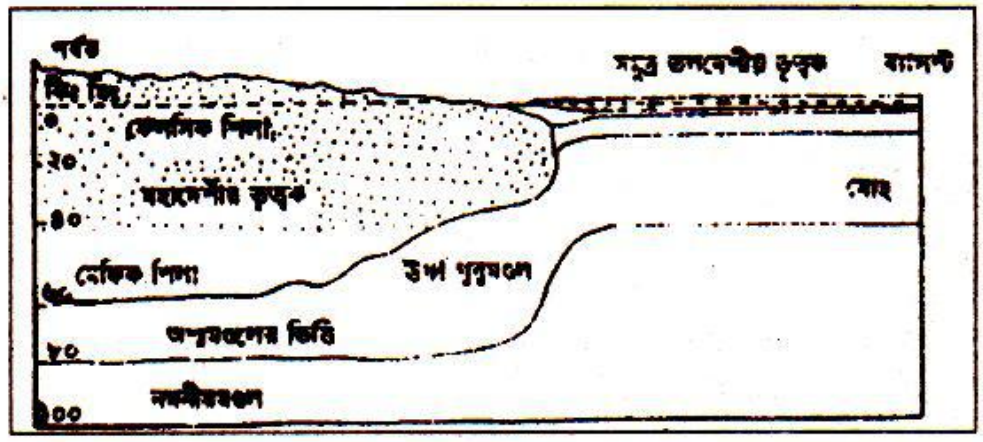


*চিত্র ৩.২৭.১: মহাদেশীয় অঞ্চলে ভূ-ত্বক সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বকের তুলনায় বেশী পুরু। চিত্রে ভূ-ত্বকের পুরুত্ব দেখানো হয়েছে।*

### *ভূ-ত্বক কি?*

স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার এর কম উঁচু।

পৃথিবীর বন্ধুরতার প্রাথমিক বিন্যাস হচ্ছে মহাদেশ ও সমুদ্র। পৃথিবীতে স্থলভাগ ২৯% এবং সমুদ্র ৭১% মোটামুটি এ হিসাব অনুযায়ী বন্টিত। উপকুলবর্তী অঞ্চল মূলত: অগভীর জলরাশি দ্বারা নিমজ্জিত যা ১৮০ মিটারের কম। মহীসোপান হঠাৎ করেই মহীঢাল হয়ে গভীর সমুদ্র তলে রূপ নেয়। যদি কখনো সমুদ্র সমতল ১৮০ মিটার নীচে চলে যায় তাহলে স্থলভাগ আয়তনে বেড়ে যাবে

৩৫ শতাংশ এবং সমুদ্র ৬৫ শতাংশ কমে যাবে। স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র ১ কিঃ মিঃ এর কম উঁচু। সাগর তলের বেশীর ভাগই সমুদ্র সমতল হতে ৩ থেকে ৬ কিলোমিটার গভীরে। পৃথিবীর বৃত্তচাপীয় অবস্থা অগ্রাহ্য করলে মহাদেশগুলিকে সমতল সমুদ্রের উপর মঞ্চের (Platfrom) মত মনে হবে।

**সমুদ্র**

মহাদেশগুলির মাঝে সমুদ্র নিম্নস্থান ও জলাধার হিসাবে অবস্থান করে। সাধারণত সমুদ্রতল ভূমি তটরেখা থেকে মৃদু ঢালে (Gentle slope) নেমে প্রায় ১৩০ মিটার গভীরতায় পৌঁছে হঠাৎ করে ঢালের পরিমাণ বেড়ে যায়। মোটামুটি ভাবে তটরেখা থেকে এ স্থানের গড় বিস্তৃতি ৬৫ কিলোমিটার হয়ে থাকে। এ অঞ্চলকে বলা হয় মহীসোপান (Continental shelf)। স্থান ভেদে মহীসোপানের প্রস্থ ভিন্ন হতে পারে।

*সমুদ্র তলের গড় গভীরতা ৩.৭ কিঃ মিঃ এবং স্থলভাগের গড় উচ্চতা মাত্র ০.৮ কিঃ মিঃ।*

সমুদ্রতলের গড় গভীরতা ৩.৭ কি.মি. এবংস্থলভাগের গড় উচ্চতা মাত্র ০.৮ কি.মি। গভীরতম সমুদ্র স্থান হচ্ছে মারিয়ানা সমুদ্রখাদ (Marianas Trench), এটি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ; সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ১১ কিঃ মিঃ। হিমালয়ের মাউন্ট এভারেষ্ট সর্ব্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, উচ্চতা ৮.৮৫ কি.মি.। চিত্র ৪.১৮.২-এ ভূ-পৃষ্টের প্রস্থচ্ছেদ স্থলভাগ ও জলভাগের গড় উচ্চতা ও গভীরতা দেখানো হলো।

সমুদ্র তলের ভূ-বৈচিত্র স্থলভাগের মতই পর্বতমালা, উপত্যকা, ইতস্ত বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং বিস্তির্ণ সমভূমি নিয়ে গঠিত। বিশালায়তনের বরফের মাত্র এক দশমাংশ স্থলভাগে বাকী নব্বই শতাংশ বরফের চাঁই। চাই হিসাবে এন্টার্কটিকা মহাদেশ গঠন করেছে। এই বরফের গলন শুরু হলে তাহলে সমুদ্রতল উর্ধ্বমুখী হয়ে মহীসোপানের আয়তন বৃদ্ধি পাবে।

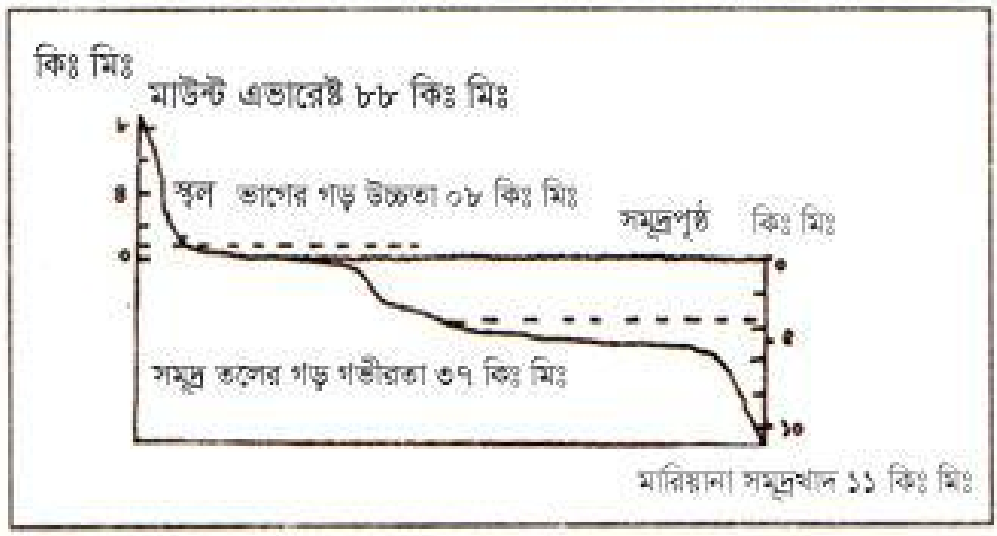


চিত্র ৩.২৭.২ : ভূ-পৃষ্ঠের প্রস্থচ্ছেদ, জল ও স্থলভাগের গড় গভীরতা ও উচ্চতার বিন্যাস।

*স্থল ও সমুদ্র বিণ্যাস কেমন?*

## সমুদ্র ও স্থলভাগের গঠন ও পরিবর্তন (Landforms, Ocean and their transformation)

ভূ-গঠন প্রকৃতি মূলত: নির্দিষ্ট নিয়ামক, তার পরিমাপগত সময় ও অবস্থানের উপর নির্ভর করেই ভূ-বৈচিত্রের জন্ম দেয়। পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে যে শক্তিগুলো সতত ক্রিয়াশীল সেগুলো হচ্ছে-

**১. অভ্যন্তরীন বল বা শক্তি (Endogenic force)**

ক. ধীর বল (Slow force), যেমন - মহাদেশ গঠন প্রক্রিয়া, পর্বত গঠন প্রক্রিয়া, ভূ-আন্দোলন (Diastrophism), ইত্যাদি।

খ. আকস্মিক শক্তি (Sudden force), যেমন- ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি।

**২. বহিঃশক্তি (Exogenic force)**

বৃষ্টিপাত, তুষার বা হিমশৈল, সূর্যালোক, নদী প্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি।

এ শক্তি সমূহ ভূ-ত্বক গঠনের শিলা সমূহের উপর ক্রিয়া করে ভূমিকম্পের কারণ ঘটায় অথবা ক্ষয়কার্য সাধন করে নব ভূমিরূপের জন্ম দেয়। নিম্নের সারণিতে ভূ-গঠনের মূল ভাগ সমূহ ও ক্রমধারা দেখানো হলো:

*সারণি ৩.২৭.১ : ভূ-গঠনের ক্রমধারা*

| দল (Order) | ক্রম ধারা | আয়তন | ক্রিয়াশীল সময় (বছরে) | ভূ-গঠনের বৈশিষ্ট্য | উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি; ও নিয়ামক |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৭ | ১০ বর্গ সে.মি. | ১-১০ | আণুবীক্ষনিক গঠন; গঠন, বুনন ও কণার মসৃণতা | জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি, শিলার ধরনের উপর নির্ভর করে |
| ৩য় | ৬ | ১-১০ বর্গ মিটার | $১০^{২}$ | ক্ষুদ্রাকৃতির ভূ-গঠন, গিরিখাত সর্পিলাকার নদী ইত্যাদি | জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি শিলাতত্ব |
| | ৫ | ১০০ বর্গ মিটার | $১০^{৪}$ | ভূ-প্রকৃতিঃ চত্বর, গ্রাবরেখা ইত্যাদি | জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি; ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও শিলাতত্ত্ব |
| ২য় | ৪ | ১০ বর্গ. কি.মি | $১০^{৬}$ - $১০^{৭}$ | ভূ-কাঠামোগত অনিয়ম ঃ পর্বত, উপত্যকা, উর্ধ্ব অধ:ভাজ ইত্যাদি | ভূ-তাত্ত্বিক গঠন কাঠামো জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি |
| | ৩ | $১০^{২}$ - $১০^{৪}$ | $১০^{৭}$ বর্গ কি.মি. | ছোট ভূ-কাঠামোগত সমন্বিত রূপঃ হ্রদ অঞ্চল, গ্রস্থ উপত্যকা অঞ্চল, | প্লেটের সীমানায় সংঘর্ষ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হতে ইত্যাদি অনেক পার্থক্য নির্দেশ করে |
| ১ম | ২ | $১০^{৬}$ বর্গ কি.মি. | $১০^{৮}$ | বৃহৎ ভূ-কাঠামোগত সমন্বিত রূপঃ সমুদ্র মধ্য পর্বতমালা, গিরিখাত, ভঙ্গীল পর্বতমালা ইত্যাদি। | প্লেটের সীমানা সংঘর্ষ ভাঙ্গা ও বিকৃতির মাঝে স্থিত অংশ। |
| | ১ | $১০^{৭}$ বর্গ কি.মি. | $১০^{৯}$ | স্থলভাগ ও সমুদ্র বক্ষ | অশ্মমন্ডলীয় প্লেটের গঠন, স্থল ও জলভাগে পৃথকীকরণ |

*১ ঃ ২৫০০০ মাপের মানচিত্রে*

ভূ-গঠনের তৃতীয় দলটি ক্ষুদ্রাকৃতির বৈচিত্র্য সমন্বয়ে গঠিত, এগুলোকে কেবল মাত্র ১ ঃ ২৫০০০ মাপের মানচিত্রে দেখানো যায়। অত্যল্প এবং জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণেই এ জাতীয় ভূ-গঠন সম্ভব। দ্বিতীয় দলের গঠন প্রক্রিয়া ভূ-অভ্যন্তরের ক্রিয়া কলাপের সাথে বাহ্যিক ক্রিয়ার যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রথম দলের গঠন ভূ-অভ্যন্তরের বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন নির্দেশ

করে। দীর্ঘসূত্রী এ গঠনগুলো অনেক বড় অঞ্চল পর্যবেক্ষন বা উপগ্রহ মানচিত্র থেকে সনাক্ত করা সহজ।

*ভূ-বৈচিত্র্য কিভাবে সৃষ্টি হয়?*

ভূ-গঠন পক্রিয়া ও লব্ধভূমিরূপ বিশ্লেষন করে তিন প্রকার ভূমিরূপের বর্ননা দেওয়া যায়, যথাঃ ক) গঠন জাত, খ) সঞ্চিত ও গ) ক্ষয়িষ্ণু ধারার ভূমিরূপ। নিম্ন ছকে প্রতিটির বর্ণনা দেওয়া হল।

*সারণি ৩.২৭.২ : ভূমিরূপ গঠন ও পরিবর্তন।*

**ভূমিরূপ**

| **গঠন জাত (Constructional)** | **সঞ্চিত(Depositional)** | **ক্ষয়িষ্ণু (Destructional)** |
|---|---|---|
| • ভূ-আন্দোলনের ফলে<br>গ্রাবেন (Graben)<br>চ্যুতি পর্বত (Fault mountain) বিকৃতির ফলে<br>নিম্নভূমি<br>গম্বুজ পর্বত<br>ভঙ্গিল পর্বত ইত্যাদি<br><br>• অগ্ন্যুৎপাতের ফলে<br>লাভাময় ভূমি<br>জালামুখ<br>সিন্ডার কোন (Cindercones)<br>ক্রেটার হ্রদ (Crater takes)<br>ক্যালডেরা (Caldera) ইত্যাদি<br><br>• বিচুর্নী ভবনের ফলে<br>ট্যালাস (Talus)<br>হিমশিলা (Rock Glacier)<br>ভূমিধ্বসে সঞ্চিত পলল ইত্যাদি | • নদীজ<br>পলল পাখা, বদ্বীপ, সমভূমি<br>কোনস, (Cones) ইত্যাদি<br><br>• হিমবাহ<br>হিমরেখা, এস্কারস (Eskers)<br>ড্রামলিন (Drumlin)<br>বিধৌত সমভূমি (Out wash plain)<br>ইত্যাদি<br><br>• বায়ু তাড়িত<br>লোয়েস সমভূমি, বালিয়াড়ি. ইত্যাদি<br><br>• জোয়ার ভাটা ও ঢেউ তাড়িত<br>দূরবর্তী চর (Offshore bar)<br>বালুকাময় উপকুল স্পিট (Spits)<br>ইত্যাদি<br><br>• প্রাণিজ<br>প্রবাল প্রাচীর (Coral Reefs) | • নদীজ<br>ক) উপত্যকা, ক্ষয়জাত সমভূমি<br>খ) মনাডনক্স<br><br>• হিমবাহজাত<br>ক) ট্রাফ (Trough) সার্ক, কলস<br>খ) এ্যারিটিস, হর্ণ<br><br>• বায়ু তাড়িত<br>হলোস<br>ইয়ারঢাং<br><br>• জোয়ার ভাটা<br>ক) খাড়া সমুদ্র পাড়, চত্বর<br>খ) সমুদ্র স্ট্যাকস<br><br>• ভৌমজল<br>ক) জলাভূমি<br>খ) প্রাকৃতিক সেতু ইত্যাদি |

*বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপ কি কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতার প্রাথমিক বিন্যাস হচ্ছে মহাদেশ ও সমুদ্র। স্থলভাগ ২৯% এবং সমুদ্র ৭১% জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র ১ কি.মি. এর কম উঁচু। সাগর তলের অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র সমতল হতে ৩ থেকে ৬ কি.মি. গভীরে। সমুদ্র তলের ভূ-বৈচিত্র স্থলভাগের মতই পর্বতমালা গঠন ও পরিবর্তনে ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তি এবং বহিঃশক্তি ক্রমাগত কার্যরত আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৭

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ পাললিক শিলা ভূ-ত্বককে আবৃত করে আছে শতকরা -

ক) ৭০ ভাগ খ) ৭৫ ভাগ

গ) ৫ ভাগ ঘ) ১০০ ভাগ

১.২ মারিয়ানা সমুদ্র খাদের গভীরতা কিলোমিটারে -

ক) ৩.৭ খ) ০.৮

গ) ৮.৮৫ ঘ) ১১.০

১.৩ স্থলভাগের গড় উচ্চতা কিলোমিটারে -

ক) ৩.৭ খ) ০.৮

গ) ২৫ ঘ) ০.০৫

১.৪ বহিঃশক্তির উদাহরণ নয় কোনটি -

ক) বৃষ্টিপাত খ) বায়ুপ্রবাহ

গ) অগ্ন্যুৎপাত ঘ) সূর্যালোক

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময়: ২*৪=৮ মিনিট) ঃ

১. ভূ-ত্বক কি?
২. স্থল ও সমুদ্র বিন্যাস কেমন?
৩. কিভাবে ভূ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়?
৪. বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপ কি কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. ভূ-ত্বকে স্থল ও জলভাগ বিন্যাস কিরূপ, শতকরা হার ও ভূ-বৈচিত্র চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
২. স্থলভাগ ও জলভাগ গঠনের নিয়ামক, প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন বিশদ আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.২৮ : পানিচক্র (Hydrologic Cycle)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- পানিচক্র কি;
- পানি চক্রের চলন কিভাবে হয় এবং কি কি শক্তি পানি চক্রকে সচল রাখে;
- উদ্ভিদের বিণ্যাস কিভাবে পানি চক্রে প্রভাব ফেলে।

## পানিচক্র

পৃথিবীর পানিচক্র হচ্ছে আমাদের গ্রহে পানি ও আর্দ্রতার বিরামহীন পরিভ্রমণ।

সমুদ্র থেকে বায়ুমন্ডল ও স্থলভাগ হয়ে আবার সমুদ্রে পানির সাধারন পরিভ্রমনকেই পানি চক্র বলে।

পানি চক্রকে এভাবে সঙ্গায়িত করা যায় যে, সমুদ্র থেকে বায়ু মন্ডল ও স্থলভাগ ভূ-অভ্যন্তর হয়ে আবার সমুদ্রে পানির সাধারণ পরিভ্রমন যা কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়া যথা- বাস্পায়ন, বাস্পীয় প্রস্বেদন, বারিপাতের চুয়ানো (infiltration), প্রবাহ (runoff) অনুস্রাব (percolation) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। চিত্রের মাধ্যমে পানি চক্র উপস্থাপন করা যায়।

সমুদ্র থেকে বায়ুমন্ডল ও স্থলভাগ হয়ে আবার সমুদ্রে পানির সাধারণ পরিভ্রমণকেই পানিচক্র বলে।

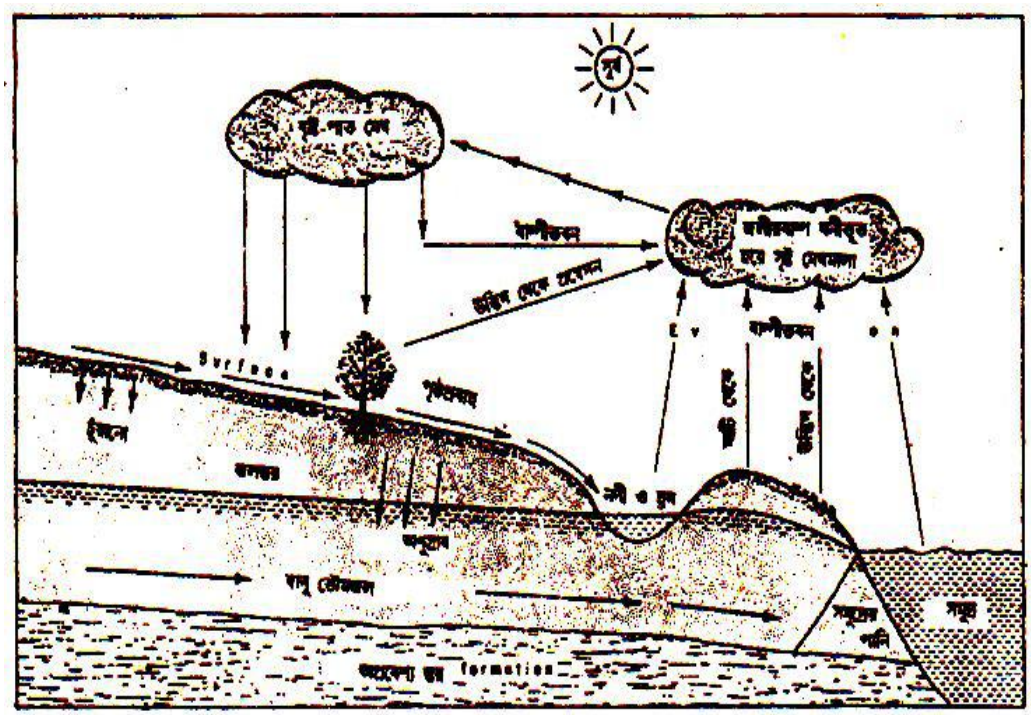

চিত্র ৩.২৮.১ : পানিচক্র

চিত্রের চক্রটিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে এর কোন শুরুও নেই শেষও নেই। কেননা সমুদ্র থেকে যদি বাস্পায়ন শুরু হয় তবে স্থলভাগকেও বাস্পী ভবনের কিছু কৃতিত্ব দিতে হয়। তবুও, যেহেতু সমুদ্র ভূ-পৃষ্টের চারভাগের তিন ভাগই দখল করে আছে তাই ধরা হয় যে পানি চক্রের শুরুটা সমুদ্র তলেই।

*চিত্রের মাধ্যমে পানি চক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা দিন?*

পানি চক্রের শক্তি হচ্ছে বিকিরণ রশ্মি (Radiation) অভিকর্ষ, আণবিক আকর্ষণ এবং কৈশিক আকর্ষণ (Capillary) যা প্রক্রিয়াকে ক্রিয়াশীল রাখে। পৃথিবীতে পানির সকল প্রকার অবস্থাগত পরিবর্তনই পানি চক্রের আওতাধীন। মনে করা হয় যে পৃথিবীতে পানির মোট পরিমাণ সম-সাময়িক ভাবে অপরিবর্তনীয়। অবিচ্ছিন্নতা মতবাদ (Continuity principle) অনুযায়ী বলা যায় ধরাব্যাপী সর্বমোট বাস্পীভূত জলরাশি বৃষ্টি বা অন্যভাবে বারিপাতের (Precipitation) সমষ্টির সমান যা সুত্রে প্রকাশ করা যায়।

*বিকরণ রাশ্মি অভিকর্ষ আণবিক আকর্ষণ এবং কৈশিক আকর্ষণ।*

$$P = E + I + R$$

বারিপাত = (বাস্পীভবন + প্রস্বেদন) + চুয়ানো + পৃষ্ঠপ্রবাহ

*(Precipitation = (Evaporation + transpiration) + Infiltration + Runoff)*

**পানিচক্রের চলন**

বাস্পীভবন সমুদ্রের উপরিভাগ এবং অন্যান্য উন্মুক্ত জলরাশির উপরিতলে হয়ে থাকে, এটি পানিকে বাস্পীয় অবস্থায় বায়ুতে তুলে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশে (Condition) এ বাস্প ঘনীভূত হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়; যা অবশেষে তার আর্দ্রতাকে বৃষ্টি, শৈল, তুষার কিংবা শিশির হিসাবে বারিপাত ঘটিয়ে থাকে। বারিপাত এমন হয় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠে যেমন হতে পারে, তেমনি সমুদ্রের আর্দ্রবায়ু তাড়িত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত ঘনীভূত মেঘ হয়ে স্থল ভাগেও হয়। স্থলভাগে বারিপাতের একাংশ তাৎক্ষণিক ভাবে বাস্পীভূত হয়; একাংশ স্থলভাগ সিক্ত করে সিঞ্চন বা প্রবাহের মাধ্যমে নালা নদী পথে সমুদ্রে পতিত হয়; বাকী পানি চুইয়ে ভূ-অভ্যন্তরে/ভূ-নিম্নে গমন করে। অনুস্রাবনের মাধ্যমে ভৌত পানি প্রবাহে এটি সমুদ্রে গিয়ে মেশে। সিক্তস্থলভাগ থেকে কিছু পানি বাস্পীভূত হয়, গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পাতার উপর থেকেই বাস্পীভবন প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়।

*বাস্পীভবন, আর্দ্র বায়ু, ঘনীভূত মেঘ।*

*পানি চক্র পরিচলন শক্তির ব্যাখ্যা দিন?*

**পানি চক্র : সঞ্চয় ও পুষ্টি/জৈব বিন্যাস** (Reserve and nutrients)

ভূ-পৃষ্ঠের সন্নিকটে পানি চক্র সূর্যালোকের শক্তিতে পরিচালিত হয়; পরিভ্রমনের এ ধারা আবার উদ্ভিদের পুষ্টি পরিক্রমার মূল চালিকা শক্তি। অনেক ঘটনা চক্রেই পানি তার পথে চলমান থাকে। যেমন বৃষ্টিপাতের পানি বাস্পীভবন, ঘনীবভনের মধ্য দিয়ে আসে। বারিপাতের পরিমাণ বা ধরন নিয়ন্ত্রনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে:

১. অববাহিকার জলতত্ত্বীয় এবং ভূ-বৈচিত্র্যের ধরন;

২. সময়ের সাথে অববাহিকায় জলবিদ্যা সম্পর্কিত জলপ্রপাত, তার একাংশ কিংবা বৃহৎ জলধারা এর ভূমিকার উপর।

*অভিগ্রাহী।*

বৃষ্টিপাতের অবস্থানের উপর নির্ভর করে সেটি নদীতে কিংবা ভূ-পৃষ্টে অথবা অভিগ্রাহী রূপে সঞ্চিত হবে। অভিগ্রাহী (Interception of Basin) আধার তৈরী হয় মূলত: বনভূমির বিন্যাস ও আকৃতির উপর নির্ভর করে। ঘনশস্য সমৃদ্ধ, উন্মুক্ত গ্রীষ্মমন্ডলীয় নিবিড় বনভূমি, মোটামুটি প্রথম এক মিলিমিটার জলকে এবং তার পরবর্তি মোট বারিপাতের প্রায় ২০ শতাংশকে অভিগ্রহণ করে থাকে। এ অংশের (নীট অভিগ্রাহী) ১৫ থেকে ১৯ শতাংশ বাস্পীভূত হয়ে যায়, ১ থেকে ৫ শতাংশ জলধারা কিংবা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে মাটিতে পৌঁছে।

সারণি ৩.২৮.১ : **গ্রীষ্ম মন্ডলীয় এবং বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের কাঠ জাতীয় গাছের পানি গ্রাহীতার তুলনা।**

| | গড় পানি গ্রহন % | জলধারা এবং ফোটায় ফোটায় নিঃসরণ % | সার্বিক পানি গ্রহন % |
|---|---|---|---|
| ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল বনভূমি (ব্রাজিল) | ৬৭ | ২৭ | ৪০ |
| স্বেত পাইন | ৩০ | ৪ | ২৬ |
| অ্যাসপিন / বার্চ | ১৫ | ৫ | ১০ |

*উচ্চ অক্ষাংশ, ফিল্ম, অপ্রবেশ্য শিলা, প্রবেশ্য শিলা অন্তগামী প্রবাহ।*

ভূ-পৃষ্ঠের সঞ্চয় মূলত: জলীয় বাস্পাকারে ঝরা পাতা (Litter) স্তরে, অবশেষ হিসাবে নীচু ভূমিতে এবং গতিময় অবস্থায় নদী নালায় থাকে। উচ্চ অক্ষাংশীয় বনভূমিতে ঝরা পাতা এর মধ্যে মোট বারিপাতের শতকরা ৫ ভাগ, সাধারন নতির (Slope) ভূ-ভাগের অতি আণুবীক্ষণিক নিম্নাঞ্চলে (microdepression) ৭ থেকে ১৩ মিলিমিটার পানি নিম্নভূমি আধার হিসাবে জমা থাকতে পারে। মাটিতে শোষনের পর বাকী পানি প্রবাহিত হয়। মাটির পানি শোষন/চুঁইয়ে (Infiltration) নির্ভর করে উদ্ভিদের প্রকৃতি ও ঝরা পাতা (পত্রাবশেষ) এর মাত্রার উপর।

মাটিতে পানি কণামধ্য ফিল্ম (Film) এ জমা থাকে; এর কিছু খাড়াভাবে নিম্ন শিলায় ভিত্তি প্রবাহ (baseflow) হিসাবে এবং আন্তগামী প্রবাহ (Through flow) সম্পৃক্ত অথবা অসম্পৃক্ত অবস্থায় প্রবাহিত হয়। সাধারনত প্রবেশ্য মাটির স্তর যখন নিম্নস্থ অপ্রবেশ্য শিলার উপর থাকে তখন খাড়া প্রবাহের চেয়ে আন্তগামী প্রবাহ অনেক বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে। পৃথিবীর জলচক্র এবং পানি সঞ্চয় অবস্থাকে নিম্ন ছকে বিশ্লেষণ করা যায় (চিত্র ৩.২৮.২)।

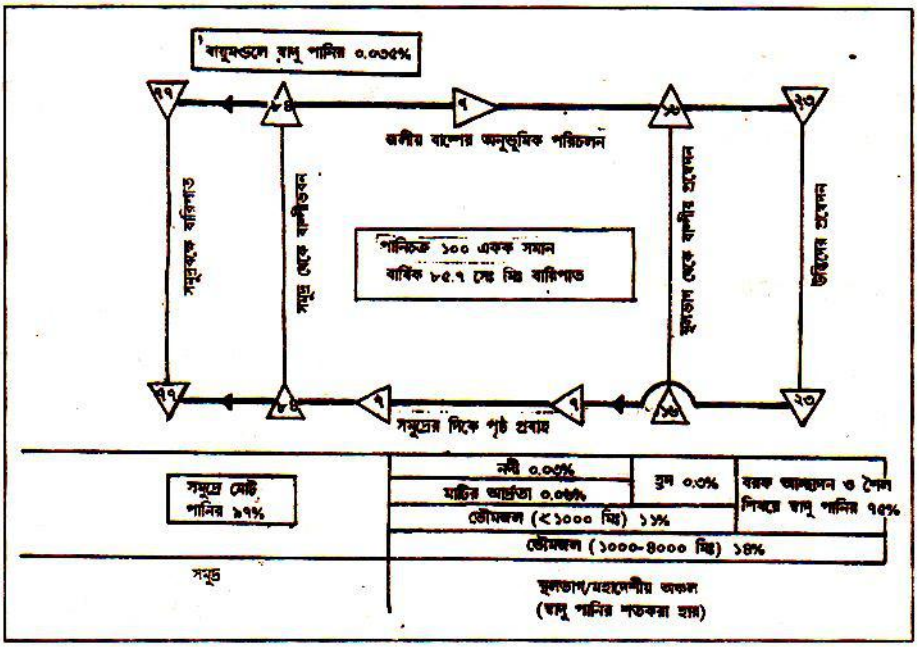


চিত্র ৩.২৮.২ : পৃথিবীর পানি চক্র ও সঞ্চয়ন অবস্থা।

*পানি সঞ্চয় ও জৈববিন্যাস কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

পানিচক্র পদ্ধতিতে সমুদ্র থেকে বায়ু, স্থলভাগ ভূ-অভ্যন্তর হয়ে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে। পানি চক্রের চালিকা শক্তির মধ্যে বিকিরণ রশ্মি, অভিকর্ষ, আণবিক আকর্ষণ এবং কৈশিক আকর্ষণ অন্যতম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৮

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও** (সময় ২ মিনিট) ঃ

১.১ পানি চক্র হচ্ছে -

ক) পানির বিরামহীন প্রবাহ খ) আর্দ্রতার বিরামহীন প্রবাহ

গ) পানি ও বাতাসের বিরামহীন প্রবাহ ঘ) পানি ও আর্দ্রতার বিরামহীন প্রবাহ

১.২ ভূ-পৃষ্ঠের সন্নিকটে পানিচক্র পরিচালিত হয়-

ক) সূর্যালোকের শক্তি দ্বারা খ) বাস্পীভবন ও প্রস্বেদন দ্বারা

গ) আণবিক শক্তি দ্বারা ঘ) বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২ * ৩ = ৬ মনিট) ঃ

১. পানিচক্র কি?

২. কি শক্তি দ্বারা পানিচক্র পরিচালিত হয়?

৩. পানি সঞ্চয় ও জৈববিন্যাস কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পানিচক্র বলতে কি বুঝায়? পানিচক্রের শক্তি ও নিয়ামক কি কি? এ পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করুন।

২. পৃথিবীর মোট পানি সঞ্চয়ন স্থান এবংচক্রে তার অবস্থান বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.২৯ : পৃথিবীতে পানি বন্টন (World water distribution)

**পানিবন্টন, সরবরাহ এবং নবায়ন** (Distribution of water supply and renewal)
পানি যে অবস্থায়ই থাকুক যেমন, বরফ, তুষার, বৃষ্টি, নদী অথবা সমুদ্রে তরল, পৃথিবীতে এর মোট পরিমাণ স্থির বা ধ্রুব।

**পৃথিবীতে পানি বন্টন** (World water distribution)
পৃথিবীতে মোট পানি আছে ১.৫ বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার অথবা ৩৯৬ বিলিয়ন গ্যালন। এর মধ্যে মাত্র ০.০০৩ শতাংশ স্বাদু পানি, নদী-নালা, হ্রদ বা ভূ-নিম্নস্থ আধারে আছে যা মানুষ বিশুদ্ধ পানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। বাকী ৯৯.৯৯৭ ভাগ পানি সরাসরি ব্যবহারের অনুপযোগী। পানির বন্টন নিম্ন সারণিতে দেখানো হয়েছে।

*১.৫ বিলিয়ন ঘন কি.মি. বা ৩৯৬ বিলিয়ন গ্যালন।*

*সারণি ৩.২৯.১ : পৃথিবীতে পানি বন্টন ও শতকরা হার*

| স্থান | আয়তন ১০১২ ঘনমিটার | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্থল ভাগে | | |
| স্বাদু হ্রদ | ১২৫ | ০.০০৯ |
| লবণাক্ত হ্রদ বা স্থলবেষ্টিত সাগর | ১০৪ | ০.০০৮ |
| নদী (গড় আয়তন) | ১২৫ | ০.০০০৪ |
| মৃত্তিকাস্থ আর্দ্রতা | ৬৭ | ০.০০৫ |
| ভূ-নিম্নস্থ পানি | | |
| ৪০০০ মিটারে উপরিস্থ | ৮৩৫০ | ০.৬১ |
| বরফচ্ছাদন ও তুষার | ২৯২০০ | ২.১৪ |
| স্থল ভাগের মোট পানি (পূর্ণসংখ্যা) | ৩৭৮০০ | ২.৮ |
| বায়ু মন্ডলে (জলীয় বাস্প) | ১৩ | ০.০০১ |
| সমুদ্রে | ১৩২০০০০ | ৯৭.৩ |
| **সর্বমোট (পূর্ণসংখ্যা)** | **১৩৬০০০০** | **১০০** |

*পৃথিবীতে পানি বন্টন অবস্থা কি রূপ?*

পৃথিবীতে পানির ৯৭.১ ভাগ লবনাক্ত হ্রদ ও সমুদ্রে আছে যা চাষাবাদ বা পানের অযোগ্য, বাকী ২.৯ ভাগ পানি যদিও স্বাদু তবুও ব্যবহার উপযোগী নয়। এ পানি তুষারে, হিমশৈলে, জলীয় বাস্পে, মাটিতে অথবা ভূ-পৃষ্ঠের অতি গভীরে অবস্থান করে। এ পানির মাত্র ০.৩২ শতাংশ স্বাদু পানি নদী-নালা, হ্রদ এবং ভূ-পৃষ্ঠের তুলনামূলক কম গভীরে আছে। স্বাদু পানি লবণাক্ত পানির চেয়ে পরিমাণে দ্রবীভূত পদার্থ সম্বলিত হয়, তার মানে এ নয় যে, স্বাদু পানি মাত্রই গ্রহণ

*স্বাদু পানি মাত্রই গ্রহণ উপযোগী নয়।*

উপযোগী। যোগাযোগের অপ্রতুলতা এবং দূষিত হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই পানি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।

ছোট একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মনে করি পৃথিবীতে মোট পানি আছে ১০ গ্যালন।

লবনাক্ত পানি বাদ দিলে স্বাদু পানি থাকবে ৪.৫০ কাপ।

এর মধ্যে হিমশৈল্য, তুষার আচ্ছাদন, মৃত্তিকাস্থ এবং জলীয় বাস্পস্থ জল হচ্ছে ৩.৫০ কাপ

অবশিষ্ট ১ কাপ থেকে দূষিত, দুস্প্রাপ্য অবস্থান, ব্যয়বহুল প্রাপ্যতা বাদ দিলে ব্যবহারযোগ্য স্বাদু পানি থাকবে মাত্র ১ মিলিলিটার বা ১০ ফোঁটা।

এর পরিমাণও কিন্তু কম নয়, এ ক্ষুদ্রাংশই হচ্ছে ৪৫০০০ ঘন কিলোমিটার। এ যদি হয় বাস্তব অবস্থা, তাহলে পৃথিবীতে পানির ব্যবহার সক্রিয় থাকছে কিভাবে? কথা হচ্ছে পানি চক্রের মাধ্যমে স্বাদু পানি বিরামহীন ভাবে পরিক্রমিত ও নবায়িত হচ্ছে। নবায়নের বা পরিচক্রের সময় ও ধারাও ভিন্নতর স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। নিম্ন সারণিতে এ পর্যায়টি প্রদর্শিত হলো।

*পরিক্রমিত ও নবায়িত।*

*সারণি ৩.২৯.২ : **পৃথিবীতে পানি সম্পদ, অবস্থান ও গড় নবায়িত সময়।***

| **অবস্থান** | **বিশ্বের পানির প্রবাহের শতকরা হার** | **নবায়িত হতে গড় সময়** |
|---|---|---|
| মহাসমুদ্র | ৯৭,১৩৪ | ৩১০০ বছর (৩৭০০০ বছর গভীর সমুদ্রে) |
| বায়ু মন্ডল | ০.০০১ | ৯ থেকে ১২ দিন |
| ভূ-পৃষ্ঠের উপর | | |
| - তুষারাচ্ছাদন | ২.২২৫ | ১৬০০০ বছর |
| - হিমশৈল্য | ০.০১৫ | ১৬০০০ বছর |
| - লবনাক্ত হ্রদ | ০.০০৭ | ১০-১০০ বছর (গভীরতার উপর নির্ভর করে) |
| - স্বাদু জলের হ্রদ | ০.০০৯ | ১০-১০০ বছর (গভীরতার উপর ভিত্তি করে) |
| - নদী | ০.০০০১ | ১২-২০ দিন |
| ভূ-পৃষ্ঠের ভিতর | | |
| - মৃত্তিকাস্থ জলীয় বাস্প | ০.০০৩ | ২৮০ দিন |
| - ভৌমজল (১ কি.মি. গভীরতা পর্যন্ত) | ০.৩০৩ | ৩০০ বছর |
| -১ কি.মি. থেকে ২ কি.মি. গভীরে | ০.৩০৩ | ৪,৬০০ বছর |
| **মোট** | **১০০** | |

এটা লক্ষণীয় যে মাত্র ০.০০০৯ শতাংশ পানি জৈবমন্ডল হয়ে নবায়িত হয়। পৃথিবীর পানি সম্পদের নবায়নে সময় লাগে ১০ থেকে ৩৭০০০ বছর। শুধুমাত্র বায়ু মন্ডলের পানি নদী ও মৃত্তিকাস্থ পানি নবায়িত হতে কম সময় নেয়। জীবিত অবস্থায় জৈব দেহেও জল নবায়িত হয়। গাছে, তার বৃদ্ধির পুরো সময়টাতে অন্তত হাজার বার এবং মনুষ্য দেহের যে ৬৫ ভাগ জল তা প্রতিবছর অন্তত কয়েকবার নবায়ন হয়।

*৮০ থেকে ৩৭০০০০ বছর।*

স্বাদু পানির দুটি মূল উৎস হচ্ছে অতি অল্প সময়ে নবায়নক্ষম (১২-২০ দিন) নদী আর ধীর নবায়নযোগ্য (৩০০ বছর) ভৌম জল (১ কি.মি. গভীরতা পর্যন্ত)। স্থল ভাগ থেকে যে পরিমাণ জল বাস্পীভূত হয় স্থলভাগে পতিত বারি তার থেকে মাত্র শতকরা দশ ভাগ বেশী। এ অতিরিক্ত জলই নদ নদীর প্রবাহ সচল রাখে যার পরিমাণ বছরে প্রায় ৩৮০০০ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ প্রতিদিন ১০৪ ঘন কলিোমিটার। আসলে এ প্রবাহের বেশীর ভাগই মানুষের ব্যবহার আওতার বাইরে হয়।

ভৌম জল বারিপাতের ফলেই অনুস্রাব বা চুইয়ে জমা জলরাশি। ভৌম জল এভাবে ভূ-গর্ভে বালুকাময় শিলার কণামধ্য ফাঁকা স্থানে জমা হয়ে থাকে।

ভৌম জল স্তর (Water Table) হ্রদ, জলাভূমি বা বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি অথবা পৃষ্ঠেই হয়ে থাকে। শুষ্ক অঞ্চলে ভৌমজল স্তর অনেক নীচুতে থাকে অথবা আদৌ থাকে না। এ জলস্তরের নীচের পানি ধীর গতিতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, প্রবাহ মাত্রা নির্ভর করে উচ্চতা, জলস্তরের সাথে সমুদ্র তলের অবস্থান, শিলার প্রবেশ্যতা (Permeability) ইত্যাদির উপর। স্বাদু জলের প্রাপ্তির জন্য নলকুপ খনন করা হয়। যদি কুপটি আবদ্ধ ভৌমজলাধারে (Confined aquifer) হয় তবে ভূ-ত্বকের চাপে আপনা আপনিই জল নির্গত হবে। এ ধরনের কুপকে আর্টেসিয়ান কূপ (Artesian Well) বলে। পৃথিবীতে সরবরাহকৃত স্বাদু জলের ৯৫ শতাংশ আসে ভৌম জল থেকে।

*আমাদের প্রাত্যাদনের ব্যবহৃত স্বাদু পানির ৯৫% আসে ভৌমজল থেকে শিলার প্রবেশ্য অটোসয়ান কুপ।*

নদী-নালা হ্রদ বা ভৌমজল প্রকৃত পক্ষে বারিপাতের মাধ্যমেই তাদের শূন্যতা পূরণ করে। গড় বৃষ্টিপাতের মাত্রা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। বৃষ্টির পানি দ্রবীভূত ক্ষয়কার্য ও দ্রবীভূত শিলা বা মৃত্তিকা কণার মাধ্যমে দূষিত হয়, রাসায়নিক সংমিশ্রনেও স্বাদু পানি দুষিত হতে পারে।

স্বাদু পানির বন্টন নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উপর নির্ভর করে:

১. জলবায়ুর ভিন্নতার ফলে বাস্পীভবনের ভিন্নতা হয়;

২. বাৎসরিক প্রবাহ বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন রকম হয়।

মোট বৃষ্টিপাতের গড় ৩৩ থেকে ৪২ শতাংশ পানি নদীজ বা ভৌমজলের মাধ্যমে সমুদ্রে পড়ে। বাস্পীভবন বহুল অঞ্চলে এ মাত্রা আরো কম হতে পারে।

*পানি নবায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?*

## পানি চক্রের বহুমুখীতা ও জৈব বিন্যাসে ভূমিকা

(Diversion of the Hydrological Cycle and role in Nutrient distribution)

পানি চক্রে অংশগ্রহনকারী সার্বিক প্রক্রিয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন রূপে পানির চলনের মোটামুটি হিসাব নিম্ন সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

*স্থান ও রূপ-এর ভিন্নতায়।*

*সারণি ৩.২৯.৩ : **পানি চলন প্রক্রিয়া ও তার পরিমাণ***

| পানি চলন প্রক্রিয়া | ঘন কিলোমিটার ($Km^3$) |
|---|---|
| বিশ্ব ব্যাপী বার্ষিক বারিপাত | ৫২৫২০০ |
| সমুদ্রে বারিপাত | ৪১১৬০০ |
| স্থলভাগে বারিপাত | ১১৩৬০০ |
| পৃষ্ঠ প্রবাহ বা উষ্ণতলে ভৌম পানি | ৪১০০০ |
| বন্যা ছাড়া স্থায়ী প্রবাহ | ১৪০০০ |
| লোকালয়ে কিছু পতিত পানি | ৫০০০ |
| মানুষের ব্যবহার উপযোগী | ৯০০০ |
| প্রকৃত ভিন্নমূখী পরিবর্তন | ৩৫০০ |
| মানুষের মাধ্যমে পরিবর্তন | ৫০০০ |

ভূ-গঠন বৈচিত্র্যে তিনটি মূল শক্তি কাজ করে থাকে। এদের বিন্যাস হচ্ছে।

১. সৌরশক্তি (Solar Energy);

২. পর্বত বা ঢালে জলশক্তি (Hydropower);

৩. পুষ্টি চক্রের শক্তি বা জৈবিক ক্রিয়াজাত শক্তি (Nutrient Energy)।

*সৌরশক্তি, জলশক্তি, জৈবশক্তি।*

এ শক্তি গুলির মূল হচ্ছে সৌরশক্তি। জলশক্তি জৈবশক্তির বিন্যাসকে সূচারু রূপে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে পৃথিবীর জৈব বিন্যাস স্বাদু পানির প্রবাহ এবং স্থলভাগও সমুদ্রের সংযোগ অঞ্চলে নিবিড় হয়ে থাকে। মরুতে যেমন খুব কম বৃক্ষ জন্মায়, তেমনি শৈল শিখরেও জীবের সহজাত প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় না । মোট কথা শক্তি সমুহ একে অপরের উপর নির্ভর ও সমতা বিধান করে চলে।

*জৈব বিন্যাসে পানিচক্রের ভূমিকা কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ ৩৯৬ বিলিয়ন গ্যালন বা ১.৫ বিলিয়ন ঘন কি. মি.। এ বিপুল পরিমাণ পানির মাত্র ০.৩২ শতাংশ পানি নদী-নালা, হ্রদ এবং ভূ-পৃষ্টের কম গভীরতায় আছে এবং ৯৭.১ ভাগ পানি লবনাক্ত হ্রদ ও সমুদ্রে যা চাষাবাদ ও পানের অযোগ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২৯

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ২ মিনিট) ঃ

১.১ স্বাদু পানি মোট পানির -

ক) ৯৭% খ) ২.৯%

গ) ০.৬২% ঘ) ০.২৬%

১.২ ভূ-গঠন বৈচিত্র্যে কার্যকরী মূলশক্তি নয়-

ক) সৌর শক্তি খ) পারমানবিক শক্তি

গ) জৈবিক ক্রিয়াজাত শক্তি ঘ) পর্বত ঢালে জলশক্তি

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২ * ৩ = ৬ মনিট) ঃ

১. পৃথিবীতে পানি বন্টন অবস্থা কিরূপ?

২. পানি নবায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩. জৈব বিন্যাসে পানিচক্রের ভূমিকা কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. পানি বন্টন, সরবরাহ ও নবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. জৈব বিন্যাস ও ঘনত্বে পানিচক্রের যোগসূত্র/প্রভাব কি?

# পাঠ ৩.৩০ : সম্পদ হিসাবে পানি (জন সচেতনতা সৃষ্টি)

Water as a Resource (Including Public awareness Building)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ সম্পদ হিসাবে পানির গুরুত্ব;
- ◈ পানির ব্যবহার ও এর গুণাগুণ;
- ◈ পানির ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও বিবিধ ব্যবস্থাপনা;
- ◈ উৎপাদন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অপচয় রোধে কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে।

## সম্পদ হিসাবে পানি

পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য পানি অপরিহার্য। জীবদেহে বিপাক ক্রিয়া রাখতে পানি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবগুলি পানি ছাড়া বাঁচতেই পারে না। প্রাণী পানি ব্যতিত অতি দ্রুত মৃত্যু বরণ করে। প্রাণী ও উদ্ভিদের পানি শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, বরং প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি। মানুষ পানির সরবরাহ বা রাসায়নিক গুণের সামান্য তারতম্যেই আক্রান্ত হয়। পানি মাটিস্থ পুষ্টিকে দ্রবীভূত (Dissolved) ও পরিবহন করে উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে সরবরাহ করে। অনেক আবর্জনা বিগলন ও তরলীকৃত করে সালোক সংশ্লেষণের কাঁচামাল সরবরাহ করে, যা জীবিত সকল জীবের খাদ্য জোগায়। খাদ্য ছাড়া দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকা সম্ভব কিন্তু পানি ছাড়া নয়।

মানুষের ব্যবহার যোগ্য প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদের মধ্যে জৈব জ্বালানী, সৌরশক্তি, বায়ু ও পানি সম্পদ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে জৈব জ্বালানী বলতে গেলে অতি সামান্য অথবা একেবারেই নবায়ন (পুনঃ ব্যবহার) যোগ্য নয়। অন্যদিকে পানি সম্পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার উপযোগী করা যায়। সুতরাং পানি এমন একটি সম্পদ যা মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে পরিশোধিত নবায়ন যোগ্যতা পায়। চিত্র ৩.৩০.১ এ সম্পদ গুলির ব্যবহার ধর্মের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জৈব জ্বালানী সমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুদ ব্যবহারের ক্রমহ্রাসের ফলে নিঃশেষ হতে পারে কিন্তু পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার এবং নবায়ন এটিকে অসীম সম্পদে পরিণত করতে পারে।

*পানি সম্পদ পুনঃপুন ব্যবহার উপযোগী।*

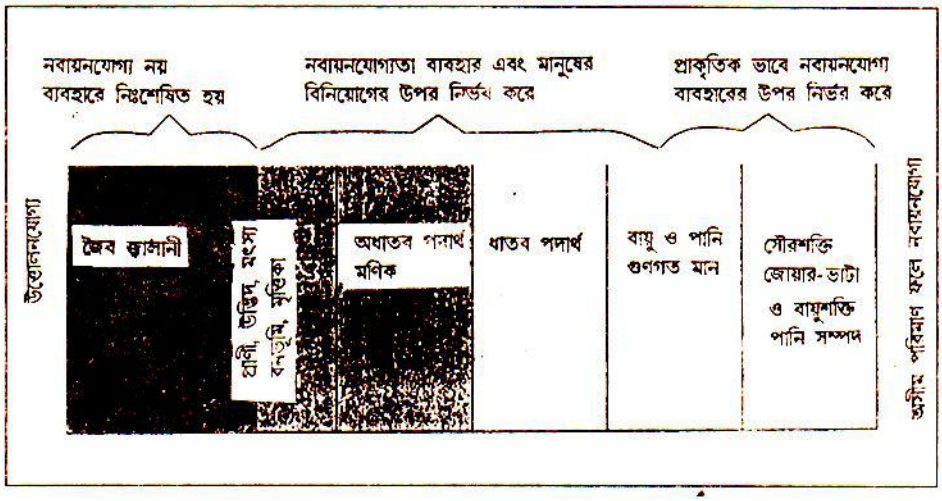


*চিত্র ৩.৩০.১ : মানব ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ও তাদের পরিক্রমা।*

*সম্পদ হিসাবে পানির গুরুত্ব কি?*

সম্পদ হিসাবে পানির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

**অস্বাভাবিক ভৌত গুণাগুণ**

১. অতি উচ্চ স্ফুটনাংক।

২. যে কোন তরল অপেক্ষা পানির বাস্পী ভবনের লীনতাপ অতি মাত্রায় অধিক।

৩. পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা যে কোন বস্তুর চেয়ে বেশী ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ধীর গতি এবং এটা হঠাৎ পরিবর্তন রোধ করে দুর্ঘটনা ও বিপদমুক্ত রাখে।

*স্ফুটনাংক, লীন তাপ, তাপধারণ ক্ষমতা, ঘনত্ব।*

৪. কঠিন অবস্থায় পানি তরল অবস্থা থেকে কম ঘনত্বের হয় ফলে মেরু অঞ্চলে জলজ প্রানী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এবং মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়।

৫. দ্রাবক হিসাবে পানি অতুলনীয়, ফলে পুষ্টি প্রক্রিয়া সাবলীল ও অটুট রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**ব্যবহার যোগ্য পানি প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে -**

১. মানুষের বসবাসের ঘনত্বের তারতম্য গড়ে উঠে;

২. আবাস ব্যবস্থায় উন্নয়ন হয়ে থাকে।

এসবের সাথে যুক্ত হয় জনসংখ্যা ঘনত্ব, দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিন্যাস। বৃক্ষ ও খাদ্য উৎপাদনে পানি প্রয়োজন। ধাতু ও খনিজ (Mineral) প্রক্রিয়াজাত করণে, শক্তিকে কার্যে পরিনত করতে, অধিকাংশ দ্রব্য উৎপাদনের কোনো না কোনো ধাপে, ক্রমবর্ধমান নাগরিক জীবনের ব্যবস্থাপনায়, শিল্পায়নে পানি প্রয়োজন। সার্বিক বিচারে পানি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

**পানির ব্যবহার, পানির গুণ ও সচেতনতা** (Use of water; its quality and public awareness)

মানুষ পানির ব্যবহার সাধারনত: তিন ভাবে করে:

*বৃক্ষ ও খাদ্য উৎপাদন, ধাতু ও খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণে।*

- খাদ্য উৎপাদন, চাষাবাদ ও সেচ কার্যে (৮৫%);
- শিল্প কারখানায় (৭%) এবং
- গৃহ ও বাণিজ্যিক কাজে (৫%)।

ব্যবহার্য পানির যোগান কখনো অপ্রতুল হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরো অবনতি হবে। কেননা-

- সার্বিক ব্যবহারে পানির চাহিদা বাড়ছে,
- পানির অসম বন্টন ও
- সরবরাহে দূষণ বৃদ্ধি হচ্ছে।

*শোধিত গুণ, প্রবাহ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার।*

পৃথিবীর অধিকাংশ পানিই শোধিত গুণের হয়ে থাকে এবং অনেক স্থানেই সেচ কাজে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে শূণ্যস্থান পূরণের জন্য প্রবাহ (runoff) অপ্রতুল। সেচ কার্যের উপর নির্ভর

করছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন। বাংলাদেশের কৃষিকার্য তার নদ-নদীর বানের জল ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের উপর নির্ভরশীল। আশির দশক থেকে বর্তমানে পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে
সেচ কার্যে দ্বিগুণ;
কলকারখানায় ২০ গুণ;
গৃহ ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ৫ গুণ।

ভবিষ্যৎ প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে পানির চার ধরনের ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা:

ক. উত্তোলন বা সার্বিক ব্যবহার (Withdrawl or total use);

খ. ভোগকৃত অথবা স্থানান্তরিত ব্যবহার (Consumptive or displaced use);

গ. চূড়ান্ত ব্যবহার (Net use) এবং

ঘ. হ্রাসকৃত ব্যবহার (Degrading use)।

### ক. উত্তোলিত জল ব্যবহার

*উত্তোলিত জল ব্যবহার, ভোগকৃত বা স্থানান্তরিত ব্যবহার, চূড়ান্ত ব্যবহার্য জল, হ্রাসকৃত ব্যবহার।*

যে কোনো নদী, হ্রদ বা ভূনিম্নস্থ জলাধারা থেকে যতটুকু পানি ব্যবহারের জন্য আহরণ করা হয় তার মোট পরিমাণ থেকে পাম্পের সাহায্যে অথবা অন্য মাধ্যমে উত্তোলিত এ পানির প্রায় ৫০ ভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় আবার পরিবেশে ফিরে যায়।

### খ. ভোগকৃত বা স্থানান্তরিত ব্যবহার

এ জল হচ্ছে সেই প্রকৃতপক্ষে অব্যবহৃত বা প্রাকৃতিক নিয়মে অপচয়কৃত জল যা বাস্পীভবন ও বাস্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমে (Evapotranspiration) পরিবেশে ফিরে যায় এবং অন্য এবং অন্য কোথাও বারিপাত (Precipitation) হয়ে থাকে।

### গ. চূড়ান্ত ব্যবহার্য জল

সার্বিক উত্তোলিত জল থেকে স্থানান্তরিত জলের বিয়োগফল হচ্ছে চূড়ান্ত ব্যবহার্য অথবা ব্যবহৃত জলের পরিমাপ।

### ঘ.হ্রাসকৃত ব্যবহার

পানিচক্রে নবায়িত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যে পরিমাণ পানি দ্রবীভূত লবন, রাসায়নিক দ্রব্য অথবা ভৌতিক (তাপ) পরিবর্তন সাধনের ফলে অশোধিত হয়ে পড়ে তার মোট পরিমাণ।

*বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৭৫, ১৯৯৫।*

যদিও পানির অপ্রতুলতা, ক্ষরা এবং বন্যা কোনো কোনো জায়গার জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করে তবুও মানুষের জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অশুদ্ধ/দূষিত পানি। বিশ্ব স্বাস্থ্য (World Health Organisation-WHO) এর ১৯৭৫ সালের এক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয় যে স্বল্পোন্নত দেশে যেখানে দুই বিলিয়ন মানুষ বাস করে তাদের প্রতি দুই জনের একজনও পানের জন্য বিশুদ্ধ পানি পায় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর সর্বশেষ প্রাপ্ত (১৯৯৫) তথ্য ও গবেষণার ফলে পানীয় মানের যে মাত্রা নির্ধারণ করেছে তা নিম্নরূপ:

*কি কি ভাবে পানি ব্যবহৃত হয়?*

দূষিত জল পানের ফলে অথবা অন্যান্য ব্যবহারের ফলে পানি বাহিত রোগসমূহ অতি দ্রুত সংক্রামিত হয়। ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ ভেদে পানির গুণগত মান ও লবনাক্ততা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

*সংক্রমণ, লবণাক্ততা, ক্যান্সার।*

গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পানি ও নির্দিষ্ট মাত্রায় বিশুদ্ধ না হলে ঘা পাচড়া অথবা ত্বকের ক্ষতি হতে পরে। দীর্ঘদিন অবিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে ত্বকের ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য পানির গুণগত মান সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

*সারণি ৩.৩০.১ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত পানীয়জলের গুনাবলী (প্রতি লিটারে মিলিগ্রাম পরিমানে মিশ্রণ)।*

| রাসায়নিক দ্রব্য | গ্রহনযোগ্য মাত্রা | সুপারিশকৃত মাত্রা |
|---|---|---|
| এ্যামোনিয়া (Ammonia NH4) | - | ০.৫০ |
| আর্সেনিক (Arsenic) | ০.২০ | ০.০১ |
| ক্যাডমিয়াম (Cadmium) | ০.০৫ | - |
| ক্লোরাইড (Choloride) | ৬০০.০০ | ৩৫০.০০ |
| ক্রোমিয়াম (Chromium) | ০.০৫ | - |
| কপার (Copper) | ১.৫০ | ১.০০ |
| সায়ানাইড (Cyanide) | ০.০১ | - |
| ফ্লোরাইড (Fluoride) | - | ১.৫০ |
| লৌহ (Iron) | ১.০০ | ০.১০ |
| সীসা (Lead) | ০.১০ | - |
| ম্যাগনেসিয়াম (Magnessium) | ১৫০.০০ | ৫০.০০ |
| ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম সালফেট | ১০০০.০০ | ৫০০.০০ |
| (Magnessium+Sodium Sulfates) | | |
| ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) | ০.৫০ | ০.১০ |
| নাইট্রেট (Nitrate as NO3) | - | ৫০.০০ |
| অক্সিজেনের সর্বনিম্নমান (Oxygen Minimum) | - | ৫.০০ |
| ফেনোলিক যৌগ (Phenolic Compound) | ০.০০২ | ০.০০১ |
| সেলিনিয়াম (Selenium) | ০.০৫ | - |
| সালফেট (Sulfate) | - | ২৫০.০০ |
| কঠিন দ্রব্য (Solids) | ১৫০০.০০ | ৫০০.০০ |
| দস্তা (Zinc) | ৭৫.০০ | ৫০.০০ |

*পানীয় জলের গুণাবলী কেমন হওয়া প্রয়োজন?*

## পাঠ সংক্ষেপ

মানুষ কৃষিকাজে ৮৫%, শিল্প-কারখানায় ৭% এবং গৃহ ও বাণিজ্যিক কাজে ৫% পানি ব্যবহার করে থাকে। পানির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং সরবরাহ মাত্রার তুলনামূলক হ্রাসের ফলে পানি ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩০

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ জলবায়ু পরিবর্তন ধীরগতি সম্পন্ন কেননা পানির-
ক. তাপ ধারণ ক্ষমতা যে কোনো বস্তুর চেয়ে বেশি খ. দ্রাবক হিসাবে পানি অতুলনীয়
গ. স্ফুটনাঙ্ক অতি উচ্চ ঘ. কঠিন অবস্থায় আয়তনে বাড়ে

১.২ খাদ্য উৎপাদন, চাষাবাদে ও সেচ কার্যে পানি ব্যবহৃত হয়-
ক. ৭% খ. ৮৫%
গ. ৫% ঘ. ৭০%

১.৩ পানীয় জলে আর্সেনিকের সুপারিশকৃত মাত্রা-
ক. ০.০১ মি. গ্রা./লি. খ. ০.২০ মি. গ্রা./লি.
গ. ০.০৫ মি. গ্রা./লি. ঘ. ২.০০ মি. গ্রা./লি.

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২*৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. সম্পদ হিসাবে পানির গুরুত্ব কি?
২. কি কি ভাবে পানি ব্যবহৃত হয়?
৩. পানীয় জলের গুণাবলী কেমন হওয়া প্রয়োজন?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্ব ও পানির অস্বাভাবিক ভৌত গুণাবলী কি?
২. পানির ব্যবহার, পানির গুণ ও জনসচেতনতা সম্পর্কে লিখুন।

# জীবমন্ডল (Biosphere)

*৩.৩১ থেকে ৩.৩৪ পর্যন্ত পাঠে আপনারা জীবমন্ডল সম্পর্কে জানবেন।*

## পাঠ ৩.৩১ : প্রাণের বিবর্তন (উদ্ভিদ ও প্রাণী)
## Evolution of Life (Plant and Animal)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে:

- ◈ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত কাকে বলে এবং এদের পার্থক্য;
- ◈ বিবর্তন মতবাদ;
- ◈ ভূ-তাত্ত্বিক সময় ভিত্তিক প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে।

### উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ

*উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় অনুজীবের উপর।*

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব এই তিন ধরনের প্রাণ নিয়ে জীবজগত গঠিত। মানুষ প্রাণীজগতের একটি অংশ। জীবজগতের প্রাণের এই ধরনসমূহ পরস্পর থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে আলাদা। যেমন, উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদনের কাজে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অজৈব যৌগ ব্যবহার করে থাকে। অপরদিকে, প্রাণী খাদ্যের জন্য জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সংগঠনে অপারগ। তবে, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই বেঁচে থাকা, বেড়ে উঠা এবং প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি শ্বাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেয়ে থাকে; যেখানে অক্সিজেন গ্রহণ করে, জৈব যৌগ বিশ্লেষিত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

অনুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আলাদা, এদের সালোক সংশ্লেষণের ক্ষমতা নেই; খাবারের জন্য এরা পুরোপুরি অন্য প্রাণী বা বস্তুর মৃত জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল। এসব অনুজীবদের খালি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের উপস্থিতি আছে, এমনকি অক্সিজেন বিহীন অবস্থায়ও, যেখানে অন্য প্রাণী টিকে থাকতে পারে না সেখানেও।

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই অনুজীবের ওপর নির্ভরশীল। অনুজীব ব্যতীত প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, অনুজীব সমূহ জৈব ক্ষয়সাধন, পচন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অনুজীব ব্যতীত জৈব-ভূরাসায়নিক চক্র (Biogeochemical Cycle) কার্যকর হবে না; মৃত জৈব পদার্থকে পুনরায় রাসায়নিক ভাবে অজৈব যৌগে পরিবর্তন করে মাটিতে মিশিয়ে দেয় এবং অনুজীব এই কাজে প্রয়োজনীয় মৌল সরবরাহ করে থাকে।

*জীবজগতের গঠন উপাদান কি কি?*

### উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য

*সালোক সংশ্লেষণ কি উপকার করে।*

পুষ্টিগত দিক থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্যে তাদের স্বস্ব কাঠামো পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদের অন্যতম প্রয়োজনগুলো হলো, সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য সূর্যালোক, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি; শ্বাসের জন্য অক্সিজেন এবং প্রোটোপ্লাজম গঠনকারী প্রধান সরল রাসায়নিক যৌগ। উদ্ভিদের এ প্রধান চাহিদাসমূহ বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা মিটিয়ে থাকে; ফলে উদ্ভিদ জীবনের শুরু থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করে।

নিম্নবর্গের উদ্ভিদ ছাড়া মাটি ভিত্তিক সব উদ্ভিদের শিকড় আছে। এই শিকড় গাছকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখে এবং মৃত্তিকা থেকে পুষ্টিরস গাছের কান্ড ও শাখা প্রশাখায় যোগান দেয়। উদ্ভিদের একটি অবস্থান থাকায় এর প্রজনন ব্যবস্থাও এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে যার মাধ্যমে সহজেই অন্যত্র এর বিস্তরণ ঘটতে পারে। ভূমি ভিত্তিক প্রায় সব উদ্ভিদেরই বীজ ও স্পোর থাকে যার মাধ্যমে এর বংশধারা অন্যত্র বিস্তার লাভ করে। নিম্ন বর্গের বা আদিম উদ্ভিদের কিছু কিছু অবশ্য বংশ বিস্তারে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।

*উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।*

প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নত বর্গের ক্ষেত্রে পুষ্টি বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাণী খাদ্যের জন্য হয় উদ্ভিদের উপর নতুবা অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ফলে, তাদের সর্বদা খাদ্য সন্ধান/যোগাড় করতে হয়। আবার কিছু প্রাণী বেশি নড়াচড়া না করে স্থানীয় ভাবে খাদ্য যোগাড় করে থাকে। ফলে তাদের দেহে এমন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন না করে, আহার জুটানো যায়। প্রাণীর খাদ্য সন্ধানের প্রয়োজনে তার দেহে প্রয়োজনীয় চলাচল উপযোগী দৈহিক শক্ত কাঠামো গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া, খাবার খাওয়া, হজম ও পুষ্টি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন, বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং আরো অনেক দরকারী অঙ্গ দৈহিক পদ্ধতিকে সহায়তা দিয়ে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই বৈচিত্র্যময় দৈহিক কাঠামোগত তারতম্য থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তাহলো জৈব জীবনের চাহিদা (পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রজনন) পূরণে উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে।

*উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান পার্থক্য সমূহ কি কি?*

## **বিবর্তন মতবাদ** (The theory of evolution)

প্রাচীনকাল থেকেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্যের কথা জানা গেছে। মানুষ প্রাণীর উৎপত্তি নিয়ে বহু আগে থেকেই জানতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। কেউ দাবী করেছে প্রাণের উৎপত্তি একটি মহাজাগতিক সৃষ্টি, আবার কারো কারো মতে জৈব প্রাণ স্বত:স্ফুর্ত ভাবেই মৃত বা অজৈব পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এইসব মতবাদ অবশ্য বর্তমানে আর গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে, এ নিয়ে প্রথম সুস্পষ্ট মতবাদ দেন ল্যামকি (১৭৪৪-১৮২৯)। তিনিই প্রথম প্রজাতির আবদ্ধতা সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন এবং প্রাণীকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ আছে কি নাই, এ ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করেন। পরবর্তীতে, উনিশ শতকের শেষার্ধে চার্লস ডারউন (১৮০৯-৮২) এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৯২৩-১৯১৩) জীবনের বিবর্তন বিষয়ক মতবাদ দেন। এ বিষয়ে ডারউইনের বিখ্যাত বই Origin of Species (১৮৫৯) বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ওয়ালেস এর মত ডারউন ও মনে করেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় অথবা যোগ্যতর প্রাণী শুধু টিকে থাকবে এ নীতিতে প্রজাতি সমূহের উদ্ভব হয়েছে।

ডারউইন এ মতের স্বপক্ষে বলেন, একই প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য যত ক্ষুদ্রই হোক তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ কিছু পার্থক্যময় বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যোগ্যতর করে তোলে। ফলে, অন্যদের তুলনায় সে সহজেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে টিকে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়। কোন প্রাণীর কিছু বাড়তি সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য সে প্রাণীকে সংগ্রামে টিকে থাকা ও প্রজনন ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এ সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য তার সন্তান সন্ততির মাধ্যমে যদি হস্তান্তর করা যায় তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম ও দক্ষতার সাথে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে, কোন ত্রুটিপূর্ণ প্রাণী এ সংগ্রামে হেরে যাবে। ডারউইনের মূল

*ডারউইনবাদের স্বপক্ষে যুক্ত।*

বক্তব্য হলো, সব জীবিত প্রাণী নিয়ত পরিবর্তন ধারা মেনে চলে বা পরিবর্তন ধারার মাধ্যমে অগ্রসর হয়। এছাড়া, বিবর্তনের এইস্বত:সিদ্ধতায় বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বল্প সংখ্যক প্রজাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলি একই নিয়মে আরও স্বল্প সংখ্যক প্রজাতির ফসল।

*প্রাকৃতিক নির্বাচন ও প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানো।*

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানো এ দুই প্রক্রিয়াই জীবের ক্রম রূপান্তর ও বৈচিত্র্যতা ঘটেছে। এ ধীর প্রক্রিয়া দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময়কাল থেকেই ঘটে আসছে। ডারউইন অবশ্য এ উত্তরাধিকার সূত্রের (Inheritance) বংশগতি ও এর পরিবর্তন ধারা কিভাবে কার্যকর হয় তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য তারতম্য থেকেই পার্থক্যের সূচনা হয় - যা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আরো সুস্পষ্ট পার্থক্যে রূপ নেয়, ডারউইনের এ ধারণা ডাচ উদ্ভিদবিদ ডিভ্রাইজ ও সমর্থন করেন। ডিভ্রাইজ এই ধরনের স্বত: পরিবর্তনকে মিউটেশন নাম দেন এবং দাবি করেন এ রকম পরিবর্তন একক পুরুষেই ঘটতে পারে। এ মিউটেশনের কারণে বংশানুক্রমিক তারতম্য সমূহ বেড়ে যায় যা দুই আন্ত:প্রজননের (Interbreeding) মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

বিবর্তনের মতবাদ মেনে নেওয়ার অর্থ হল কোন জীব আর স্থায়ী এবং পরিবর্তনাতীত (Immutable) নয় বরং স্বত:পরিবর্তনযোগ্য। মূল গোত্র থেকে পরিবর্তিত ও ভিন্ন রূপে কোন বর্গে নতুন এক প্রজাতির আবির্ভাব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মূল গোত্র ও তার স্বগোত্রীয়দের উৎস মূল সহজেই বের করা যায়। এভাবে, একটি প্রজাতির মূল বর্গ, তার পরিবার ও পরিবারের উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

*বিবর্তন মতবাদ কি?*

## প্রাণের বিবর্তন

*স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব।*

প্রাণের শুরু সমুদ্রে এ ধারণা স্বীকৃত, তবে কখন শুরু হয়েছে তা অজানা রয়ে গেছে। প্রায় ৬০ কোটি বৎসর পূর্বে কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেন ২০০ কোটি বৎসর আগে ও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, এর স্বপক্ষে উদাহরণ দেওয়া হয় কানাডার ও নারিও শিলায় পাওয়া বহুকোষী শৈবাল ও চুনাজাতীয় ফ্লাজেলেট এর। এগুলোর বয়স প্রায় ১৯০ কোটি বৎসর। ধারণা করা হয়, ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বে সম্ভবত সাধারণ উদ্ভিদের আকারে কিছু শৈবাল, ফাঙ্গি এবং এককোষী জৈব পদার্থের অস্তিত্ব ছিল। একটি সারণির সাহায্যে ভূতাত্ত্বিক সময়ব্যাপী পৃথিবীতে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে তা দেওয়া হলো (সারণি ৩.৩১.১)।

ক্যামব্রিয়ান যুগ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুস্পষ্ট অস্তিত্ব প্রমাণিত। তবে ওরডোভিসিয়ান থেকে সিলুরিয়ান যুগে ভূমি ভিত্তিক উদ্ভিদ এবং চোয়াল বিহীন মাছের আবির্ভাব হয়েছে। ডেভোনিয়ান যুগ ও কার্বনিফেরাস যুগের মধ্যে জীব ভিত্তিক উদ্ভিদও হাড়যুক্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এই সময়ে বিপুল বৃক্ষরাজির সৃষ্টি হয় যা পরে ভূ-তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের কারণে মাটির নিচে চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয়। পারমিয়ান (৫ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) থেকে জুরাসিক (৫ কোটি ৭০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) যুগে কোনিফেরাস, হর্সটেইলস, ফার্ণ এবং সম্ভবত প্রথম খোলসযুক্ত বীজের গাছের আবির্ভাব হয়। এই সময় সরীসৃপ, ডাইনোসর এবং আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়।

ক্রিটাসিয়াস (৭ কোটি বৎসর পূর্বে) থেকে মাইয়োসিন যুগে (১ কোটি ৯০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) সপুস্পক উদ্ভিদ, গুল্ম ও ঘাসের আবির্ভাব হয় (চিত্র ৩.৩১.১)। প্রাণীকুলে এ সময় যেমন বেশ কিছু নতুনের আবির্ভাব হয় তেমন কিছু প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে। যেমন, এ সময় পাখি, সাপ ও ছোট

আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। তাছাড়া, আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর ব্যাপক বিকাশ ঘটে। আবার, বৃহৎ বহু ধরনের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, ডাইনোসর উল্লেখযোগ্য। প্লাইয়োসিন (৫০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) থেকে প্লাইস্টোসিন (২০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) যুগের উচ্চ অক্ষাংশে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। এ সময়ের বরফে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আফ্রিকায় বন্য-মানুষের আবির্ভাব হয় এবং শেষাবধি আধুনিক মানুষের যাত্রা শুরু হয়। বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী লোপ পায়।

*সারসৃপ জাতীয় প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়।*

*সময়ের সাথে প্রাণের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে?*

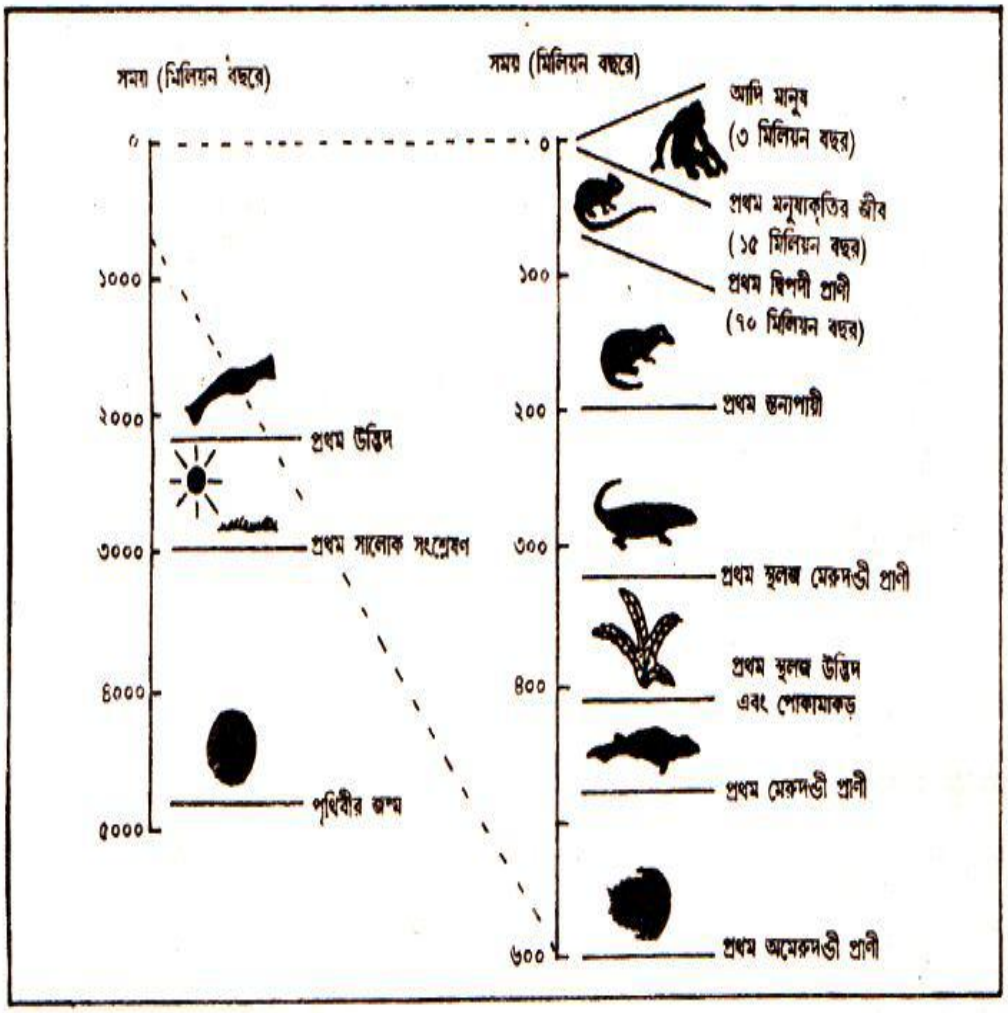


**চিত্র ৩.৩১.১ :** বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে প্রাণের বিবর্তন। আদিযুগে সরল ও অনুন্নত জীবের আবির্ভাব হয়। সময়ের সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল গঠনকাঠামো সম্বলিত উন্নত জীবের আবির্ভাব ঘটে।

*ভূ-তাত্ত্বিক সময়ব্যাপী জীবের বিবর্তন ধারা কেমন ছিল?*

*সারণি ৩.৩১.১ : ভূ-তাত্ত্বিক সময়ব্যাপী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তন ধারা*

| ভূ-তাত্ত্বিক যুগ | স্থায়িত্বকাল (মিলিয়ন বর্ষে) | উদ্ভিদের বিবর্তন | প্রাণীর বিবর্তন |
|---|---|---|---|
| প্লাইষ্টোসিন | ২ | সম্ভবত বহু উদ্ভিদ বরফে নিশ্চিত হয়ে গেছে। | আধুনিক মানুষের আবির্ভাব। |
| প্লিয়োসিন | ৫ | আধুনিক উচ্চ-অক্ষাংশিয় উদ্ভিদের বিকাশ লাভ করে। | আফ্রিকার মনুষ্য বানরের আগমন ঘটে। বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে। |
| মাইয়োসিন | ১৯ | বনভূমি ঘাসাচ্ছাদিত হতে শুরু করে। | উন্নত প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিকাশ লাভ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বানরের প্রাচুর্যতা দেখা দেয়। |
| অলিগোসিন | ১২ | গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। | আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিকাশ হয়। |
| ইয়োসিন | ২৭ | গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের প্রধান্য দেখা দেয়। | আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। সাপের আবির্ভাব হয়। |
| ক্রিটাসিয়াস | ৭০ | সম্পুস্পক উদ্ভিদের উন্নয়ন ও বিকাশ লাভ করে। | সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর বিশেষায়ন ঘটে এবং এসব লাভ করে। বৃহৎ প্রাণী এ যুগের শেষের দিকে বেশির ভাগই বিলুপ্ত হয়। প্রথম পাখি দেখা যায়। ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী বিকাশ লাভ করে। |
| জুরাসিক | ৫৭ | সাইকাডস, ফার্ণস ও কোণিফার (পর্নমোচী) উদ্ভিদের বিকাশ ঘটে। সম্পুস্পক উদ্ভিদের সম্ভবত আগমন হয়। | বহু প্রজাতির সরীসৃপের আগমণ ঘটে এবং বেশ কিছু সমুদ্র থেকে ভূমি ও আকাশে উঠে আসে। ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। |
| ট্রাইয়োসিক | ৩২ | হর্সটেইলস, ফার্ণ, সাইকাডস ও কোনিফারের আবির্ভাব হয়। | বড় আকৃতির সমুদ্রিক সরীসৃপ, যেমন- ডাইনোসরের আগমণ ঘটে। |
| পারমিয়ান | ৫৫ | এ সময়ের প্রথম দিকেই কোণিফার উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। পুরাতন কোনিফারের বিলুপ্তি নবীনের আগমন ঘটে। | সামুদ্রিক প্রজাতির ধরন ও সংখ্যা উভয়। উল্লেখযোগ্য হ্রাস পায়, বিশেষ করে অগভীর পানিতে ও সরীসৃপের বিকাশ ঘটে। |
| কার্বনিফেরাস | ১৩০ | ফার্ণ, বৃহৎ 'ক্লাব মস' জাতীয় উদ্ভিদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাছাড়া, খোসাবিহীন বীজের ও আদিম উদ্ভিদের সূচনা হয়। | প্রথম উভচর প্রাণীর আবির্ভার ঘটে। এই যুগের শেষের দিকে সরীসৃপেরও সূচনা হয়। কীট পতঙ্গের বিবর্তন এবং ব্যাপক বিস্তার ঘটে। |
| ডেভেনিয়ান | ৫০ | প্রথম সত্যিকার বীজ বিশিষ্ট উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। বৃহৎ আকৃতির স্পোর বিশিষ্ট ফার্ণেরও সুচনা হয়। ভূমিতে ফাঁপা নলাকৃতির উদ্ভিদ বিস্তার লাভ করে। | প্রচুর অস্থি বিশিষ্ট মাছের আবির্ভাব হয়। উভচর বিশিষ্ট শ্বাস গ্রহণকারী মাছের উদ্ভব ঘটে। প্রথম কীট পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। |
| সিলুরিয়ান | ৪০ | প্রচুর শৈবালের উদ্ভব হয়। এ যুগের শেষের দিকে ভূমিতে নলাকৃতির উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। | চোয়ালবিহীন মাছের প্রাচুর্য্যতা ঘটে, ইউরিপটারিডস। তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে এবং গ্রাফটোলাইটসের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। |
| অরডোভিসিয়ান | ৬৫ | উদ্ভিদ বলতে শুধুমাত্র শৈবালই প্রধান ছিল। এ সময় ভূমিতে উদ্ভিদের সূচনা হয়। | চোয়ালবিহীন মাছের আবির্ভাব ঘটে। গ্রোফটোলাইটস ও ব্রাকিওপড্স ব্যাপকভাবে দেখা যায়। |
| ক্যামব্রিয়ান | ৭০ | শৈবাল ছিল, ভূমিতে উদ্ভিদ ছিল বলে ধারণা করা হয়। | অমেরুদন্ডী গোত্রভূক্ত প্রাণীর প্রায় সব ধরনের প্রজাতির আবির্ভাব হয়। ট্রাইলোবাইটস প্রধান্য পায়। প্রথম কোরাল এবং গ্রাফটোলাইটসের সূচনা হয়। |
| প্রিক্যামব্রিয়ান | --- | বিশেষ কিছু জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় এ সময় আদিম শৈবাল, ফানজি ও এককোষী উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল। | প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু অনুমান করা হয় নরমদেহের প্রাণী যেমন, এ্যানালিডস, জেলি-ফিস, অকোষিজীব এবং স্পনজের উপস্থিতি ছিল। |

## পাঠ সংক্ষেপ

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব এই তিন ধরনের প্রাণ নিয়ে জীব জগত গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই অনুজীবের ওপর নির্ভরশীল। অনুজীব ব্যতীত জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical Cycle) কার্যকর হবে না। বিবর্তন মতবাদের মাধ্যমে প্রাণের উদ্ভবের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হলো জীব স্থায়ী নয়; স্বত: পরিবর্তনশীল। মূলগোত্র থেকে পরিবর্তিত ও ভিন্ন রূপে কোন বর্গে নতুন এক প্রজাতির আর্বিভাব হতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩১

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা ও প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকে-

ক. খাদ্য হতে খ. শ্বাস প্রক্রিয়ায়
গ. সালোক সংশ্লেষণে ঘ. অলৌকিক ভাবে

১.২ ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম-

ক. The Origin of life খ. The Evolution of species
গ. The Evolution of life ঘ. The Origin of Species

১.৩ ভূমিভিত্তিক উদ্ভিদ ও চোয়াল বিহীন মাছের আবির্ভাব যে যুগের মধ্যে হয়েছে-

ক. অরডোভিসিয়ান-সিলুরিয়ান খ. সিলুরিয়ান-ডেভোনিয়ান
গ. ক্যাম্ব্রিয়ান-অরডোভিসিয়ান ঘ. ডেভোনিয়ান-মিসিসিপিয়ান

১.৪ সপুস্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে-

ক. ৭ কোটি - ১ কোটি ৯০ লক্ষ বছর পূর্বে খ. ১ কোটি - ৯০ লক্ষ বছর পূর্বে
গ. ৭ কোটি - ৭.৫ কোটি বছর পূর্বে ঘ. বিগত দুই হাজার বছরে

১.৫ ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটে-

ক. ট্রায়াসিক যুগে খ. জুরাসিক যুগে
গ. জুরাসিক যুগে ঘ. ক্রিটাসিয়াস যুগে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২x৫ = ১০ মিনিট) ঃ

১. জীবজগতের গঠন উপাদান কি কি?
২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান পার্থক্য সমূহ কি কি?
৩. বিবর্তন মতবাদ কি?
৪. সময়ের সাথে প্রাণের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে?
৫. ভূ-তাত্ত্বিক সময়ব্যাপী জীবের বিবর্তন ধারা কেমন ছিল?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগত বলতে কি বুঝায়? এদের পার্থক্য কি?
২. বিবর্তন মতবাদ কি? বিবর্তন মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. প্রাণের বিবর্তন ধারা আলোচনা করুন।
৪. বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ব্যাপী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তন ধারা লিপিবদ্ধ করুন।

# পাঠ ৩.৩২ : উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যা (Plant Ecology)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যার আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ;
- ◈ উদ্ভিদ বাস্তব্য বিদ্যাকে প্রভাবিতকারী নিয়ামক সমূহ;
- ◈ উদ্ভিদ কাঠামো যথা- আকার, আকৃতি ও স্তরায়ন, পর্যাবৃত্ত পাতার বুনট ইত্যাদি কিভাবে শ্রেণী বিভাজনে ও জীব ভূগোলবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়;
- ◈ উদ্ভিদের বাস্তব্য পর্যায়ক্রম প্রক্রিয়া সমূহ সম্পর্কে।

বাস্তব্যবিদ্যা বলতে জীব ও তার চার পাশের পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়াকে বুঝায়। উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যা মূলত: বাস্তু পদ্ধতির একটি অংশ। উদ্ভিদ পৃথিবীর জৈব ভূ-দৃশ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাস্তব্যবিদ্যার আলোকে ও উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, উদ্ভিদ প্রাথমিক উৎপাদন যোগায় যার উপর সমগ্র প্রাণীকূল নির্ভর করে থাকে।

উদ্ভিদ জগৎ যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা মহাদেশীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় মাপে বিশ্লেষণ করা যায়। বিশ্লেষণে এ মাপের তারতম্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বিভিন্ন জৈব-ভৌত পরিবেশে (Bio-Physical Environment) উদ্ভিদের বন্টন প্রকৃতি, গঠন বিন্যাস ও বিকাশ লাভ সম্পর্কে সহজ ধারণা লাভ করা।

## উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ (Factors Affecting Plant life)

উদ্ভিদ পরিবেশ মূলত: একাধিক ভৌত ও জৈব নিয়ামকের সম্মিলিত ফল। একটি অঞ্চল যে ধরনের উদ্ভিদ গোষ্ঠী/সমাজ গড়ে উঠে তার পেছনে পানির সহজলভ্যতা ও জলবায়ুর নিয়ামক সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। তাছাড়া মৃত্তিকা ও ভূমিরূপের অবস্থা, অগ্নিকান্ড প্রাণী ও মানুষের কর্মকান্ড যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নিম্নে উদ্ভিদের উপর এ সমস্ত নিয়ামকের ভূমিকা তুলে ধরা হলো।

### পানি

*একাধিক ভৌত ও জৈব নিয়ামকের মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভিজ্জ পরিবেশ গড়ে উঠে।*

বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদের বন্টনে সবচেয়ে একক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে পানি স্বীকৃত। বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভিদ বিশেষায়িত বা খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি বা পানির ঘাটতি মোকাবেলা করতে। স্থলভাগের কোনো একটি স্থানে জীবের পানি প্রাপ্তি নির্ভর করে সেখানকার বৃষ্টিপাত, বাস্পায়ন, পৃষ্ঠ-প্রবাহ ও ভেদ্যতার ওপর। এ সাম্যতা পরিশেষে আবার ভূ-আচ্ছাদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ মৃত্তিকাস্থ পানির বহুলাংশ বায়ুমন্ডলে পাঠায়। তাছাড়া, পৃষ্ঠ প্রবাহে বাধা দিয়ে মৃত্তিকার ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে উদ্ভিদের উপস্থিতিতে পৃষ্ঠ প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পায়।

### জলবায়ুর নিয়ামক

যদিও সব উদ্ভিদই একটি আদর্শ জলবায়ুপূর্ণ অবস্থায় স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করে; যেমন- খুব বেশি উষ্ণতা, অত্যন্ত ঠান্ডা, অতিবর্ষন বা খুবই হালকা বৃষ্টি এসব ক্ষেত্রেই উদ্ভিদকুলের স্বাভাবিক বৃষ্টি ব্যাহত হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারাও যেতে পারে। জলবায়ুর বিভিন্ন নিয়ামকের মাঝে উদ্ভিদ

বিভিন্ন ভাবে মানিয়ে নেয়। এ পর্যায়ে উদ্ভিদ জলবায়ুর নিয়ামক যেমন- উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, বায়ুর বেগ, দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করে তা উল্লেখ করা হলো।

## উষ্ণতা

উদ্ভিদের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। এক্ষেত্রে উষ্ণতার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত: পরম উষ্ণতা, যা উদ্ভিদের জৈব প্রক্রিয়া এবং ভৌত বিক্রিয়া সমূহের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয়ত: আপেক্ষিক উষ্ণতা, যা উদ্ভিদের তাপমাত্রা হারানো বা গ্রহণ মাত্রায় প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদ বিভিন্ন উষ্ণতায় বিকাশ লাভ করেছে। ক্রান্তিয় এলাকায় উদ্ভিদ উচ্চ তাপমাত্রার উষ্ণতায় গড়ে উঠেছে, এ ধরণের পরিবেশ মেগাথারমাল নামে পরিচিত। যে সমস্ত উদ্ভিদ ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনে অভ্যস্থ তা মেসোথারমাল এবং যা অত্যধিক ঠাণ্ডায় টিকে থাকে তা মাইক্রোথারমাল নামে পরিচিত। সাধারণত: ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় (৩২° ফা.) অথবা ৪৫ সে. (১১৩° ফা.) উষ্ণতায় উদ্ভিদের পাচক ক্রিয়া বন্ধ থাকে, ফলে বৃদ্ধি ব্যহত হয়। স্বল্পমেয়াদী গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না।

*উষ্ণতা ফসলের উৎপাদনের নিয়ামক।*

## বৃষ্টিপাত

যদিও সব উদ্ভিদেরই বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য, তবে বিভিন্ন উদ্ভিদে এর পরিমাণগত চাহিদা বিভিন্ন রকম। পানির প্রাপ্যতার সাথে উদ্ভিদ খাপ খাওয়াতে পারে। কিছু উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পানির অভাবে শুষ্ক ঋতুতে সুপ্ত থাকে, পাতা ঝরিয়ে ফেলে। যেমন: মার্চ-এপ্রিল মাসে গজারী গাছের পাতা ঝরে যায়, কারণ এ সময় বৃষ্টিপাত কম হয়। শুষ্ক অঞ্চলে কিছু কিছু উদ্ভিদের শিকড় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ ধরনের উদ্ভিদকে ফেরিটোফাইটিস (Phreatophytes) বলে। পানির প্রয়োজনীয়তা মাত্রার ভিত্তিতে তিন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। যথা- জেরোফাইটিস (Xerophytes), হাইগ্রোফাইটিস (Hygrophytes) ও মেসোফাইটিস (Mesophytes)।

জেরোফাইটিস উদ্ভিদ বহুদিন/মাস অনাবৃষ্টি/বৃষ্টিপাতহীন অবস্থায় টিকে থাকতে পারে। যেমন: মরুভূমিতে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। এই সমস্ত উদ্ভিদ শুধুমাত্র সুবিধাজনক পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হাইগ্রোফাইটিস উদ্ভিদ স্বল্পকালের জন্য পানি ছাড়া বাঁচে না। এই জাতীয় উদ্ভিদ পানিযুক্ত পরিবেশেই গড়ে উঠে। বাংলাদেশের গরান বনভূমি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুন্দরী গাছ ভেজাকাঁদায় ও জোয়ার ভাটা প্রভাবিত উপকূলীয় পরিবেশে গড়ে উঠে। মেসোফাইটিস জাতীয় উদ্ভিদ আর্দ্র কিন্তু ভেঁজা নয় এমন পরিবেশে টিকে থাকে। এই জাতীয় উদ্ভিদের কিছু কিছু শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী খরায় টিকে থাকতে পারে; আবার কিছু অনেক দিনের খরায়ও টিকে থাকে।

*বৃষ্টিপাত উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তাকারী।*

## আর্দ্রতা

একটি এলাকার আর্দ্রতা প্রত্যক্ষভাবে প্রস্বেদনে প্রভাব বিস্তার করে, যা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট পরিবেশে উদ্ভিদ নরম মন্ডতুল্য ও দ্রুত বর্ধক হয়; কম আপেক্ষিক আর্দ্রতায় উদ্ভিদ কম বৃদ্ধি পায় এবং খুব শক্ত হয়। মরুময় পরিবেশে বাঁচার তাগিদে উদ্ভিদ তার দেহে ও টিস্যুতে পানি সংরক্ষণ করে।

### বায়ুমন্ডলীয় চাপ

উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পায়। উচ্চ পার্বত্য এলাকার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল নয়। তবে এই ধরণের অতি উচ্চতায় কিছু কিছু উদ্ভিদ খাপ খাইয়ে বেড়ে উঠে।

### বায়ুর বেগ

কোন অঞ্চলের বায়ুর গতিবিধি এর বনভূমির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। ঐ অঞ্চলের জলবায়ুতে প্রভাব ফেলে কারণ, বায়ুর বেগ বৃষ্টিপাত ও বাস্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। দ্রুতবেগে বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের গাছপালা তাদের বৃদ্ধির ধরন পাল্টে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেয়।

বায়ু যদি সব সময় উচ্চবেগে প্রবাহিত হয় তাহলে উদ্ভিদের পাতা এমনকি সম্মুখ ভাগ অংশের বাকল ও পড়ে যায়। বায়ুতে বালি, স্লিট বা বরফকুচী থাকলে এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এ ধরনের বায়ু তাড়িত উদ্ভিদ পতাকারূপী উদ্ভিদ হয় যা প্রধানত: তুন্দ্রা, আলপাইন বা আধামরুময় পরিবেশে দেখা যায়।

### দিবালোকের দৈর্ঘ্য

সূর্যালোক প্রাপ্তির দৈর্ঘ্য বা সূর্যালোকের তীব্রতা উভয়ই উদ্ভিদের জীবন চক্রকে প্রভাবিত করে থাকে। উদ্ভিদের পুস্প বিকশিত হওয়া বিশেষভাবে সূর্যালোক প্রাপ্তির দৈর্ঘ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদের আলোক নির্ভরশীলতাকে আলোক পর্যাবৃত্ত (Photoperiodicity) বলে।

*সূর্যলোক পাওয়ার জন্য উদ্ভিদকুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।*

দিবালোকের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত উদ্ভিদ সমূহকে ৪টি দলে ভাগ করা যায়। প্রথমে দলের উদ্ভিদ সমূহে দীর্ঘ দিবালোকের সময় ফুল ফোটে এবং দিবালোকের হ্রাসে তা বন্ধ থাকে; যেমন: কলা, মূলা, সিনোরেরিয়া, হেদার ও স্পিনিচ। দ্বিতীয় দলের উদ্ভিদে কম দিবালোকের প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেঘাচ্ছন্ন/অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোতে ফুল ফোটে। যেমন: ডেইজি, রেজউড ও স্ট্রবেরী। তৃতীয় দলের উদ্ভিদের জন্য প্রথম দুই দলের তুলনায় মাঝারি দৈর্ঘ্যের দিবালোক দরকার হয়। চতুর্থ দলের আওতাভূক্ত উদ্ভিদ দিবালোকের দৈর্ঘ্য দ্বারা তেমন বেশি প্রভাবিত হয় না। এগুলোর মধ্যে টমেটো, শশা ও ডানডেলিয়ন অন্যতম।

### মৃত্তিকার অবস্থা

মৃত্তিকা কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদ জগতের উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে। মূলত: উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা উভয়ই পরস্পরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকার নমুনা উদ্ভিদের বিস্তরণে ও বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। যেমন- গাছের শিকড় মাটির নীচে থাকে এবং তা দিয়ে মাটি থেকেই খাদ্য রস ও পানি শোষিত হয়ে কান্ডে যায়। আবার উদ্ভিদ ও জৈব অবশেষ যোগান দিয়ে, এসিড নি:সরণের মাধ্যমে মৃত্তিকার খনিজ পদার্থে কাজ করে দানাদার মৃত্তিকা উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

### ভূমিরূপের অবস্থা

সমুদ্র সমতল থেকে ভূমির উচ্চতা ঢাল ও দিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও বন্টনে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। খাড়া ঢালে মৃত্তিকার আর্দ্রতা কম ফলে গাছের বৃদ্ধি ধীরে হয়। একই ভাবে সূর্যালোকমুখী ঢালে গাছ বেশ বাড়ে এবং বিপরীত ঢালে গাছ তেমন বাড়ে না; গাছের সংখ্যাও কম থাকে।

### আগুন

অগ্নিকান্ডে প্রায়শ:ই বনাঞ্চল পুড়ে যায়। ফলে উদ্ভিদের বিবর্তনে অগ্নিকান্ড/দাবানলকে একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অগ্নিকান্ডের মাধ্যমে সাভানা এলাকায় পশু চারণের ক্ষেত্র টিকিয়ে রাখা হয়; যদিও এতে গাছ পুড়ে যায়। বনে গাছ পালার উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রাণীকূলের সুবিধার্থে অনেক সময় আগুন জ্বালানো হয়। এতে অগ্নি সংযোজনের ফলে মূল উদ্ভিদের পরিবর্তন সাধিত হয়।

*উদ্ভিদের বিবর্তণ।*

### প্রাণী

মানুষ ও বন্য প্রাণী উভয়ই উদ্ভিজ্জ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বন্য প্রাণীর সুবিশাল দল উত্তরের প্রেইরী অঞ্চলের বিশেষত: উত্তর আমেরিকার ও রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের তৃণভূমি পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রেইরী তৃণ-ভূমিতে অনেক প্রজাতির তৃণের মধ্যে বড় প্রজাতি সমূহ, যা হ্রাসকারী (Decreaser) নামে পরিচিত, যদি পশুচারণ না হতো তাহলে ছোট প্রজাতি সমূহের বিকাশলাভ হতো না। বাইসন, বলগা হরিণ ইত্যাদি প্রেইরী তৃণাঞ্চলে চরে বেড়ানোর কারণে বড় ও ছোট প্রজাতির ঘাসের বৃদ্ধিতে একটি সাম্যতা বজায় থেকেছে। পাখিও বীজ ছড়ানোর মাধ্যমে উদ্ভিদের বন্টনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বন্টনে মানুষের প্রভাব ও অপরিসীম। বিস্তৃত বনাঞ্চল কেটে জনপদ/কৃষিভূমি গড়ে তুলেছে; ফলে স্থানীয় আবহাওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাইন বনাঞ্চল, রাশিয়ার তইগা বনভূমি ব্যাপকভাবে কেটে ফেলা হয়েছে।

*প্রেইরী অঞ্চল, হ্রাসকারী।*

*উদ্ভিদের ওপর প্রভাববিস্তারকারী নিয়ামকগুলো কি কি?*

## উদ্ভিদের কাঠামো বিন্যাস

পৃথিবীর উদ্ভিদ সমূহের শ্রেণী বিভাজনের ক্ষেত্রে জীব-ভূগোলবিদগণ একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এগুলোর বেশির ভাগই দুটো শর্ত অনুসরণ করে।

প্রথমত: একটি অঞ্চলের উদ্ভিদ কাঠামো; অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সমূহের গড়ন, আকৃতি, কাঠামো ও আয়োজন বিন্যাস;

দ্বিতীয়ত: ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের ধরন।

*উদ্ভিদের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য।*

কানাডার জীববিজ্ঞানী পিয়েরে ডেনসিরাউ গাছের আকার, আকৃতি ও স্তরায়ন, গাছ নীচের মাটি কি মাত্রায় ঢেকে রাখে, পর্যায় বৃত্ত (Periodicity) ও পাতার ধরনের ভিত্তিতে উদ্ভিদের ছয় ধরনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

১. **গাছের আকার:** আকার অনুযায়ী উদ্ভিদকে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও ঘাসে ভাগ করা যায়। বৃক্ষ ও গুল্ম সোজা দন্ডায়মান থাকে। লতা অন্যগাছে ভর করে উপরে উঠে।

২. **আকৃতি ও স্তরায়ন:** আকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ, মাঝারি ও খাটো এই হিসাবে উদ্ভিদকে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। কোনো বৃক্ষ ২৫ মি. এর অধিক লম্বা হলে তাকে দীর্ঘ, ১০-২৫ মি. লম্বা হলে তা মাঝারি এবং ৮-১০ মি. লম্বা হলে তা খাটো বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের একটি আদর্শ মাপ অনুসরণের মাধ্যমে উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া সুবিধাজনক।

*ডাল-পালা ও পাতার বিস্তার।*

৩. **ভূ-আচ্ছাদনঃ** একটি উদ্ভিদ এর নীচের ভূমির কতখানি ডাল-পালা ও পাতার বিস্তারের মাধ্যমে ঢেকে রেখেছে তাই ভূ-আচ্ছাদন। যেমন- অত্যন্ত ফাঁকা, বিচ্ছিন্ন, গুচ্ছ ও পূর্ণভাবে ঢাকা, গাছের আবরণ ছাড়া, বিচ্ছিন্ন, লতাগুল্মে ঢাকা ইত্যাদি।

*বার্ষিক ঋতুচক্র।*

৪. **পর্যাবৃত্তঃ** বার্ষিক ঋতুচক্রের সাথে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সক্রিয়তার বিশেষ সম্পর্ক আছে, যা পর্যাবৃত্ত নামে অবহিত হয়। যেমন- পত্র পতনশীল উদ্ভিদ শীতের শুরুতে পাতা ঝরিয়ে ফেলে। আবার চিরসবুজ বৃক্ষ সারা বছরই পাতা ঝরে ও নতুন পাতা হয়। অন্যদিকে আধা চিরসবুজ উদ্ভিদ একটি সাময়িক বিরতিতে পাতার সংখ্যা বাড়ায়, কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে নয়। এছাড়া কিছু চিরসবুজ উদ্ভিদ আছে যাদের কান্ড অত্যন্ত পুরু, মাংসল এবং পত্রহীন, সারা বছর সবুজ থাকে। যেমন- ক্যাকটাস।

*চওড়া, সূচালো, ছোট এবং যৌগ/যুক্তপত্র।*

৫. **পাতার আকৃতি ও আকারঃ** পাতার আকৃতি ও আকার দ্বারাও উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাজন করা যায়। যেমন- চওড়া, সূচালো, ছোট এবং যৌগ/যুক্ত পত্র। চওড়া পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ হচ্ছে সেগুন, গর্জন, চাপালিশ ইত্যাদি। সূচালো পত্র উদ্ভিদের উদাহরণ পাইন, সপ্রুফ, ফার ইত্যাদি। নিম ও তেঁতুল ক্ষুদ্র পত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদ। যুক্ত পত্র উদ্ভিদের উদাহরণ স্বরূপ হিকরি ও ক্রাশ এর নাম উল্লেখ করা যায়।

*জলবায়ু ও পারিবেশের ভিত্তিতে।*

৬. **পাতার বুনটঃ** জলবায়ু ও পরিবেশের ভিত্তিতে গাছের পাতার বুনট গড়ে উঠে। পাতার বুনট প্রকৃতি মূলত: এর মাধ্যমে পানি পরিত্যাগ মাত্রার উপর নির্ভর করে। গড়পুরুত্ব বিশিষ্ট পাতাকে ঝিল্লিময় বলে, পাতলা ও সুক্ষ্ম পাতা গাছ ছাল আচ্ছাদিত হয়। যে সমস্ত পাতা শক্ত, পুরু ও মসৃণ তা স্কেলোরোফাইরাস নামে অবহিত হয় এবং এই ধরনের পাতার উদ্ভিদে গড়ে উঠা ভূমিকে স্কেলোফিল বন বলে।

*উদ্ভিদের কাঠামো বিন্যাসের অর্থ কি?*

## উদ্ভিদের বাস্তব্যপর্যায়ক্রম (Ecological Succession of Vegetation)

*বাস্তব্য পর্যায়ক্রমে, সোর, সেরাল পর্যায়।*

সময়ের সাথে উদ্ভিদ জগতের/সমাজের পরিবর্তন ঘটে থাকে। উদ্ভিদের এই পরিবর্তন মূলত: এর আদি থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে, যা বাস্তব্যপর্যায়ক্রম নামে পরিচিত। সাধারণত সুনির্দিষ্ট জলবায়ু, মৃত্তিকা ও পানি প্রাপ্যতার আলোকে উদ্ভিদ পরিক্রমণের মাধ্যমে কোনো এলাকায় সম্ভাব্য একটি জীব সমাজ গড়ে উঠে। এই পরিক্রমণের প্রতিটি ধাপে যে নতুন নতুন জীব সমাজের আগমন ঘটে থাকে তাকে একত্রে সেরি (Serie) বলে। প্রতিটি নতুন পর্যায়ের সমাজকে সেরাল পর্যায় (Seral Stage) বলা হয়। শেষ পর্যায়ে উদ্ভিদ যখন স্থির অবস্থায় পৌঁছে তাকে চূড়ান্ত উদ্ভিদ পরিক্রমণ বলে। উদ্ভিদ পরিক্রমণ নব গঠিত ভূমিরূপে শুরু হলে তাকে প্রাথমিক পরিক্রমণ বলে। আবার ইতোপূর্বে গড়ে ওঠা উদ্ভিজ এলাকায় হলে তা দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিক্রমণ নামে পরিচিত।

*আদিধাপ।*

পরিক্রমণের প্রথম ধাপকে আদি ধাপ (Pioneer Stage) বলে। যেখানে কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে; যেমন: দ্রুত পানি অপাসারিত হয়ে যাওয়া, মৃত্তিকা শুকিয়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত সূর্যালোক, বায়ু এবং উচ্চ তাপমাত্রার ভূমি ও বায়ুর উষ্ণতায়ও নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারে। এই অবস্থায় বৃদ্ধির সাথে শিকড় মাটির তলদেশে প্রবেশ করে, যা পরে পঁচে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে। পতিত পত্র ও কান্ড/ডালপালা পঁচে জৈবপদার্থ মাটিতে যুক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যক পরজীবি ও প্রাণী বসবাস করতে শুরু করে। তারপর স্তন্যপায়ী প্রাণী চড়ে বেড়ায়,

নব্য উদ্ভিদস্থলে পাখির আনাগোনাও বৃদ্ধি পায়। এর সাথে অপেক্ষাকৃত বড় উদ্ভিদের বীজও আসে। এই অবস্থায় অন্য উচ্চতর উদ্ভিদের আগমন ঘটে থাকে এবং তা আদি উদ্ভিদকে হটিয়ে দেয়। নবাগত উদ্ভিদ মাটির বৃহদাংশ ডালপালায় ঢেকে ফেলে। এ পরিবেশে বনের ক্ষুদ্র জলবায়ু পূর্বের অবস্থার তুলনায় অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশেষত: চরম বায়ু ও মৃত্তিকার উষ্ণতায় স্বাভাবিকতা আসতে থাকে এবং সে সাথে উচ্চ আর্দ্রতা ও কম তীব্র সূর্যালোকের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। এই পর্যায়েও নতুন প্রজাতির আগমন ঘটতে থাকে এবং শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত পরিক্রমণ সম্পন্ন হয়। এই অবস্থায় উদ্ভিদ শক্তি উৎপাদন মাত্রা ও ব্যয়ে একটি সাম্যতা বা স্থিত অবস্থা বিরাজ করে।

*উচ্চতর উদ্ভিদের আগমন।*
*নতুন প্রজাতির আগমন।*

## পাঠ সংক্ষেপ

বাস্তব্যবিদ্যা বলতে জীব ও তার চারপাশের পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়াকে বুঝায়। উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যা মূলত: বাস্তু পদ্ধতির একটি অংশ। উদ্ভিদ পরিবেশ একাধিক ভৌত ও জৈব নিয়ামকের সম্মিলিত ফল। উদ্ভিদ সমাজ গড়ে উঠার পেছনে যে সব নিয়ামক কাজ করে তম্মধ্যে পানি ও জলবায়ু অন্যতম। জীব ভূগোলবিদগণ উদ্ভিদজ কাঠামো ও ধরনের ভিত্তিতে এর শ্রেণী বিভাজন করে থাকে। উদ্ভিদ জগতের ক্রমাগত পরিবর্তন চলতে থাকে। এ পরিবর্তন আদি থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে, যা বাস্তব্য পর্যায় ক্রম নামে পরিচিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩২

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৪ মিনিট) ঃ

১.১ জীব জগতের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন যোগায়-
ক. মাটি খ. পানি
গ. উদ্ভিদ ঘ. প্রাণী

১.২ অনাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশিদিন বাঁচে-
ক. ফেরিটোফাইটিস খ. জেরোফাইটিস
গ. হাইগ্রোফাইটিস ঘ. মেসোফাইটিস

১.৩ দিবালোকের দৈর্ঘ্যে ফুল ফুটতে প্রভাবিত হয় না-
ক. কলা খ. স্ট্রবেরী

গ. টমেটো ঘ. মূলা

১.৪ উদ্ভিদ পরিক্রমণের প্রতিটি ধাপে যে নতুন জীব সমাজের আগমন ঘটে তাকে বলে-
ক. কেরি খ. সেরি
গ. সেরাল ঘ. নবাগত

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২X৫ = ১০ মিনিট) ঃ

১. ফেরিটোফাইটিস কাকে বলে?
২. পানির প্রয়োজনীয়তার মাত্রার ভিত্তিতে কয় ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়?
৩. আলোক পর্যাবৃত্ত বলতে কি বুঝায়?
৪. ডেনসিরাউ উদ্ভিদের কয় ধরনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন?
৫. চূড়ান্ত উদ্ভিদ পরিক্রমণ বলতে কি বুঝায়?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. উদ্ভিদ বিস্তরণে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. উদ্ভিদের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা দিন।
৩. উদ্ভিদ বাস্তব্যপর্যায়ক্রম ধারণার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

# পাঠ ৩.৩৩ : প্রাণীজ বাস্তব্যবিদ্যা (Animal Ecology)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ প্রাণিজ বাস্তব্য বিদ্যা, শ্রেণীবিভাগ ও প্রকৃতি;
- ◈ প্রাণীর জীবন চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◈ প্রাণিজ বন্টনের জলবায়ু ও উদ্ভিদের ভূমিকা;
- ◈ প্রাণিজ বন্টন বিন্যাসের কারণ ও ভৌগোলিক বলয় সম্পর্কে।

## প্রাণিজ বাস্তব্যবিদ্যা

প্রাণিজ বাস্তব্য বিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রাণীর বন্টনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। ভূগোলবিদ্যার জ্ঞানের এই শাখায় পরিবেশের সাথে প্রাণীর সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

## প্রাণীর শ্রেণী বিভাগ ও প্রকৃতি

প্রাণীজগৎকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়- মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী। মেরুদন্ডী প্রাণীর স্পাইনাল দন্ড ও মস্তিষ্ক আছে এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর কোন স্পাইনাল দন্ড নাই। জীব বিজ্ঞানীগণ প্রাণীকে অবশ্য তিনটি উপভাগে ভাগ করেন। এগুলো: প্রোটোজোয়া, প্যারাজোয়া ও মেটাজোয়া। প্রোটোজোয়া এক কোষী জীব, প্যারাজোয়া নিম্নশ্রেণীর জীব, তবে মেটাজোয়া বহুকোষি এবং বিশেষায়িত শরীর কোষ ও বিশেষ অঙ্গ নিয়ে গঠিত।

*প্রোটোজোয়া, প্যারাজোয়া, মেটাজোয়া।*

মেরুদন্ডী প্রাণীকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়:
সাইক্লোসেটামাটা (প্রায় ১০টি প্রজাতি)
মৎস্য (প্রায় ২০,০০০ প্রজাতি)
উভচর (প্রায় ২,৮০০ প্রজাতি)
সরীসৃপ (প্রায় ৭,০০০ প্রজাতি)
পাখি (প্রায় ৮,৬০০ প্রজাতি)
স্তন্যপায়ী (প্রায় ৫,০০০ প্রজাতি)

*মেরুদন্ডী, অমেরুদন্ডী প্রাণী।*

প্রাণীজগতে মেরুদন্ডী প্রাণী তার গঠন কাঠামোর সুবিধার কারণে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনকভাবে প্রকৃতিতে টিকে আছে।

*প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণী কি কি?*

## প্রাণীর জীবন চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

### প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

প্রাণীর দুটো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর বুদ্ধিমত্তা ও বিচরণ ক্ষমতা আছে, যা উদ্ভিদের নাই। প্রাণীর এ গুণাবলী থাকায় সে নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে যা উদ্ভিদ পারে না। প্রাণীর আরো দুটো বৈশিষ্ট্য আছে যা উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর ধরন অনেক বৈচিত্র্যময় এবং এর বন্টন অনেক জটিল।

*বুদ্ধিমত্তা ও বিচরণ ক্ষমতা।*

## প্রাণী খাপ খাওয়াতে পারে

*বিশেষ পারবেশ ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য।*

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণী ও বিশেষ পরিবেশে বা জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকে। যেমন, যে সমস্ত প্রাণী গর্তে থাকে সেগুলো সাধারণত: নিশাচর এবং শীতকালে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। বহু প্রাণী উপকুলে বা পানির কাছাকাছি বসবাস করতে পছন্দ করে। কারণ সহজেই সেখানে খাবার পাওয়া যায়। কিছু কিছু পাখি পানি থেকে খাবার যোগাড় করে আর বাস করে ডাঙ্গায়। বাঁচার তাগিদে প্রয়োজনে পাখি শত শত মাইল উড়ে সুবিধাজনক পরিবেশে আশ্রয় নেয়। বহু প্রাণী গাছের ডালে চড়ে বেড়াতে অভ্যস্থ। এই সমস্ত প্রাণীর শারীরিক গঠন এমন যে এগুলো শুন্যেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে অনায়াসে লাফিয়ে যেতে পারে। যেমন- হনুমান, বানর। এই সমস্ত প্রাণী ফল-মূল ও পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

## আকার ও বর্ণ

*বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয়।*

প্রাণীর আকার ও বর্ণ অত্যন্ত বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় যা প্রাণীকে সহজেই প্রকৃতিতে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। বহু প্রাণী কোন বিপদ টের পেলেই নিজেকে তাৎক্ষণিক ভাবে গুটিয়ে নিতে পারে নতুবা অত্যন্ত শান্তভাবে মিশে থাকার চেষ্টা করে। প্রাণী তার গাত্র বর্ণকে লুকানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে। আবার কখনও প্রাণী শত্রুকে ভয় দেখায় এবং আক্রমণের ভান করে। কোন কোন প্রাণী দ্রুত এর গাত্র বর্ণ পাল্টাতে সক্ষম হয়।

*প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কি কি?*

## প্রাণীর বন্টনে জলবায়ু ও উদ্ভিদের প্রভাব

*গম্যতা ও পারবেশ।*

পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রাণী ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী দুটি প্রধান শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা: ক) গম্যতা এবং খ) টিকে থাকার মত উপযোগী পরিবেশ।

## জলবায়ু

জলবায়ুর অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আর্দ্রতা, উষ্ণতা, আলো এবং বায়ু বিশেষ ভূমিকা রাখে। জলজ প্রাণী ছাড়াও স্থলভাগের প্রাণীকুল ও পানির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিছু প্রাণী অত্যন্ত আর্দ্র বা ভেঁজা স্যাত-স্যাতে পরিবেশে বসবাস করে থাকে আবার অন্যরা শুষ্ক পরিবেশ পছন্দ করে। বহু প্রাণী উভচর হিসাবে জীবন যাপন করে থাকে। যেমন: মহিষ, শামুক।

*উষ্ণতা ০° থেকে ৫০° সে. পর্যন্ত। কম উষ্ণতায় নিষ্ক্রিয়।*

উষ্ণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক যা প্রাণীকে প্রভাবিত করে। সাধারণত: প্রাণী শূন্য ডিগ্রী ($0^oC$) থেকে সর্বোচ্চ ৫০° সে. পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। তবে বহু প্রাণী আছে কম উষ্ণতায় তাদের কার্যাবলী থামিয়ে দেয় বরং সে অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

*সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মি।*

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণী সুর্যালোকের উপর সরাসরি ততটা নির্ভরশীল নয়। যে সমস্ত প্রাণী গুহায়, অন্ধকারে বা গভীর পানির তলদেশে বাস করে তারা সুর্যালোক ছাড়াই সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। তবে, বেশির ভাগ প্রাণীরই আলোর প্রয়োজন হয়। অধিক আলো কিছু প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। যেমন- মরুভূমি ও অধিক উচ্চতায় প্রাণী সূর্যালোক থেকে রক্ষার জন্য গাঢ় বর্ণ ধারণ করে থাকে। ভাইরাস, পরজীবি, ফাঙ্গাস স্পোর এবং বহু অনুবীক্ষণিক জীব সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিতে মারা যায়।

*প্রাণী বন্টনে জলবায়ুর ভূমিকা কি?*

### উদ্ভিজ্জ

উদ্ভিদ প্রাণীকে দুইভাবে প্রভাবিত করে থাকে। ক) সুনির্দিষ্ট আবাস স্থলের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং খ) আহার যোগায়।

*আবাসস্থাল ও আহার।*

বহু প্রাণী একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে। যেমন, বনভূমির প্রাণী, তৃণভূমির প্রাণী; আবার কিছু প্রাণী যেগুলো সব পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। যে সব প্রাণী তৃণভূমিতে অভ্যস্থ তারা গহীন বনভূমিতে টিকবে না। প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য যে খাবার যোগাড় করে থাকে তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদই যোগান দেয়। কিছু প্রাণী তৃণভোজী যেমন: ঘোড়া, এন্টেলোপ, গরু, ছাগল, মহিষ, কিছু মাংসাসী। যেমন: বাঘ, সিংহ।

*প্রাণী বন্টনে উদ্ভিদের ভূমিকা কি?*

### প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয়

উদ্ভিজ্জের ন্যায় প্রাণীর নির্দিষ্ট আবাস স্থলের সীমানা সহজ নয়। কারণ প্রাণীর যেখানে জন্ম সেখানেই সারা জীবন না কাটিয়ে অনত্র অভিগমন করতে পারে। আবার বহু প্রাণী গ্রীষ্মকালে যেখানে বাস করে শীতকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। ফলে এ সমস্ত প্রাণীর আবাস ভূমির সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক।

*নিউট্রাপিক্যাল বলয়।*

এতদসত্বেও পৃথিবী ব্যাপী প্রাণী জগতের একটি সরল বন্টন চিত্র তুলে ধরা যায় (চিত্র ৩.৩৩.১), যা মূলত: প্রাণীর বিবর্তন কেন্দ্রসমূহ দেখাতে সহায়ক হবে। তাছাড়া প্রাণীর বন্টনে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বাঁধা আছে তারও প্রতিফলন দেখা যাবে। চিত্রে লক্ষ্যনীয় যে, বেশ কিছু প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয় উচ্চ পর্বত (হিমালয়), বিস্তৃত মরু প্রান্তর (সাহারা, আরব), গভীর সমুদ্রখাত (ইন্দোনেশিয়া) এবং সংকীর্ণ ভূসংযোগ (কেন্দ্রিয় আমেরিকা) এর সীমানার সাথে মিশে আছে।

*প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয় কেমন?*

পি.এল. স্কেলেটার নামক একজন জীববিজ্ঞানী ১৮৫৭ সালে প্রথম পৃথিবীকে প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয়ে ভাগ করার উদ্যোগ নেন। এই বিভাজনের প্রধান ভিত্তি ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষী বৈচিত্র্যতা। তিনি পৃথিবীকে ৬টি পক্ষীজগতে ভাগ করেন। পরবর্তীতে ১৮৭৬ সালে এ.আর. ওয়ালেস বিষয়টি আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং স্কেলেটার-এর মানচিত্র কিছুটা সংস্কার সাধন করেন। এখনও স্কেলেটার ও ওয়ালেস-এর তৈরিকৃত মানচিত্র অনসুরণ করা হয় (চিত্র ৩.৩৩.১)। ছয়টি প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয় নিম্নরূপ:

*পি.এল স্কেলেটার-১৮৫৭।*

ক. প্যালআর্কটিক, যা ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার (দ. ও দ. পূর্ব বাদে) অংশ জুড়ে বিস্তৃত;

খ. নিয়ারআর্কটিক, যা প্রায় পুরো উ. আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ড জুড়ে আছে;

গ. নিউট্রপিক্যাল, যা প্রায় পুরো দ. আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকা নিয়ে গঠিত;

ঘ. ইথিওপিয়ান, যা আফ্রিকা, দ. সাহারা ও মাদাগাসকার দ্বীপ অন্তর্ভূক্ত;

ঙ. অরিয়েন্টাল, যা দ. এশিয়া, দ. পূর্ব এশিয়া এবং কিছু ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে বিস্তৃত; এবং

চ. অষ্ট্রেলিয়ান, যা অষ্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ সমূহ নিয়ে গঠিত।

*৬টি বলয়। ইথিওপিয়ান বলয়ে প্রজাতি সবচেয়ে*

উপরোল্লেখিত ছটি বলয়ের মধ্যে ইথিওপিয়ান বলয়ে প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং বহু প্রজাতি শুধুমাত্র এ বলয়েই সীমাবদ্ধ। কিছু কিছু প্রজাতির অনুরূপ বা নিকট আত্মীয় অন্য বলয়েও দেখা যায়। যেমন: সিংহ ও হাতী এই বলয়ের ন্যায় ওরিয়েন্টাল বলয়েও দেখা যায়। মাদাগাসকার দ্বীপের প্রাণীকুলের সাথে পূর্ব আফ্রিকায় চরে বেড়ান প্রাণীর কোন মিল নেই। আফ্রিকার এত কাছে অবস্থিত হয়েও মাদাগাসকার দ্বীপের প্রাণীর সাথে কেন সাযুজ্য নেই তা স্পষ্ট নয়।

*প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয়ের ভিত্তি কি?*

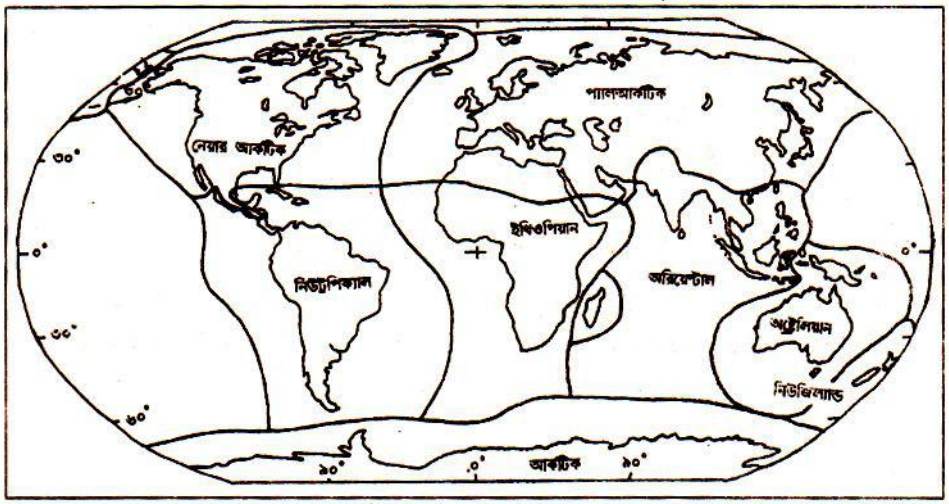


চিত্র ৩.৩৩.১ : প্রাণীজগতে সরল বন্টন চিত্র।

*অস্ট্রেলিয় বলয় দীর্ঘাদনের বিচ্ছিন্নতা ও পৃথক বিবর্তন।*

অস্ট্রেলীয় বলয়ের প্রাণীকুলের সমাবেশে দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্নতা ও পৃথক বিবর্তনের একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়। এ বলয়ে মারসুপিয়ালস (যেমন: ক্যাঙ্গারু ও ওমবাট) ও তাসমেনিও বাঘের আবাসস্থল। কোন কোন জীব ভূগোলবিদ নিউজিল্যান্ডকে অষ্ট্রেলীয় বলয়ের সাথে একত্রীভুত করার পক্ষপাতি; অন্যরা মাদাগাসকারের ন্যায় পৃথক ভাবেই দেখতে আগ্রহী। এর অবশ্য বেশ কিছু কারণ আছে। যেমন, নিউজিল্যান্ডের প্রাণীজগতে কোন স্তন্যপায়ী নেই, অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক স্থলজ মেরুদন্ডী আছে যা কোন ভাবেই অষ্ট্রেলিয়ার সাথে শুধুমাত্র পাখি ছাড়া তুলনা করা যায় না। নিউজিল্যান্ড বহু ধরনের প্রাণীর আবাসস্থল, যার অনেকগুলোই উড়তে পারে না।

*নিউট্রাপিক্যাল বলয়-অভিসরন বিবর্তন মতবাদ।*

নিউট্রপিক্যাল বলয়েও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় প্রাণীর প্রজাতি আছে, যেমন: শুকরের ন্যায় দেখতে টাপির (Tapir), জাগুয়ার ও বোয়া কনসট্রিকটর। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই জীব ভূগোলবিদগণ অভিসরণ বিবর্তন মতবাদ এক্ষেত্রে বিবেচনা করে থাকেন। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে দুটো সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন বলয়ে প্রাণী বা উদ্ভিদ বৈচিত্র্যময় উৎস থেকে জন্ম নিলেও একই ধরনের আবাসস্থলে তাদের খাপ খাওয়ানোর কৌশলও একই রকম।

আর্কটিক নিকটবর্তী ও মেরু-আর্কটিক বলয় সমূহে প্রজাতির বৈচিত্রতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই কিছু কিছু জীব ভূগোলবিদ উভয়কে একটি বলয় হিসাব বিবেচনা করতে আগ্রহী। এ বলয়ের প্রাণীকুলের প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল উল্লেখ করার মত। যেমন উভয় বলযের মেরু ভাল্লুক, সাইবেরীয় বাঘ ও বৃহৎ পান্ডা (পেলআর্কটিক) এবং বাইসন ও পর্বত সিংহ অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। চিত্র ৩.৩৩.১-এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয় সমূহের বন্টন অত্যন্ত সরলীকৃতভাবে দেখানো হয়েছে। এসব বলয়ের বহু উপভাগ সম্ভব যার মাধ্যমে প্রাণী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার সুযোগ হবে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, অষ্ট্রেলিয়ান বলয়কে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণীকুলের সাথে নিউগিনির প্রাণীর অনেক মিল থাকলেও বৈসাদৃশ্যও অনেক আছে যার জন্য এ বলয়কে দুটো পৃথক বলয়ে ভাগ করা সম্ভব।

*খাপ খাওয়ানোর কৌশল উল্লেখ করার মত।*

## প্রাণীর বন্টন বিন্যাস ও কারণ

উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্থানিক বন্টন নিম্নলিখিত কারণে অসীম নয়:

ক. বিভিন্ন প্রজাতির বিস্তরণ ক্ষমতা বিভিন্ন রকম;

খ. প্রজাতির বিস্তরণ সব দিকে সমান ভাবে হয় না;

গ. প্রজাতির গঠন বৈশিষ্ট্যের কারণে ও অন্যত্র গমন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়;

ঘ. প্রাকৃতিক অবস্থা ও বিস্তরণে একটি বাঁধা হিসাবে কাজ করে; এবং

ঙ. জৈব পরিবেশের কারণে সীমাবদ্ধ বিস্তরণ হতে পারে।

*বিস্তরণ ক্ষমতা সমান নয়, গঠন প্রকৃতিক অবস্থা জৈব পরিবেশ।*

যে কোন প্রাণীর বন্টনই মূলত: নির্ধারিত হয় যে প্রজাতির বিস্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যম ও পদ্ধতির অধিকারী কিনা এবং প্রাকৃতিক ও জৈব বাধা দূর করে অগ্রসর হওয়ার জন্য কতখানি সমর্থ তার উপর।

জীববিজ্ঞানীগণ প্রাণীর বর্তমান বন্টন বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন:

ক. শক্তিশালী প্রজাতি সমূহ পর্যায়ক্রমিক ভাবে পৃথিবীর বৃহৎ ও সবচেয়ে সুবিধাজনক অংশে অবস্থান গড়ে তুলেছে; তা হলো পুরাতন পৃথিবীর স্থলভাগের ক্রান্তীয় অংশে;

খ. মেরুদন্ডী প্রাণীকূলের বিস্তরণের প্রধান ধারা বৃহৎ অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র অঞ্চলে এবং খুবই সুবিধাজনক থেকে অসুবিধাজনক এলাকার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

গ. প্রাণীর বিস্তরণ তিনটি প্রধান দিক ভিত্তিক ধারায় সংঘটিত হয়:

১. দক্ষিণ আমেরিকার উপমেরু অভিমুখী;

২. ক্রান্তীয় এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখী; এবং

৩. পুরাতন পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে ইউরেশিয়ার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকা।

ঘ. প্রাণীর বিস্তরণে বাঁধাদানকারী নিয়ামকসমূহ: যেমন- প্রাকৃতিক বাঁধা এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, পুরাতন প্রজাতি সমূহকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে, যেমন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটেছে।

*ক্রান্তীয় অংশ, বৃহৎ অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র অঞ্চলে, ৩টি প্রধান দিক, প্রাণীর বিস্তরণে বাঁধাদানকারী নতুন শক্তিশালী প্রজাতি।*

ঙ. নতুন শক্তিশালী প্রজাতির আগমন ও বিস্তারের সাথে সাথে পুরাতন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। এ ধরনের প্রতিস্থাপন সাধারণ প্রজাতির প্রাথমিক বিস্তরণ কেন্দ্র থেকে বহির্গামী হয়; ফলে সব সময় প্রজাতির বন্টন বিন্যাসে একটি বহির্গামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

*প্রাণীর বন্টন বিন্যাসের কারণ কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

প্রাণীর বন্টনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রাণীজ বাস্তব্য বিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রাণীজগৎকে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রাণীর দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এর বুদ্ধিমত্তা ও বিচরণ ক্ষমতা যা উদ্ভিদের নাই। গম্যতা ও টিকে থাকার মত উপযোগী পরিবেশ এ দুটি শর্ত দ্বারা প্রাণীর অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভরশীল। জীব ভূগোলবিদগণ পৃথিবীর প্রাণীজ আবাসভূমিকে ছয়টি ভৌগোলিক বলয়ে ভাগ করেন; যথা প্যাল আর্কটিক, নিয়ারআর্কটিক, নিউট্রপিক্যাল, ইথিওপিয়ান, অরিয়েন্টাল ও অষ্ট্রেলিয়ান।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩৩

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৫ মিনিট) ঃ

১.১ প্যারাজোয়া-
ক. নিম্ন শ্রেণীর বহুকোষী জীব খ. নিম্ন শ্রেণীর জীব
গ. নিম্ন শ্রেণীর অকোষী জীব ঘ. বহুকোষী ও বিশেষ অঙ্গ নিয়ে গঠিত জীব

১.২ উদ্ভিদ প্রাণীকুলকে সাহায্য করে-
ক. বাসস্থান ও আহার দিয়ে খ. আহার দিয়ে
গ. জলবায়ু দিয়ে ঘ. আহার ও কর্মসংস্থান দিয়ে

১.৩ ১৮৫৭ সালে পৃথিবীকে পক্ষী বলয় বৈচিত্র্যের প্রথম ভাগ করেন-
ক. এ. আর ওয়ালেস খ. পি. এল ও
গ. পি. এল স্কেলেটার ঘ. লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চি

১.৪ স্কেলেটার ও ওয়ালেস এর মানচিত্রানুযায়ী প্রাণীজ ভৌগোলিক বলয়-
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৭টি ঘ. ৬টি

১.৫ নিউজিল্যান্ডের প্রাণীজগতে কোনো-

ক. প্রাণী নেই খ. সরীসৃপ নেই

গ. স্তন্যপায়ী নেই ঘ. উভচর নেই

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (সময় ২x৮ = ১৬ মিনিট) ঃ

১. প্রাণীজ বাস্তব্যবিদ্যা কি?

২. প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণী কি কি?

৩. প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪. প্রাণী বন্টনে জলবায়ুর ভূমিকা কি?

৫. প্রাণী বন্টনে উদ্ভিদের ভূমিকা কি?

৬. প্রাণিজ ভৌগোলিক বলয় কেমন?

৭. প্রাণিজ ভৌগোলিক বলয়ের ভিত্তি কি?

৮. প্রাণীর বন্টন বিন্যাসের কারণ কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. প্রাণী-বাস্তব্যবিদ্যা কি? প্রাণীজগতের শেণীবিভাগ ও প্রকৃতি বর্ণনা করুন। প্রাণীর জীবন চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. প্রাণীজ বন্টনে জলবায়ু ও উদ্ভিদের ভূমিকা কি?

৩. প্রাণীর ভৌগোলিক বলয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৪. প্রাণীর বণ্টন বিন্যাস ও কারণ বর্ণনা করুন।

# পাঠ ৩.৩৪ : মানব বাস্তব্যবিদ্যা (Human Ecology)

এ পাঠ শেষে যা জানা যাবে-

- ◈ মানব বাস্তব্যবিদ্যা কি এবং এর গতিধারা;
- ◈ আঞ্চলিকতা মতবাদ;
- ◈ বাস্তুবিদ্যার বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◈ প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার পর্যায় সমূহ সম্পর্কে।

## মানব বাস্তব্যবিদ্যা

*শক্তির সাম্যতা, জৈব রাসায়নিক চক্র ও জনসংখ্যার পরিবর্তন।*

মানুষের সাথে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ভৌত পরিবেশের যে সম্পর্ক তাকেই মানব বাস্তব্যবিদ্যা বলে। মানব বাস্তব্যবিদ্যায় জীবের ভূমিকা মূখ্য হলেও যে সব বিষয় ভূপৃষ্ঠে সমস্ত জীবের বন্টন, অবস্থান ও সাংগঠনকে প্রভাবিত করে তাও বিবেচ্য বিষয়। মানুষ, উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী কেউ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং একে অপরের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত। মানুষের সাথে জীবের এই সম্পর্ক শক্তির সাম্যতা (Energy balance), জৈব রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical Cycles) ও জনসংখ্যার পরিবর্তন (Population Dynamics)-এর মাধ্যমে কার্যকর হয়।

*জৈব জগত ও ভৌত পরিবেশ।*

মানুষের সাথে পরিবেশ বিশেষত: জৈবজগত ও ভৌত পরিবেশের সম্পর্ক ভূগোলের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে আসছে। মানবীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিয়ে অবশ্য দু'ধরণের বিতর্ক আছে।

*মানব বাস্তব্যবিদ্যা কি?*

*প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রবাদ। যাযাবর গবাদিপশু চারণ, শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, প্রাকৃতিক প্রভাব।*

এক ধরনের মতবাদে ধারণা করা হয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশই মানবীয় কর্মকান্ডের ধারা বা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, যা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, মরু ও আর্দ্র-ক্রান্তীয় এলাকায় মানবীয় সাংস্কৃতিক তারতম্য। মরু এলাকায় শুষ্ক জলবায়ুর কারণে কৃষির সুযোগ সীমিত তাই কৃষির পরিবর্তে মানুষ গবাদি পশু চারণ করে থাকে এবং এই কারণে যাযাবর (Nomadic) জীবন বেশি পছন্দ করে। এইক্ষেত্রে মানুষের কর্মকান্ডে জলবায়ুর ভূমিকা সুস্পষ্ট। অপরদিকে, আর্দ্র-ক্রান্তীয় এলাকায় সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষি কাজের ব্যাপক সুযোগ আছে, ফলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গবাদিপশু চারণের পরিবর্তে কৃষি কাজই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এখানেও প্রাকৃতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

অপর মতবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন মানুষ উন্নত প্রযুক্তি ও মেধার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বাঁধা অতিক্রম করে যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারে। বর্তমান শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো তার অন্যতম উদাহরণ।

মানুষের কর্মকান্ডে প্রাকৃতিক প্রভাব নিয়ে ইতোপূর্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, সে সময়ের আদি অধিবাসীদের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। তবে মানুষের আগুনের ব্যবহার এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের গৃহায়ন (Domestication) থেকে এই অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের গৃহায়নের ফলে মানুষের খাদ্যের

জন্য বন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়; পরবর্তিতে অপরিকল্পিত অবাধ পশুচারণ ও চাষাবাদ ব্যাপক ভূমি ক্ষয়ের মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতাও হ্রাস পায়।

*মানবজাতির ইতিহাস।*

দশ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মানবজাতি মূলত: গোষ্ঠিবদ্ধভাবে কৃষিকার্য অথবা পশুপালন ভিত্তিক বাস্তু সংস্থান গড়ে তোলে। প্লায়োষ্টোসিন যুগের শেষ ভাগে যাযাবর শিকারী থেকে মানুষ স্থায়ীভাবে কৃষি ও পশুপালনকে প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহন করে। কৃষিকাজে মনোনিবেশের কারণ হিসাবে সামগ্রিকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৌশলগত এবং ক্রিয়াশীল জলবায়ূ ও পরিবেশগত প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। প্রাথমিক চাষাবাদ ও গোষ্ঠিবদ্ধ বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে সীমিত সম্পদের উৎসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; উপরন্তু অজ্ঞাতপ্রসূত সঠিক শস্যপর্যায় অনুধাবন, সংগ্রহ পদ্ধতি এবং গুদামজাত করণের সমস্যার জন্যও পরিবর্তন অবিরাম ছিল। নিংসন্দেহে কৃষিকাজ স্থায়ী বসবাস তৈরীতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, তার পাশাপাশি জীবনযাত্রা সহজতর করার জন্য অকৃষিজ ভিত্তিক পেশা: তাঁত, পরিবহন, বাণিজ্য ও নির্মাণ শিল্পের উদ্ভব হয়। আর এভাবে হলোসিন যুগের শুরুতে অকৃষিজ বাস্তব্যবিদ্যার উদ্ভবের সাথে নগরায়নের গোড়াপত্তন হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ যেমন, দক্ষিণ আমেরিকা, নীল-অববাহিকা, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), সিন্ধু অববাহিকা ও চীন নগর সভ্যতার ব্যাপ্তি লাভ করে (চিত্র ৩.৩৪.১)

*প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ কি? নিমিত্তবাদের বিপরীত মতবাদ কি?*

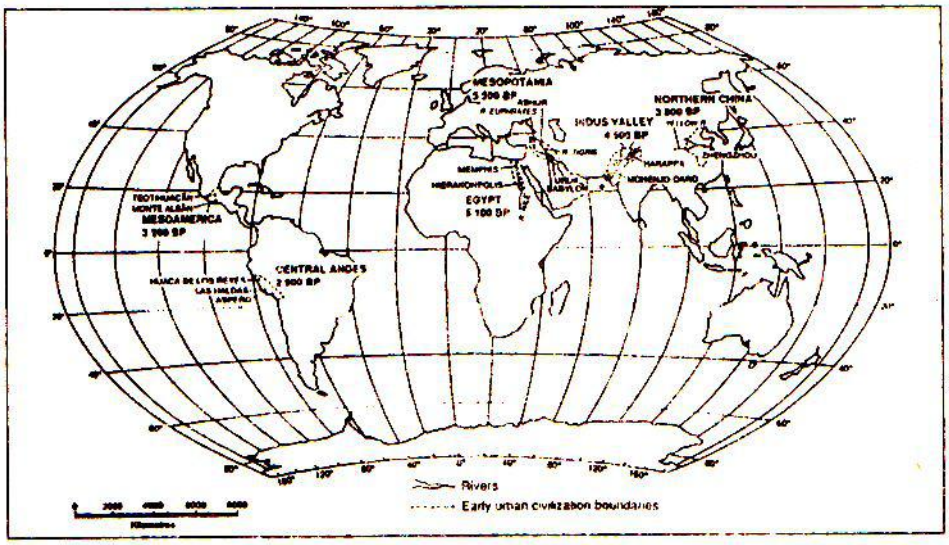


চিত্র ৩.৩৪.১ : পৃথিবীর প্রাচীন নগর ভিত্তিক সভ্যতা সমূহের বন্টন।

*থানববাস্তাবিদ্যা*
*-সমাজবিদ্যা*
*-গ্রামীণ ও নগর।*

মানব বাস্তব্যবিদ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমাজবিদ্যা জনিত যা গ্রামীণ ও নগর এই দুটো অংশে বিভক্ত। গ্রামীণ সমাজবিদ্যা সম্পর্কে Galpin (১৯৪৫) এর বক্তব্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় এবং নগর বাস্তবিদ্যার ধারণা প্রাথমিক রূপরেখা দেন Park, Burges এবং Mekengie (১৯২৫)। বর্তমানে সমাজবিদ্যা গবেষণার অন্যতম বিষয় হলো নগর ও নগরায়ন। এই সমস্ত গবেষণার বর্তমানে নগরের বসবাসযোগ্য স্থানের গুনগতমান নগরে শক্তি ও সম্পদের ব্যবহার, নগর সম্প্রসারণ, পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত স্থান ব্যবহার ইত্যাদি।

নগর সম্পর্কে সমাজবিদ্যা জনিত যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে দুটো ধারণা স্পষ্ট হয়:

*প্রাকৃতিক বাধা, প্রাকৃতিক পরিবর্তন।*

ক. নগর মানব সভ্যতার একটি চূড়ান্ত রূপ যেখানে অভাব এবং দ্বন্দ্ব কম এবং মানুষ আরাম-আয়াসে তার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উপভোগ করার জন্য প্রাকৃতিক বাঁধা সমূহ দুর করার চেষ্টা করে থাকে।

খ. নগর ব্যাপক প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠে। এটি মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষাকারী মৌলিক উপাদান সমূহ ধ্বংস ও সস্তায় পরিণত করার হাজার রকমের উপায় যোগান দিয়ে থাকে।

## **মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বিতকরণ** (Integration of man and nature)

*ওডাম ১৯৩৬ আঞ্চলিকতা মতবাদ।*

মানুষ প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের সাথে প্রকৃতির এই অবিচ্ছেদ্যতার ধারণা থেকেই ওডাম (১৯৩৬) আঞ্চলিকতার মতবাদ তুলে ধরেন। সমাজ সম্পর্কিত এই মতবাদের ভিত্তি হলো বিভিন্ন এলাকা তাদের সাংস্কৃতিগত ও প্রাকৃতিক তারতম্য সত্বেও পরস্পরে নির্ভরশীল। মানুষ ও সম্পদের আলোকে স্থানিক ও আঞ্চলিক মাত্রায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্তিকা সংরক্ষণ পরিকল্পনা কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোর উন্নয়ন করা যাতে এসব অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

*একীভূতকরণ, রাজনৈতিক একক।*

যা হোক, এই ধরনের আঞ্চলিকতার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য বিভিন্ন অঞ্চল সমূহের একীভূতকরণ। সাংস্কৃতিকভাবে বিভিন্ন এলাকা একটি সামগ্রিক একক হিসাবে কাজ করার এই ধারণার অনুরূপ বাস্তব্যবিদ্যা ও বাস্তপদ্ধতি মতবাদ চালু আছে। সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উপাত্তের একীভূত করণের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, সামাজিক পরিসংখ্যান যে সাংস্কৃতিক উপাত্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠে তার রাজনৈতিক একক (যেমন: বিভাগ, দেশ ইত্যাদি) প্রায়শ: প্রাকৃতিক এককের সাথে মিলে না (জলবায়ু অঞ্চল, মৃত্তিকার ধরন, জীব বলয় ও প্রাকৃতিক অঞ্চল)। এক্ষেত্রে পানি বিভাজিকা একটি বাস্তবমুখী ব্যবস্থাপনার উপযোগী বস্তুপদ্ধতি একক, যা প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবলীকে একীভূত করতে পারে।

*কিভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় করা সম্ভব?*

## **মানব বাস্তুবিদ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী** (General Characteristics of Human Ecology)

*আধিপত্য বিস্তার বাস্তু পরিবেশ।*

আধিপত্য: অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষ অনেক বেশী সংগঠিত এবং সে তার সাংগঠনিক জোটের মাধ্যমে অন্য জীবের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম। অবশ্য এ আধিপত্য বিষয়টি জটিল এবং এর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ অসুবিধজনক। মানুষ প্রায়শ:ই ভাবে সে তার পাশের পরিবেশ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। মানুষ তার কক্ষের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেও বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান খাদ্যের জন্য তাকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যা সহজেই জলবায়ু যেমন, উষ্ণ এবং শীত, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই মানুষের বাস্তবতার আলোকে বাস্তুপরিবেশের উপর কাম্যমাত্রার নির্ভরশীলতা মেনে নেওয়ার ধারণা গ্রহণ করা উচিত বলে বাস্তুবিদগণ মনে করেন।

এইলক্ষ্যে তারা মনে করেন মানুষের নিজেরই তার জনসংখ্যা বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

*ধারণ ক্ষমতা, জনসংখ্যার সঠিক আকার ও বন্টন, সীমিত সম্পদ, পরিবেশ ও ভোক্তার স্বার্থ, স্থির সিদ্ধান্ত, পৃথক বিবেচনা, গুণগত মান, আরোপ, উপজাতি, একক পদ্ধতি, পদ্ধতি বিজ্ঞান, শিক্ষা ব্যবস্থা।*

- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা;
- কোন এলাকার ধারণ ক্ষমতার আলোকে তার কাম্য জনসংখ্যা ও এর গঠন কাঠামো নির্ধারিত হওয়া;
- যেখানে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর; সেইক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের প্রস্তুতি থাকতে হবে।

*মানব বাস্তব্যবিদ্যায় সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি?*

**ফলিত বাস্তুবিদ্যার উপাদানসমূহ** (Components for an applied human Ecology)

মানুষ যদি তার নিজের বেঁচে থাকার জন্যও প্রয়োজনীয় সম্পদ টেকসই Sustainability রাখতে চায় তা হলে ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত সংস্কারসমূহ আনতে হবে।

ক. স্থানীয় সম্পদ ও এলাকা অনুযায়ী জনসংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ আনা, বংশবৃদ্ধি যাতে কোন স্থানের ধারণ ক্ষমতার আলোকে ঘটে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

খ. জনসংখ্যার সঠিক আকার ও বন্টন এবং শহর এলাকার এক তৃতীয়াংশ উন্মুক্ত স্থান হিসাবে রাখার জন্য আঞ্চলিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এই কাজে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানসহ পরিবেশ কমিশন গঠন করতে হবে যা রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা সমূহ কার্যকর করার দায়িত্ব নেবে;

গ. সীমিত সম্পদের উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে কর আরোপে পুন:বিন্যাস প্রয়োজন, যাতে উচ্চহার বংশবৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। (প্রকৃতিতে যেমন অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়);

ঘ. পরিবেশ ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণে আইন ও ঔষধের গুণগত মানের প্রতি অধিক গুরুত্বদান;

ঙ. কাম্য জনসংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে অবশ্যই একটি স্থির সিদ্ধান্ত আসা;

চ. পণ্যের মূল্য নির্ধারণে আন্তর্জাতিককরণ হতে হবে যাতে পণ্যের উৎপাদন, বর্জ্য ও পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনার প্রয়োজন না হয়;

ছ. উর্ধ্বমুখী অর্থনীতি যেখানে সংখ্যার চাইতে গুণগত মানের দিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়;

জ. পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কঠোর সংরক্ষণ নীতি পানি এবং সমস্ত খনিজ ও জীব সম্পদের উপর আরোপ;

ঝ. উপজাত (Byproduct) ব্যবহারের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া;

ঞ. নগর গ্রামীণ জনগণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে একটি একক পদ্ধতি (Urban-Rural complex as one system) হিসাব বিবেচনা করা;

ট. কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন সমাধান বা তাৎক্ষণিক প্রযুক্তিগত সমাধান না খুঁজে একটি বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের আলোকে পদ্ধতি বিজ্ঞানের দিকে বেশি মনোনিবেশ করা; এবং

ঠ. শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ মানুষ ও পরিবেশ সচেতন বা প্রতিবেশ বাস্তুবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ;

*ফলিত বাস্তুবিদ্যার উপাদানসমূহ কি কি?*

## পাঠ সংক্ষেপ

মানুষের সাথে উদ্ভিদ, প্রাণী ও ভৌত পরিবেশের যে সম্পর্ক, তাকেই মানব বাস্তব্যবিদ্যা বলে। জীবের সাথে মানুষের এই সম্পর্ক শক্তির সাম্যতা, জৈব রাসায়নিক চক্র ও জনসংখ্যার পরিবর্তন এর মাধ্যমে কার্যকর হয়। মানুষের কর্মকান্ডে প্রকৃতি নির্ভরশীলতা ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উভয় ধরনের মতবাদ চালু আছে। সভ্যতার শুরুতে কৃষিকাজই অন্যতম কর্মকান্ড ছিল। পরবর্তীতে নগর ও গ্রামীণ পৃথক সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। নগর মানব সভ্যতার চূড়ান্ত রূপ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩৪

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

**১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন** (সময় ৩ মিনিট) ঃ

১.১ মানব বাস্তব্যবিদ্যা হচ্ছে মানুষের সাথে-
ক. উদ্ভিদ ও ভৌত পরিবেশের সম্পর্ক খ. মানুষ ও আলো বাতাসের সম্পর্ক
গ. প্রাণী, উদ্ভিদ ও ভৌত পরিবেশের সম্পর্ক ঘ. কল কারখানা ও বাসস্থানের সম্পর্ক

১.২ গ্রামীণ সমাজবিদ্যা সম্পর্কে যাত্রা শুরু হয় যার বক্তব্য দিয়ে তিনি-
ক. Odum খ. Galpin
গ. Park ঘ. Mekengie

১.৩ আঞ্চলিকতা মতবাদের উদ্ভব হয় মানুষের সাথে প্রকৃতির-
ক. অবিচ্ছেদ্যতার ধারণা থেকে খ. বৈরী জলবায়ুর প্রকারভেদ থেকে
গ. জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ভূমিকা থেকে ঘ. সহ অবস্থান ও আঞ্চলিকতা থেকে

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** ( সময় ২X৩ = ৬ মিনিট) ঃ

১. মানুষের কর্মকান্ডে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদগুলি কি কি?
২. মানব বাস্তব্যবিদ্যায় সমাজবিদ্যাজনিত বিষয়ের ভূমিকা কি?
৩. মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ সমূহের নিয়মিত প্রবাহ ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে কি করতে হবে?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. মানব বাস্তব্যবিদ্যা আলোচনা করুন।
২. মানববাস্তব্যবিদ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি? ফলিত বাস্তুবিদ্যার উপাদানসমূহ কি?

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন
## উত্তরমালা (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন)

### ইউনিট ১
**পাঠ ১.১**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (২টি) | ১.২ (ইরেটোসথেনীস) | ১.৩ (৩ ভাবে) |
| ২.১ (উদ্ভিদ) | ২.২ (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) | ২.৩ (প্রাকৃতিক) |

**পাঠ ১.২**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (ক, গ্রীকদের) | ১.২ (ক, ৩টি) | ১.৩ (খ, ইরেটোসথেনিস) |

**পাঠ ১.৩**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (ক, উপরিভাগ) | ১.২ (খ, তিন) | ১.৩ (ক, ঐতিহাসিক) |

**পাঠ ১.৪**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (ক, শিলায়) | ১.২ (খ, সমুদ্র) | ১.৩ (গ, পৃথিবীর অভ্যন্তরে) |

**পাঠ ১.৫**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (প্রাকৃতিক ও মানবিক) | ১.২ (বায়ুমন্ডল) | ১.৩ (আবহাওয়াগত) |

**পাঠ ১.৬**

| | | |
|---|---|---|
| ১.১ (পানি) | ১.২ (প্রতি) | ১.৩ (ভূগোল) |

### ইউনিট ২
**পাঠ ২.১**

১। ১.১. হ্যাঁ ১.২. না
১.৩. হ্যাঁ ১.৪ হ্যাঁ।

২। ২.১. খ (রিটার) ২.২. গ (সামগ্রিকতাবাদ)
২.৩. গ (The Cosmos) ২.৪. গ(চার্লস ডারউইন)
২.৫. খ (ডারউইন) ২.৬. খ (রাটজেল)
২.৭. গ (The Pulse of Asia)।

**পাঠ ২.২**

১। ১.১. ঘ (সারা বিশ্বের জন্য) ১.২. গ (বিংশ শতাব্দীতে)
১.৩. গ (ভিডাল-ডা-লা ব্লাসে) ১.৪. ক(হারবার্টসন)
১.৫. গ (সমপ্রকৃতির সাংস্কৃতিক অঞ্চল)।

**পাঠ ২.৩**

১। ১.১. খ (৩টি) ১.২. গ (গ্রীড)
১.৩. ক (গুচ্ছাকারে) ১.৪. গ (অনুমানমূলক বক্তব্য)
১.৫. ঘ (১০ ভাবে)।

**পাঠ ২.৪**

১। ১.১. ক (১৯২০ দশকের দিকে) ১.২. ক (বেশি)
১.৩. গ (পৃথিবী সম্পর্কে লেখা) ১.৪. খ (ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়)।

**পাঠ ২.৫**

১। ১.১. হ্যাঁ ১.২. হ্যাঁ
১.৩. না।

**ইউনিট-৩**

**পাঠ ৩.১**

১। ১.১. মিঃ ১.২. সঃ
১.৩. সঃ ১.৪. মিঃ
১.৫ সঃ।

**পাঠ ৩.২**

১। ১.১ ক (বায়বীয়) ১.২ ঘ (অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল)
১.৩. ক (মহাদেশের তলদেশে) ১.৪. গ (মেফিক ও ফেলসিক)
১.৫. খ (এলুমিনিয়াম)।

**পাঠ ৩.৩**

১। ১.১. ক (শিলা) ১.২. গ (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম)
১.৩. ক (১৫টি) ১.৪. খ (পাইরাইট)
১.৫. খ (কোয়ার্টজ।
২। ২.১ কোয়ার্টজ ২.২. ১০৫টি
২.৩. দ্যুতি ২.৪. কষ
২.৫ কাঠিন্যতা।

**পাঠ ৩.৪**

১। ১.১. ভূত্বক ১.২. নরম
১.৩. প্রাথমিক ১.৪. পলি
১.৫. আগ্নেয়, রূপান্তরিত।
২। ২.১. হ্যাঁ ২.২. না
২.৩. হ্যাঁ ২.৪. না
২.৫. হ্যাঁ।

**পাঠ ৩.৫**

১। ১.১. কেলাসিত ১.২. বিস্ফোরক
১.৩. ব্যাসল্ট ১.৪. পেরিডোটাইট
১.৫. অন্তজঃ।
২। ২.১. মি ২.২. স
২.৩. মি ২.৪. স
২.৫. স।

**পাঠ ৩.৬**

১। ১.১. খ (শিলা ও খনিজের টুকরা) ১.২. ক (স্তরীভূত)
১.৩. ক (জীবাশ্ম পাওয়া যায়) ১.৪. ক (বিচুর্ণীভবন)
১.৫. খ (গ্লাসশিট)।
২। ২.১. স ২.২. মি
২.৩. মি ২.৪. স
২.৫. স।

**পাঠ-৩.৭**

১। ১.১. গ (সবগুলো) ১.২. গ (মেটামরফিজম)
১.৩. ক (শক্ত, মজবুত, পাতলা) ১.৪. গ ৩ (তিন)
১.৫. গ ৮৫% (পঁচাশি শতাংশ)।
২। ২.১. আগ্নেয়, পাললিক ২.২. খনিজ
২.৩. মার্বেল পাথর বা গার্নেট বা শ্লেট বা শিসট ২.৪. গলতে।

**পাঠ ৩.৮**

১। ১.১. হ্যাঁ ১.২. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য
১.৩. মরু অঞ্চলে ১.৪. মৃত্তিকাপাত)
১.৫. নদীর দ্বারা ১.৬. ইউ (ল) আকৃতির উপত্যকায়।
২। ২.১. খ (হয় না) ২.২. গ (উভয় উপায়ে)
২.৩. ক (পিডমোট) ২.৪. ক (হিমবাহ)
২.৫. খ (ইউ)।

**পাঠ ৩.৯**

১। ১.১. মৃত্তিকা ১.২. শিলা
১.৩. মূল শিলার ১.৪. উদ্ভিদ
১.৫. চুয়ীক্ষেপণ ১.৬. কেলসিকরণ।
২। ২.১. গ (প্রাকৃতিক সম্পদ) ২.২. গ (সবগুলো)
২.৩. ক (মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির উপর) ২.৪. গ (উপরের সবগুলো)।

**পাঠ ৩.১০**

১। ১.১. গ (৩০ কি.মি.) ১.২. ক (নাইট্রোজেন পার অক্সাইড)
১.৩. গ (নাইট্রোজেন) ১.৪. ঘ (২০-২৫ কি.মি.)।

**পাঠ ৩.১১**

১। ১.১. ঘ (মেসোমন্ডল) ১.২. ক (২০° সে.)।

**পাঠ ৩.১২**

১। ১.১. গ (সমুদ্র স্রোত) ১.২. গ (দ্রাঘিমাংশ)
১.৩. খ (৫১-১০০) ১.৪. ক (সূর্যালোকের ওপর)।

**পাঠ ৩.১৩**

১। ১.১. না ১.২. হ্যা
১.৩. হ্যা ১.৪. না
১.৫. হ্যা।

**পাঠ ৩.১৪**

১। ১.১. ক(৬০০০সেঃ) ১.২. খ (অনেক ছোট)
১.৩. গ (২৯–৩৪)।

**পাঠ ৩.১৫**

১। ১.১. (৫৯০) ১.২. (২.৬°)।

**পাঠ ৩.১৬**

১। ১.১. খ (শক্তি ও শক্তির নির্দেশক) ১.২. ঘ (দ্রাঘিমার উপর)
১.৩. ঘ (১৭ শতকে) ১.৪. গ (সুইডেনে)।

**পাঠ ৩.১৭**

১। ১.১. ক (জুলাই) ১.২. গ (স্থলভাগে)
১.৩ খ (১৪টি) ১.৪. গ (বিকেলে)।

**পাঠ ৩.১৮**

১। ১.১. খ (গতি বৃদ্ধি) ১.২. গ (৭৬ সে.মি.)
১.৩. ঘ (তরলহীন ব্যারোমিটার)।

**পাঠ ৩.১৯**

১। ১.১. গ (ডান-বাম) ১.২. খ (ঘড়ির কাঁটার একই দিকে)
১.৩. ক (আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে)।

**পাঠ ৩.২০**

১। ১.১. ঘ (মেরুবায়ু) ১.২. গ (নিয়ত বায়ু)
১.৩. গ (৩০° অক্ষাংশ) ১.৪. খ (পশ্চিমা বায়ু)।

**পাঠ ৩.২১**

১। ১.১. গ (বায়ু আবর্তের কেন্দ্র) ১.২. গ (অস্ট্রেলিয়ার নিয়ত বায়ু প্রবাহ)
১.৩. গ (পর্বতে)।

**পাঠ ৩.২২**

১। ১.১. ক (জলীয় বাস্প) ১.২. খ (বৃদ্ধি পায়)
১.৩. খ (তুল্য আর্দ্রতা হ্রাস পায়)

**পাঠ ৩.২৩**

১। ১.১. খ (রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তন) ১.২. ক (অ্যাডভেকশান কুয়াশা)

**পাঠ ৩.২৪**

১। ১.১. স ১.২. স
১.৩. মি ১.৪. মি
১.৫. স।

২। ২.১. জলকণা ২.২. চার
২.৩. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ২.৪. উচ্চ।

**পাঠ ৩.২৫**

১। ১.১. ঘ (০.৫°-০.৬° সে.) ১.২. খ ($Fe_3O_4$)
১.৩. ঘ (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) ১.৪. খ (কিয়েটো)।

**পাঠ ৩.২৬**

১। ১.১. খ (১.৩৫*১০৯ ঘ.কি.মি.) ১.২. গ (৫ ভাগ
১.৩. গ (মধুমতি নদীর অববাহিকায়) ১.৪. খ (সমানুপাতিক)
১.৫. ঘ (মেসোপটেমিয়ায় ৪০০০ বছর পূর্বে)।

**পাঠ ৩.২৭**

১। ১.১. গ (৫ ভাগ) ১.২. ঘ (১১.০ কি.মি.)
১.৩. খ (০.৮) ১.৪. (অগ্ন্যুৎপাত)।

**পাঠ ৩.২৮**

১। ১.১. ঘ (পানি ও আর্দ্রতার বিরামহীন প্রবাহ) ১.২. ক (সূর্যালোকের শক্তি দ্বারা)

**পাঠ ৩.২৯**

১.১. খ (২.৯%) ১.২. খ (পারমানবিক শক্তি)।

**পাঠ ৩.৩০**

১। ১.১. ক (তাপ ধারণ ক্ষমতা যে কোন বস্তুর চেয়ে বেশি)
১.২. খ (৮৫%) ১.৩. ক (০.০১ মি.গ্রা./লি.)।

**পাঠ ৩.৩১**

১। ১.১. খ (শ্বাস প্রক্রিয়ায়) ১.২. ঘ (The Origin of Species)
১.৩. ক (অরডোভিসিয়ান-সিলুরিয়ান) ১.৪. ক (৭ কোটি– ১কোটি ৯০ লক্ষ বছর পূর্বে)
১.৫. ঘ (ক্রিটাসিয়াস যুগে)।

**পাঠ ৩.৩২**

১। ১.১. গ (উদ্ভিদ) ১.২. খ (জেরোফাইটিস)
১.৩. খ (স্ট্রবেরী) ১.৪. খ (সেরি)।

**পাঠ ৩.৩৩**

১। ১.১. খ (নিম্ন শ্রেণীর জীব) ১.২. খ (আহার দিয়ে)
১.৩. গ (পি.এল. স্কেলেটার) ১.৪. ঘ (৬টি)
১.৫. গ (স্তন্যপায়ী নাই)।

**পাঠ ৩.৩৪**

১। ১.১. গ (প্রাণী, উদ্ভিদ ও ভৌত পরিবেশের সম্পর্ক)
১.২. খ (Galpin)
১.৩. ক (অবিচ্ছেদ্যতার ধারণা থেকে)।

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Book Reference)


1. Johnston R.J 1979: Geography and Geographers, Fifth edition, Arnold: London, Pp. 475.
2. Amedo D and Gelledge R.G. 1975 : An introduction to scientific reasoning in geography New York : John Wiley.
3. Stoddart D.R. (cd) 1981 : Geopraphy, ideology and social concern. Oxford : slackwell.
4. Chorley R.J. and Kennedy B.A. 1971 : Physical geography : a systems approach. London : Prentice-Hall Internaltional.
5. Johnston R.J.1985 : The future of Geography. London : Meithuen.
6. Marsh W.M. and Grosssa J.Jr. 1996 : Environmental Geography. John Wiley : N.Y.
7. Holt-Jensen A.1988 :Geography : its history and concepts. London : Harper & Row, 2nd ed.
8. Manner I.R. and Kikesell M.W (eds) 1974 : Perspectives on environment. Washington : Commission on College Geography, Associations of American Geographers.
9. Marin G.J. and James P.E. 1992 : All possible worlds : a history of geographical ideas. New york : John Wiely, 3rd ed.
10. Chorley R. (ed.) 1973 : Directions in geography. London : Methuen.
11. Dull KL. 1995 : Developments to Geographical thoughts, Calcutta, World Press.
12. Elahi K.M. 2000 : Changing definitions of geography. Mimeo Dept. of Geography & Environment, Jahangirnagar University, Dhaka.
13. Blij H. J . de and Muller P.O. 1996 : Physical Geography of the Global Environment. John Wiley : New York.
14. Miller E.W: 1985 : Physical Geography earth systems and human interactions. Bell & Howell : Columbus, USA.
15. Marsh W.M. and Grossa J.Jr. 1996 : Environment Geography. Wiley : N.Y.
16. Herman J.R. and Goldberg R.A. 1985 : Sun, Weather and Climate. New York : Dover.
17. Wyman R .L.ed. 1990 : Global Climate Change and life on earth. New York : Chapman & Hall.
18. Trewartha G.T. and Horn L.H. 1980 : An introduction to climate. New York : McGraw-Hill, 5th ed.
19. Gebdersib-Sellers A. and Robinson P.J. 1986 : Contemporary Climatology. London : Longmen.
20. Mather J.R. 1974 : Climatology : Fundamentals and Applications. New York : McGraw-Hill.
21. Riehl H. 1974 : Introduction to the atmosphere. New York : McGraw-Hill. 3rd ed.
22. Fein J.S and Stephens P.L eds. 1987 : Monsoons. New York : Wiley.
23. National Reseach council 1989 : Ozone depleton, green house gases and climate change, National Academy press. Washigton, DC.
24. Sellers W.D. 1965 : Physical Climatology. University of chicago press.
25. Strahler A.H and Straher A.N 1992 : Modern physical geography. Singapore : Wiley 4th ed.

26. Barry R.G and Chorley R.J. 1992 : Atmosphere, Weather and climate. London : Routledge.
27. Lutgens F.K and Tarbuek E.J 1995 : The Atmosphere. New Jersey : Prentice Hall-Englewood Clitts.
28. আহ্মেদ র. ১৯৯৭ : আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
29. Miller D.H. 1977 : Water at the surface of the earth. New York : Academic Press.
30. Legates D.R. and Mather J.R. 1992 : An evaluation of the average annual global water balance. Geographical Review 82 : 253 - 267.
31. Leopold L.B. 1974 : Water : a primer. Sanfrasis co : Freeman.
32. Gibson U.P. and Singer R.D. 1971 : Water well manual. Berkeley : Premier Press. P. 4-10.
33. Baumgartner A. and Reichel E. 1975 : The World Water Balance : Mean annual global continental, and Maritime Precipitation, Evaporation, and Runoff. Amsterdam : Elsevier.
34. Gleick P.H. 1993 : Water in use, New York : Oxford University Press.
35. Dunne T. and Leopold L.B 1978 : Water in Environmental Planning. San Francisco : W.H. Freeman.
36. United Nations 1990 : Global Outlook 2000, New York : United Nations Publications.
37. Brown J.H and Gibson A.C 1983 : Biogeography. st. Luis : C.Y. Morsby.
38. Strahler A. N and Strahler A.H 1992 : Modern Physical geography Singapore : wiley, 4th ed.
39. Robinson : Biogeography
40. Polunin N. 1967 : Introduction to Plant geography. London : Longman.
41. Barbous M.G., Burk J.H., and Pitts W.D 1980 : Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/cummings publishing comp., Menlopark, CA.
42. Danserau P. 1957 : Biogeography : An ecological perspective: New York : Ronald Press.
43. Simmons I.G 1983 : Biogeographical Processes. Winchester, Mass : Allen & Unwin.
44. Cox C.B and Moore P.D. 1993 : Biogeography : an ecological and evolutinary approach. cambridge, Mass : Blackwell, 5th ed.
45. Ilies J. 1974 : Introduction to Zoogeography. New York : Macmillan.
46. Newbigin M.I 1968 : Plant and animal Geography, London : Methnen.
47. Chorley R.J. 1973 : Geography as human ecology. In : R.J. chorley (ed.) : Directions in Geography London : Methuen, P. 155-170.
48. Huggett R.J. 1994 : Geoecology : an evolutionary approach. London : Routledge.
49. *ভূগোল দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন, আমিনুল ইসলাম, এম.।*